আলেখ

পূজাবার্ষিকী

১৪২৮

www.alekh.penprints.in

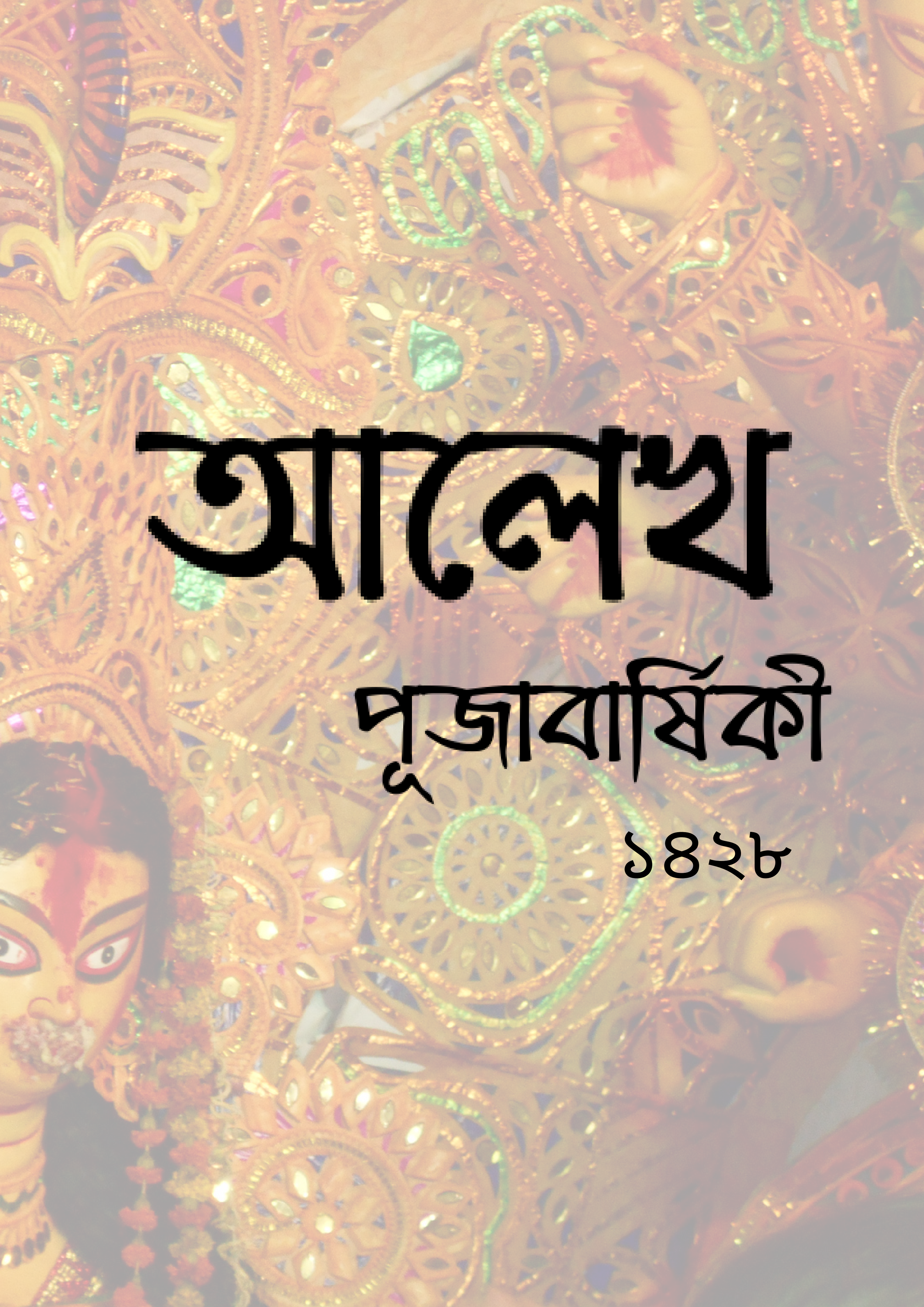

আলেখ

পূজাবার্ষিকী

১৪২৮

আলেখ পূজাবার্ষিকী

১৪২৮

Alekh Pujabarshiki

2021

প্রবন্ধ

মহালয়ার দিনবদলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবাহনী সুর
রাজীব কুমার নন্দী - 01

বিদ্যাসাগর, আমার ঈশ্বর
সুদীপ ঘোষাল - 12

The tales of their supreme sacrifice: do they deserve all the times? A view
Kunal Roy - 25

মায়ের আগমনী সুরে
রূপম চক্রবর্ত্তী - 35

Do not inflict mother nature, love her
Debanjan Banerjee - 78

একাঙ্ক নাটক

তিন সত্য

সুব্রত দত্ত - 42

কবিতা

(Page no 90-240)

ওবায়েদ আকাশ, মাহফুজ আল-হোসেন, সানি সরকার, রাখীবৃতা বিশ্বাস, Gopal Lahiri, তাপস গুপ্ত, প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, লাবনী বসু, অনিন্দিতা শাসমল, শুভদীপ, নির্মাল্য ঘোষ, সুজয় চক্রবর্তী, রুষা, রবিলাল মুরমু, সোমনাথ সামন্ত, নিখিল মিত্র ঠাকুর, দীপঙ্কর সরকার, নির্মলেন্দু কুণ্ডু, পারিজাত প্রীত, সোনালী ঘোষ, অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়, রতন বসাক, নির্মল বসু, শুভ্রব্রত রায়, প্রদীপ কুমার দে, সোমনাথ সাহা, অশোক কুমার দত্ত, সুমিত বৈদ্য, দেবাশিস সাহা, তুষার ভট্টাচার্য, হামিদুল ইসলাম, Rana Zaman, সুস্মিতা নন্দী, শ্রীকান্ত মাহাত, ডঃ রীনা রানী রায়, সুতপা ব্যানার্জী (রায়), শান্তনু গুড়িয়া, সুব্রত সামন্ত, পরিমল

চট্টোপাধ্যায়, বিনিময় দাস, বিকাশ ভট্টাচার্য, রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, আশিস ভট্টাচার্য্য, উদয়ন চক্রবর্তী, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিউটি কর্মকার, জয়া মজুমদার, পাপু মজুমদার, সৌরভ পাল, অরুণা চক্রবর্তী, বহ্নি শিখা (ঊষা দত্ত), বীণা বর, রেজাউল করিম রোমেল, Pratik Mitra, দীপ্তেশ চ্যাটার্জী, কল্লোল বিশ্বাস, Diptarupa Mallick Dasgupta, অচিন্ত্য কুমার দাস, অমিত মজুমদার, হিল্লোল ভট্টাচার্য, তীর্থঙ্কর সুমিত, উত্তম চক্রবর্তী, বাসব রায়, স্বপন গায়েন, সুমনা ভট্টাচার্য্য, Abanti Pal, সুদীপ্ত আচার্য্য, তাপসকিরণ রায়, তোফায়েল তফাজ্জল, গৌতম দন্ডপাট, সন্দীপ গাঙ্গুলী, নিমাই চন্দ্র দে, কমল কৃষ্ণ কোঙার, মুসাফির গৌতম, সজীব দাস, জহিরা খান, স্বপন মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, বিপত্তারণ মিশ্র, শুভ্রকান্তি মজুমদার, বদরুদ্দোজা শেখু, সবুজ জানা, Dr. Sangeeta Sharma, Aneek Chatterjee, Dr. Paramita Mukherjee Mullick, Supriya Mandal, Sumanta Dhara, গৌতম বাড়ই, সুবর্ণা সরকার, পলাশ পাল, মহাজিস মণ্ডল, রোহিত দাস, শান্তনু মাইতি, রণজিৎ সরকার, গোবিন্দ মোদক, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, অজয় হালদার, সুস্মিতা ঘোষ, বাসব রায়, সমিত মণ্ডল

ছোটগল্প

সমর্পণ

অদিতি ঘোষদস্তিদার - 241

সমভূজা

কেয়া চ্যাটার্জি - 245

ফাইনাল ম্যাচ

অভিজিৎ চৌধুরী - 259

Identity

Wribhu Chattopadhyay - 365

শুভ্র শঙ্খ রবে

সুজিত চট্টোপাধ্যায় - 277

আশ্রয়

মানস দেব - 282

ছোটগল্প

বিভাজন

দীপঙ্কর বেরা - 285

ছেঁড়ে দেঁ মাঁ কেঁদে বাঁচি

প্রদীপ দে - 290

বিয়ের সানাই

জয়ন্ত কুমার মল্লিক - 294

বন জ্যোৎস্নায় হাসনুহানা

চিত্তরঞ্জন গিরি - 300

অভিমান

আর্য্য ভট্টাচার্য্য - 331

কে আপন কে পর

অসিত কুমার পাল - 332

ছোটগল্প

আর্টিস্ট

সুবীর মজুমদার - 335

অপয়া

সমাজ বসু - 341

লুকোচুরি

শম্পা রায় - 344

অন্নপূর্না

পূর্বা ঘোষ - 356

বিবাহবার্ষিকী

মানসী গাঙ্গুলী - 375

যখন ঝড় আসে

বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় - 385

ছোটগল্প

মুখোমুখি

অদিতি ঘটক - 389

বর্ষায় ভরসায়

রাণা চ্যাটার্জী - 398

মেডুসা

ঝিলিক মুখার্জী গোস্বামী - 402

ধ্বস্ত মানবিকতা

দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় - 419

লুডো

সুচেতা ঘোষ - 423

অহং সম্পর্ক

সুব্রত ব্যানার্জ্জী - 432

ছোটগল্প

অন্যরকম জীবন

আবীর মহাপাত্র - 438

ঘটনা নাকি কাকতলীয়

অর্ঘ্যদীপ দাস - 441

পথিক

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় - 449

অযাচিত প্রাপ্তি

রাই পারমিতা আইচ - 475

মুখোশের আড়ালে

প্রশস্তি পন্ডিত - 491

দর্পণে প্রতিবিম্ব

পারমিতা রাহা হালদার (বিজয়া) - 544

ছোটগল্প

কৃপালি সংহৃতি

সঞ্চারী ভট্টাচার্য - 547

Silent Love

Samiran Sarkar - 608

Ahsaan

Sanhita Banerjee – 621

রান্নাবান্না

মটরডাল দিয়ে মোচার ঘন্ট
সুদীপা চৌধুরী - 487

ডাকঘর

সেই চিঠি
প্রদীপ্ত তেওয়ারি – 529

Artwork

Shohalia Nag - 633
Riyanka Roy - 634

মহালয়ার দিনবদলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবাহনী সুর

রাজীব কুমার নন্দী

"আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর,
ধরণীর বহিরাকাশি অন্তর্হিত মেঘমালা;
প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন-বার্তা,
আনন্দময়ী মহা মায়ার পদধ্বনি;
অসীম চাঁদে বেজে উঠে রূপ-লোক ও রস-লোক এ আনে নব ভাবমাধুরী সঞ্জীবন,
তাই আনন্দিত শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ী কে মৃন্ময়ী তে আবাহন..."

মহালয়ার দিন বদলের সুরে আজও শহর থেকে গ্রামের মাটির উঠোনে একই আবাহনী সুর।মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠের জাদুতে আজও বাঙালীর নেশা লাগে।মহালয়ার সুরেই জানান দেয়

পুজো আসছে।কাশফুলের সাথে শরতের পেজা তুলোর মেঘে পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছায় বাঙালীর নস্টালজিক প্রাণের উৎসব।সাল ১৯৩১ থেকেই আকাশবাণী থেকে সম্প্রচার হতে শুরু করে মহিষাসুরমর্দিনী যা বাঙালীর আবেগ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে।প্রথমে কায়েতের ছেলে বলে চন্ডীপাঠে আপত্তি জানায় অনেকে কিন্তূ আকাশবানীর পঙ্কজ মল্লিকের জেদের বসেই সেদিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কণ্ঠ দান করেছিলেন।যা আজ ইতিহাস হয়ে আছে।গঙ্গা দিয়ে এই দীর্ঘদিনের জয় যাত্রায় অনেক জল গড়িয়ে গেছে কিন্ত বাঙালীর আবাহনে মাধ্যম বদলালেও সুর রয়ে গেছে একই।বাঙালীর প্রাণের রেডিও আজ বাক্স বন্দী মোবাইল ,টিভি,সোস্যাল মিডিয়া জুড়ে আজ ভার্চুয়ালী গানে, কবিতায়, নৃত্যে মহালয়া পালিত হলেও মহালয়ার ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ মালার বিকল্প হয়নি।সেকাল একালেও চির প্রাসঙ্গিক রয়েছেন তিনি।

মহালয়া’ মানেই যে পুজো শুরু তা কিন্তু নয়। এর বেশ কিছু মাহাত্ম্যও আছে। এর অনেকগুলি অনেকেই হয়ত জানেন না।

সনাতন ধর্ম মতে এই সময়ে অর্থাৎ এই কৃষ্ণপক্ষকালে যমলোক বা পিতৃলোক থেকে পূর্বপুরুষদের প্রেত মর্ত্যলোকে বসবাস করে নিজের পরিজনদের সঙ্গে। এর পর তাঁরা আবার পিতৃলোকে ফিরে যান। এই সময়ে প্রয়াত পরিজনদের আত্মার যে সমাবেশ ঘটে তাকে বলা হয় মহান লয়। সেই শব্দ থেকেই এসেছে ‘মহালয়া’ শব্দটি।

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে কলকাতার ও গ্রামের শরৎকাল। শরৎ মানেই শারদীয় দুর্গোৎসব। শারদ উৎসবের সুর শুরু হয় মহালয়ার দেবীপক্ষের সূচনার মধ্য দিয়ে।

একদিকে ভোররাতের ফোটা শিউলি ফুলের সুরভির সাথে শরতের আবাহনী সুর বেজে ওঠে। অন্যদিকে

চণ্ডীপাঠের চিরাচরিত সুরে পিতৃতর্পণের উদ্দেশ্যে গঙ্গার ঘাটে জমা হন সনাতন ধর্মের মানুষরা।

তখনকার দিনে কলকাতার মহালয়া শুরু হতো আকাশবাণী কলকাতায় ভোরবেলা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের সুরে।

এখনো একই সুরে সুরভিত বাঙালী মনন।

আজও আকাশবাণীতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ বাজিয়ে শোনানো হয়।

রামধন মিত্র স্ট্রীটের গলিতে পা দিলে সময় যেন পিছিয়ে যায় ।বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের হলুদ রংয়ের একটা বিশাল বাড়ির সামনে সাদা পাথরের ফলক। লেখা, স্বর্গীয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। তার নীচে পাথরে খোদাই করা তিনটে লাইন, 'এই বাড়িতেই আমৃত্যু বাস করেছেন বেতারে মহিষাসুরমর্দিনীর সর্বকালজয়ী অন্যতম রূপকার এই সুসন্তান।'

তিনি এখনো বাঙালীর মননে ভাবনায় উদ্ভাসিত।

১৯৭৬ সাল,রেডিয়োতে সে বার মহিষাসুরমর্দিনী প্রচারিত হয়নি। হয়েছিল, 'দুর্গা দুর্গতিহারিণী'। হেমন্ত

মুখোপাধ্যায়ের সুরে যা উত্তমকুমারের মহালয়া বলে প্রচলিত।বাঙালী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলো।আকাশবাণী বাধ্য হয়ে ষষ্ঠীর দিন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া চালাতে বাধ্য হয়েছিলো।রবীন্দ্রনাথ, বিধানচন্দ্র রায় থেকে উত্তমকুমার, তিন কিংবদন্তির প্রয়াণ যাত্রার ধারাবিবরণীও দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। যে রেডিওর জন্য এতকিছু, তারা অবশ্য শেষ বয়সে পেনশনও দেয়নি।

মহালয়ার দিনবদলের ধারায়ও এখনো রয়ে গেছে একই সুরে।মহালয়ার ভোরে বেজে ওঠে সেই সুরভী কন্ঠ-

“জাগো

তুমি জা... আআগো

জাগো দুর্গা

জাগো দশপ্রহরণধারিনী

অভয়াশক্তি বল প্রদায়িনী

তুমি জাগো

জাগো

তুমি জাগো.

প্রণমি বরদা

অজরা অতুলা

প্রণমি বরদা

অজরা আতুলা

বহুবলধারিনী রিপুদলবারিনী

জাগো মা

শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো

জাগো

জাগো মা

জাগো অসুরবিনাশিনী

তুমি জাগো

জাগো দুর্গা

জাগো দশপ্রহরণধারিনী

অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী

তুমি জাগো"

হিন্দুধর্ম মতে, এই বিশেষ পক্ষ পিত্রুপক্ষ, ষোলা শ্রাদ্ধ, কানাগাত, জিতিয়া, মহালয়া পক্ষ ও অপরপক্ষ নামেও পরিচিত।

দেবী শক্তি আদিশক্তি। তিনি মঙ্গলদায়িনী করুণাময়ী। সাধক সাধনা করে সেই দেবীর বর লাভের জন্য। দেবীর মহান আলয়ে প্রবেশ করার সুযোগ করে নেন। তাই এই কারণেও দিনটিকে বলা হয় মহালয়া। মহালয়ার পর প্রতিপদ তিথি থেকে দেবী বন্দনা শুরু হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে দেবীর আরাধনা প্রতিপদ থেকে শুরু হয়। একে বলে দেবীপক্ষ। শেষ হয় পিতৃপক্ষ।

রামায়ণ অনুযায়ী লঙ্কাবিজয় ও সীতা উদ্ধারের জন্য অকালবোধনের আগে এই অমাবস্যা তিথিতেই পিতৃপুরুষ ও মাতৃপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করেছিলেন রাম।

মহাভারত অনুসারে এই দিনে কর্ণ পিতৃমাতৃ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে জলঅন্ন দান করেছিলেন, তা-ও আবার নিজের মৃত্যুর পর স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ফিরে এসে।

বাঙালীর পূজার সুরভিতে শারদ উৎসব এক মহান উৎসব হয়ে উঠেছে।সেই উৎসবের আবহ তৈরী করে দিয়ে যায় মহালয়া।ভার্চুয়াল আধুনিক জীবনে সমাজ এখন ফেসবুক হোয়াটস আপ এ শরতের কাশফুল দেখে মহালয়ার কবিতা লেখে।বিভিন্ন চ্যানেলে শুরু হয়ে যায় নায়িকাদের নিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান ।আজকের এই করোনার অতিমারীর সময়ে মনখারাপের আবহে মহালয়া যেন আনন্দ সুরের আহ্বান নিয়ে হাজির।দেবীর আগমনীতেই শেষ হবে করোনা নামক অসুরের এই আশায় বুক বেঁধে আছে আপামর বাঙালী।

আধুনিকতার রূপাঞ্জলীতে মহালয়ার ঐতিহ্য আজও বাঁধা আছে আহিরীটোলার কালীকৃষ্ণ ভদ্র ও সরলা বলা দেবীর সন্তান বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠের

জাদুতে।মহালয়ার ভোরে ফেসবুক ও হোয়াটস আপ ইন্সট্রাগম এর পাতা উল্টাতে উল্টাতে কোথাও যেনো মনে পড়ে বাড়ির এক কোনে ধূলিধূসরিত রেডিওটিকে।মনে পড়ে আকাশবানী থেকে সম্প্রচারিত মহিষাসুরমর্দিনী।

PENPRINTS PUBLICATION

Publish Your Journal with Penprints

Publish your journal with Penprints. It can be an open-access journal or an institutional journal; we can help you to publish your

journal in the right format. It is always suggested to launch a new journal in OJS (Open Journal System), developed by PKP (Public Knowledge Project).

- Penprints can launch and design your journal in OJS/PKP.
- We can also develop your journal or clone your journal in WordPress.
- We will update your publication and you do not need to deal with technical glitches.

- We can include a citation management system in your journal
- We can also help you to index your journal in major indexing services. But, we can design your journal according to their guideline, and you need to apply for the same.

To know more, you can ask for the quote today, and you can mail us at

admin@penprints.in or penprintspublication@gmail.com

www.penprints.in

বিদ্যাসাগর, আমার ঈশ্বর

সুদীপ ঘোষাল

১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয় সোমপ্রকাশ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনার নেপথ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট অবদান ছিল। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত এটিই প্রথম পত্রিকা যাতে রাজনৈতিক বিষয় স্থান পেয়েছিল। ১৮৫৯ সালের ১ এপ্রিল পাইকপাড়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় [লা স্কুল। কিছুকাল এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন তিনি। ২০ এপ্রিল মেট্রোপলিটান থিয়েটারে উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত নাটক বিধবা বিবাহ প্রথম অভিনীত হয়। ২৩ এপ্রিল রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপট্টির বাসভবনে সেই নাটকের অভিনয় দেখেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিশে গেলে উক্ত সভার সভাপতির পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর গণশিক্ষার প্রসারে সরকারি অনুদানের জন্য বাংলার গভর্নরের নিকট আবেদন করেন। ১৮৬০ সালে বোর্ড অফ একজামিনার্সের পদ থেকেও ইস্তফা দেন তিনি। এই বছরই ১২ এপ্রিল ভবভূতির উত্তর রামচরিত অবলম্বনে তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ সীতার বনবাস প্রকাশিত হয়। কথিত আছে বইখানি তিনি রচনা করেছিলেন মাত্র চারদিনে।

১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারি মনোনীত হন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই বছর ডিসেম্বর মাসে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণে গ্রহণ করেন তার সম্পাদিত হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার পরিচালনভার। ১৮৬২ সালে কৃষ্ণদাস পালকে এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন তিনি। এই বছর তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বাণভট্টের কাদম্বরী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাকে উৎসর্গ করেন স্বরচিত বীরাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬৩ সালে সরকার তাকে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী

নাবালক জমিদারদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮৫৬ সালে এই ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যরচনা 'প্রভাবতী সম্ভাষন' এ বছর রচিত হয়। ১৮৬৪ সালে কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের নাম পরিবর্তন করে কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন রাখা হয়। ৪ জুলাই ইংল্যান্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত করে। খুব কম ভারতীয়ই এই বিরল সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ২ আগস্ট ফ্রান্সে ঋণগ্রস্ত মাইকেল মধুসূদনের সাহায্যার্থে ১৫০০ টাকা প্রেরণ করেন তিনি। ১৮৬৫ সালের ১১ জানুয়ারি ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক হিসেবে বিদ্যাসাগর মহাশয় তার প্রথম রিপোর্টটি পেশ করেন।

১৮৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বহুবিবাহ রদের জন্য দ্বিতীয়বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদনপত্র পাঠান বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই বছরই প্রকাশিত হয় তার পরিমার্জিত আখ্যান মঞ্জরী পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে

জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার সঙ্গে গোপালচন্দ্র সমাজপতির বিবাহ হয়। এবছর অনাসৃষ্টির কারণে বাংলায় তীব্র অন্নসংকট দেখা দিলে তিনি বীরসিংহ গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি অন্নসত্র স্থাপন করেন। ছয় মাস দৈনিক চার-পাঁচশো নরনারী ও শিশু এই অন্নসত্র থেকে অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিল। ১৮৬৮ সালে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামগোপাল ঘোষ প্রয়াত হন। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করেন। এপ্রিল মাসে তার সম্পাদনায় কালিদাসের মেঘদূতম্ প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় উইলিয়াম শেক্সপিয়র রচিত কমেডি অফ এররস্ অবলম্বনে রচিত বাংলা গ্রন্থ ভ্রান্তিবিলাস। উল্লেখ্য, শোভাবাজার রাজবাড়িতে আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে তিনি শেকসপিয়রের পাঠ নেন। কথিত আছে, মাত্র পনেরো দিনে তিনি কমেডি অফ এবর-এর এই ভাবানুবাদটি রচনা করেছিলেন। এবছরই বীরসিংহ গ্রামে তার পৈতৃক বাসভবনটি ভস্মীভূত হয়। চিরতরে জন্মগ্রাম বীরসিংহ ত্যাগ করেন 'বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর।

জন্মগ্রহণ কালে তার পিতামহ তার বংশানুযায়ী নাম রেখেছিলেন "ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়"। ১৮৩৯ সালের ২২ এপ্রিল হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই পরীক্ষাতেও যথারীতি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৬ মে ল কমিটির কাছ থেকে যে প্রশংসাপত্রটি পান, তাতেই প্রথম তার নামের সঙ্গে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর তিনি এই কলেজ থেকে অপর একটি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্ত দেবনাগরী হরফে লিখিত এই সংস্কৃত প্রশংসাপত্রে কলেজের অধ্যাপকগণ ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' নামে অভিহিত করেন।

১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। তাদের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন কালীকান্ত ও চাকর আনন্দরাম গুটিও। কথিত আছে,

পদব্রজে মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসার সময় পথের ধারে মাইলফলকে ইংরেজি সংখ্যাগুলি দেখে তিনি সেগুলি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত করেছিলেন। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের বিখ্যাত সিংহ পরিবারে তারা আশ্রয় নেন। এই পরিবারের কর্তা তখন জগদ্দুর্লভ সিংহ। ১৮২৯ সালের ১ জুন সোমবার কলকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে (যা বর্তমানে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত) ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮২৪ সালে; অর্থাৎ, ঈশ্বরচন্দ্রের এই কলেজে ভর্তি হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর আগে। তার বয়স তখন নয় বছর। এই কলেজে তার সহপাঠী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বিদ্যাসাগরের আত্মকথা থেকে জানা যায়, মোট সাড়ে তিন বছর তিনি ওই শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন।

ব্যাকরণ পড়ার সময় ১৮৩০ সালে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শ্রেণিতেও ভর্তি হন ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮৩১ সালের মার্চ মাসে বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি এবং 'আউট স্টুডেন্ট' হিসেবে একটি

ব্যাকরণ গ্রন্থ ও আট টাকা পারিতোষিক পান। সংস্কৃত কলেজে মাসিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের 'পে স্টুডেন্ট' ও অন্য ছাত্রদের 'আউট স্টুডেন্ট' বলা হত। অন্যদিকে তিন বছর ব্যাকরণ শ্রেণিতে পঠনপাঠনের পর বারো বছর বয়সে প্রবেশ করেন কাব্য শ্রেণিতে। সে যুগে এই শ্রেণির শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। ১৮৩৩ সালে 'পে স্টুডেন্ট' হিসেবেও ঈশ্বরচন্দ্র ২ টাকা পেয়েছিলেন। ১৮৩৪ সালে ইংরেজি ষষ্ঠশ্রেণির ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ৫ টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক হিসেবে পান। এই বছরই ক্ষীরপাই নিবাসী এই ছেলেই একদিন সকলের থেকে বড় হলেন।ইনি হলেন বাঙালির গর্বের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠানো হয়। ১৮২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে কলকাতার একটি

পাঠশালায় এবং ১৮২৯ সালের জুন মাসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করানো হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র এবং ১৮৩৯ সালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি দু-বছর ওই কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, তর্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, হিন্দু আইন এবং ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া প্রতি বছরই তিনি বৃত্তি এবং গ্রন্থ ও আর্থিক পুরস্কার পান।

১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করার অল্প পরেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান পন্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত কলেজের শিক্ষকগণের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের কাজে ইস্তফা দেন এবং ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং পরের মাসে ওই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

প্রাতিষ্ঠানিক উপাধি কী ভাবে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে, তার উদাহরণ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য তিনি 'বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর জায়গায় 'শর্ম্মা' বা 'শর্ম্মণঃ' লিখতেন। তাঁর 'বিদ্যাসাগর' উপাধি শুধু তাঁর কৌলিক উপাধিই শুধু নয়, নামটিকে পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর গুণমুগ্ধবন্ধুকে নিয়ে যে সকল চিঠি লিখেছিলেন তা শুধু মুগ্ধতাই বয়ে আনে না, বহুরূপী ঈশ্বরচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায় সেখানে। সেখানেই ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাসাগর হওয়ার পাশাপাশি 'করুণাসাগর' হওয়ার হদিস মেলে। তবে আম বাঙালির 'দয়ার সাগর' বিশেষণে সুবাসিত হলেও তা বিদ্যাসাগরের মতো তা বিশেষ্য হতে পারেনি।

তিনি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আনেন কলেজের পাঠ্যক্রমে। পূর্বে ব্যাকরণ এবং বীজগণিত ও গণিত শেখানো হতো সংস্কৃতে, কিন্তু তিনি সংস্কৃতের বদলে ব্যাকরণ বাংলার মাধ্যমে এবং গণিত ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানোর নিয়ম চালু করেন। ইংরেজি ভাষা শেখাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেন এবং ইংরেজি বিভাগকে উন্নত করেন। বাংলা শিক্ষার ওপরও তিনি জোর দেন। তবে তারচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তন করেন দর্শন পাঠ্যক্রমে। তিনি সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত এবং প্রাচীনপন্থী বলে বিবেচনা করতেন। সে জন্যে, তিনি বার্কলের দর্শন এবং অনুরূপ পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন এবং তার পরিবর্তে বেকনের দর্শন এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের তর্কশাস্ত্র পড়ানোর সুপারিশ করেন। অনেকে তাঁর সমালোচনা করলেও, তাঁর এ সংস্কার ছিল সুদূরপ্রসারী এবং শিক্ষা পরিষদ তাঁর এ সংস্কারের প্রশংসা করে এবং পুরস্কারস্বরূপ ১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে।

১৮৫৪ সালে চার্লস উডের শিক্ষা সনদ গৃহীত হওয়ার পর সরকার গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশে ১৮৫৫ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের অতিরিক্ত সহকারী স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি এবং মেদিনীপুর জেলায় স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। দুবছরের মধ্যে তিনি এ রকমের বিশটি স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি এসব স্কুলে পড়ানোর জন্যে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। তিনি নিজ গ্রামে নিজ খরচে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

এসব বাংলা মডেল স্কুল ছাড়া, সরকার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন রক্ষণশীল সমাজ মনে করতো যে, স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ। সমাজের তীব্র বিরোধিতার মুখে এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কিনা—সরকার সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না। অন্যদিকে, বিদ্যাসাগর ছিলেন

স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সমর্থক। সরকার সেজন্যে এ কাজের দায়িত্ব দেয় তাঁর ওপর। তিনি বালিকা বিদ্যালয় খোলার বিষয়ে স্থানীয় লোকদের সমর্থনে বর্ধমানে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পরে ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে আরও পঁয়ত্রিশটি স্কুল স্থাপন করতে সমর্থ হন।

কিন্তু শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পরিচালকের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কারণে তিনি এ কাজ বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারেননি। তাই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ এবং স্কুল পরিদর্শকের পদ-উভয় ত্যাগ করেন। এ রকমের উচ্চপদে বাঙালিদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এ সময়ে তিনি বেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সোসাইটির কাজ ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং পরিবার ও সমাজে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির। তিনি স্কুল স্থাপনের জন্যে ধনী জমিদারদেরও উৎসাহ প্রদান করেন।

বিদ্যাসাগর একাধারে সমাজসেবি,সমাজসংস্কারক, পন্ডিত ও মহামানব।তাঁর গুণবর্ণনা করা আমার মত সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।তবু তাঁর স্মরণে আমার এই শ্রদ্ধার্ঘ, কিছুটা হলেও আমার মনে আনন্দ উদ্রেক করে।

তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ও উইকিপিডিয়া থেকে।

The tales of their supreme sacrifice: do they deserve all the times? A view

Kunal Roy

Questioning on the identity and recognition of the female race is really a matter to be read and thought about time

and again. Over the years, she has been humiliated, tormented, disrespected, considered a commodity and above all a creature of blood flesh and muscles that is meant for the physical gratification. Protest, an alien to her mental make up. But whenever she has tried to raise her voice or claim her rights, she has been either throttled to death or made to sacrifice to prove her worth before the social milieu. The tale of injustice is still imprinted on their conscience. The heart still bleeds profusely. The cry if the soul still tears apart the sky! Instances from the past bear a strong testimony to the upheaval fettle of the woman race. Little do we realise their role and importance in the growth of our society. This is one of the reasons behind the disparity in the men women ratio. And even the ages don't know when the darkness will be dispelled and they will get back their honour and glory anew!

Let us look back to a few events which still manage to send the chill down our spine. We may not feel ashamed as the tendency of the masculine race is to smear them with blood! To make them comprehend their position, which is in fact nothing but below their feet? It seems every moment the rose is crushed under the wheels of chauvinism and vanity. This not only brings forth the grains of ego but also the devilish delight in the accepted sense of term!

Each one of us is aware of the birth history of the Lord Krishna. But a handful only knows that the Bhagavati Adishakti took her form at the same hour who predicted the death of Kangsha at the hands of Krishna. Yet the place of Goddess was a temporary one here. Her existence was sacrificed for the sake of magnifying the image of the Lord, the hero of the epic! It is worth mentioning

that the Goddess who is primordial force behind the entire creative process had to take a back seat here to show the strength of the masculine gender.

On the other hand, if we focus on the two primary characters of the Mahabharata namely Draupadi and Chitrangada, differences of poles apart nature can be judged without a further doubt. Draupadi, the dark, heavenly maiden, born off the fire could not escape the severe humiliation, as her mother in law Kunti, without even noticing her, asked her five sons to get her divided among them. Something she embraced willingly for the betterment of the society at large.

While Chitrangada, the princess of Manipur who was taught every lesson on the tactics of warfare by her father and brought up like a son, who would be enthroned after him, had become a deprived wife, despite being loyal. Her

identity got muddled like the rest of the women! Though she managed to surface her hidden woman facets, seduced Arjuna and married her to, a number of questions still lurk at the corner of one's heart. Wasn't she too manly for any one's liking? Wasn't she ill bred, a misfit in the matters of heart and to be someone's arm? The answers are still too crucial to define! Tagore says she prayed. To be granted femininity, to be allowed beautiful. She prayed for a miracle, a transformation to become a girl for a year to fulfil all her natural wishes. Here too it is noticed she was made to sacrifice, moved away from what she actually wanted or deserved to have. She, in fact realised that under the hegemony of Indraprastha, Manipur would be fortified and remain fearless against the alien attacks. And not Arjuna who only enjoyed some typical moments of romance with her! Moreover, it is surprising to note that the tale of sacrifice didn't stop here! The tales of such

supreme women are beyond any conventional description.

Remember how Khana, the daughter of Moi Danob and daughter in law of Baraha, the much famed astrologer of his times had to sacrifice her life by getting her tongue split into halves to teach the lesson of immortal sacrifice to the society. She was supposed to hold an honourable position in the King's court after counting the number of stars in the blue sky. But the clash of ego and vanity made her lay down her life before the image of Lord Shiva. How painful it is! How awful it is!

Myriad illustrations are there to illumine and glorify their tales of supreme. But there had been hardly an instance where they belittled themselves; rather at every single step they sharply showed the essence of sacrifice. After all it takes a lot of mental stamina to sacrifice oneself to teach the "lessons of immortality". However, the incorrigible masculine race

will never be able to comprehend an iota of this axiom!

Focusing on Amrapali, the beautiful woman of Vaishali willingly chose to be the Nagarbadhu. This was simply because her father could not assure enough security for his daughter. Later her transformation into a court dancer and eventually seeking the path of peace bore a strong testimony to her nature of sacrifice to protect the society from every single bit of ill domination!

The Rajputs had never stayed behind this saga of willing sacrifice (on the part of the female race). Padmini of Chittor saved her honour and chastity, not enforced (as appeared), but a willing celebration of her life. Something to ponder on, something to get reviewed by the male chauvinist society!

A little after, if we have a look into the matter of our freedom struggle, the immense sacrifice and the contribution of the female race can be easily noticed and judged. Despite being put behind the bars and the inhuman torture where the teeth were broken, nails were ripped off, hair was cut and lips were burnt, they did not open their mouth. They knew their purpose well. The sacrifice made by them for the liberation of the society from the foreign yoke deserves a special mention here. Days fly away but the echoes of sacrifice can still be heard even in the cracks and fissures of a dilapidated mansion, tucked away at the farthest corner of the nation!

At this very hour when the 'SciTech' scenario has reached the tip, women are not behind men. They are working at par with the masculine gender. Yet torment refuses to leave them. Harmony is mercilessly destroyed by the discordant

notes. They are beaten up, thrashed, tortured, ravished and even slaughtered. The 'passive status' is never considered to be an act of complement in the whole process, but a sense of banality works with profundity!

On the other hand, it is worth mentioning that though domestic violence is more, divorce is not younger than among those residing overseas. As global divorce rates rise, studies show that India ranks the lowest in the world- at less than 1 percent. Luxembourg has the highest rate, at 87 percent and US records 46 percent.

The girl child is a curse, especially by the people of the remote corners. The abortion of the female embryos is the order of the day. A little girl child's mouth is immersed in a bowl of milk containing the hemlock extracted from Dhutrophul's seeds to make her die on her mother's lap. Such examples are scattered all over the world. A timeless

act. Time fleets away but the stories of their sacrifice will hopefully never end. Will the society ever understand this? Will it ever display its respect to them? Else the days are not faraway when an imbalance will be created to wreak havoc. Time to fathom, realise and apply. Are you listening?

মায়ের আগমনী সুরে

রূপম চক্রবর্ত্তী

শ্রী মায়ের আগমনী সুরে ভক্তপ্রাণে আনন্দের দোলা লাগে। ছুটে চলে সবাই মায়ের শ্রী চরণে অঞ্জলি দিতে। শ্বশুর আলয় থেকে মেয়ে আসবে বাপের বাড়িতে। তাই সকলের মুখে হাসির ধারা বহমান। পাড়া প্রতিবেশীর চোখে ঘুম আসে না, সবাই চেয়ে আছে নতুন প্রভাতের দিকে। সবার একটাই আকুতি কখন তাদের মেয়ে ঘরে আসবে, কখন তাদের মেয়েকে শিউলি ফুলের মালা গেঁথে পড়াবে। বার্তা প্রেরকের ভূমিকা নিয়ে মহালয়া আসে। বাপের বাড়িতে শুরু হয়ে যায় প্রেমানন্দের সমারোহ। ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ ভক্ত সজ্জনদের কাছে মহালয়া তিথি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহালয়া এলেই বাংলার মাটি -নদী –আকাশ প্রস্তুত হয় মাতৃপূজার মহালগ্নকে বরণ করার জন্য। কাশফুল ফুটলে শরৎ আসে, না শরৎ এলে কাশফুল এসব নিয়ে বিস্তর তর্ক চলতে পারে। কিন্তু মহালয়া এলেই যে দুর্গাপূজা এসে

যায়, তা নিয়ে তর্কের কোনও অবকাশ নেই। মহালয়া এলেই সেই দেবী -বন্দনার সুর ধ্বনিত হয় বাংলার হৃদয়ে। দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের আওয়াজ। বুকের মধ্যে জাগে আনন্দ -শিহরিত কম্পন , মা আসবেন সে ই অপেক্ষায় থাকে ভক্তকূল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়,

“আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জুরি দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদ লক্ষ্মী,
তোমার শুভ্র মেঘের রথে।“

যে মেয়ে বাপের বাড়িতে আসবেন তিনি দুর্গ তিনাশিনী মা দুর্গা। তিনি অসুর বিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী। মহিষাসুরকে যুদ্ধে তিনি নিহত করেছিলেন। মহিষাসুর রম্ভ নামক এক অসুরের পুত্র ছিলেন। দুর্দান্ত মহিষাসুর দেবতাদেরকে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। রাজ্যহারা দেবতারা বিষ্ণুর কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা

করলেন। সকলে মিলে কঠোর তপস্যা য় বসলেন। তাদের তপস্যা প্রভাবে দেহ থেকে তেজ বিনির্গত হল। সেই তেজ সম্ভুত দেবী মহামায়া দুর্গা। নানাবিধ অলংকার ও বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবী অট্টহাস্য করে ঘন ঘন গর্জন করতে লাগলেন। ভয়ংকর যুদ্ধে মহিষাসুর দেবীর কাছে পরাজিত হলেন। যিনি উগ্রভাবে জগৎকে কামনা করেন তিনি মহিষাসুর। কাম, ক্রোধ,লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের ঘনীভূত মূর্তি মহিষাসুর। এই অশুভ অহংকারী অসুরকে মা যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। জগতের প্রায় প্রতিটি জায়গায় প্রতিনিয়ত এই সুর আর অসুর শক্তির সংগ্রাম চলছে। মহাশক্তির প্রভাবে সুরশক্তি অসুরশক্তিকে পরাজিত করতে পারে।

প্রতিটি মানুষ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ। সংসারের ঘুর্ণিপাকে ঘুরতে ঘুরতে মানুষ হয়ে পড়ে স্বার্থান্ধ। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারকল্পে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়ে হিংসার দাবানলে নিজেকে দহন করতে থাকে। কেউ বা চায় অন্যকে ছোট করতে আর কেউ বা চায় পরের

সম্পত্তি দখল করে নিজেকে বিত্তশালী করে সমাজে উপহার দিতে। কেউ বা চায় অপরজনকে জুলুম নির্যাতন করে তার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা। আমরা পূজো বাড়িতে যখন যায় তখন দেখি মায়ের পদতলে বিজিত মহিষাসুর। আবার মায়ের উপরে থাকে মঙ্গলের প্রতীক শিব। এখানে একটা অনুপম শিক্ষা আমরা মাতৃকাঠামো থেকে পেয়ে থাকি। মঙ্গলকে ধারণ করে আমাদের শক্তি দিয়ে সেই অসুর শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। পশুশক্তি এত বেশি বেড়ে গেছে যার প্রেক্ষিতে এখন সমাজে শুভশক্তির মানুষগুলো দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। স্বার্থান্ধ মানুষগুলোর অনাচার সহ্য করার সীমা সংকুচিত হচ্ছে। মা দুর্গা সেই পশুশক্তি স্বরূপ স্বার্থান্ধতা নামক দুর্গম অসুরের হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন। মা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এসে আমাদের রক্ষা করেছেন। দেবী ভাগবতে আছে,

সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহ হেতবে।।

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হইয়া ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য রূপ ধারণ করেন। মা

এত করুণাময়ী কেউ থাকে সকামভাবে ডাকুক অথবা নিষ্কামভাবে ডাকুক তিনি মায়ের কৃপা অবশ্যই পাবেন। মা জগৎজননী আমাদের সৃষ্টি করেন এবং তিনিই আমাদের মায়ামোহে আবদ্ধ করে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করছেন। মাকে নিষ্কামভাবে আরাধনা করলে তিনি আমাদের কৃপা করেন।

মাতৃভাবনা জাগ্রত করার অনুপম শিক্ষা পেয়ে থেকে দুর্গা পূজার মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন , তোমরা যাকে ব্রহ্ম বল আমি তাকে মা বলি , মা অতি মধুর নাম। প্রতিটি ঘরে ঘরে মাতৃজাতি সম্মান লাভ করুক। মাতৃ আরাধনা তখনই স্বার্থক হয়ে উঠবে , যখন ঘরে ঘরে দূর্গার মত মেয়েদের প্রকাশ ঘটবে। বছর বছর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দুর্গতিনাশিনীর আরাধনা করেও কেন আমাদের দূর্গতি দূর হচ্ছেনা তা এখন ভেবে দেখতে হবে। পূজার মর্ম কথা আমাদের জানতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বললেন,

‘পূজা পার্বন তুই যতই করিস,

ফুল, তুলসী, গঙ্গা জলে
অনুশীলনী কৌশল ছাড়া,
ফল পাবে না কোন কালে।’

তাই, দূর্গা পূজা কেবল মাত্র পুস্প বিল্বপত্রের এবং ঢাক-ঢোলের পূজা নয়। এ পূজা মানবতার এক বিরাট মিলন উৎসব। ঈশ্বর এক , অদ্বিতীয় ও নিরাকার। বিভিন্ন দেব -দেবীও এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির প্রকাশ মাত্র। ভক্ত ঈশ্বরের প্রতীক। মূর্তিতে তার হৃদয়ের অর্ঘ্য দেবতার পাদপদ্মে নিবেদন করে করুণা লাভের চেষ্টাই পূজা বা উপাসনা। তাই পূজারী আরাধ্য দেবতার মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে চিন্ময়ী জ্ঞানে অর্চনা করেন। ভক্তের হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তিতে মৃন্ময়ী মূর্তি তার মানসলোকে চিন্ময়ী হয়ে ওঠে।

PENPRINTS PUBLICATION

You PEN, We Print
PUBLISH YOUR BOOK WITH US

100% royalty
Available on Amazon and Google Books
Hardbound with Jacket / Paperback
ISBN
Promotion / Posters / Visiting Card
Free book reviews
Author's page

To know more, please send your manuscript and book proposal to admin@penprints.in or penprintspublication@gmail.com

www.penprints.in

(একাঙ্ক নাটক)

তিন সত্য

(লিও তলস্তয়ের "হোয়াট মেন লিভ বাই" গল্প অবলম্বনে)

নাট্যরূপ: সুব্রত দত্ত

চরিত্রলিপি : শ্যামল রুইদাস, ময়না (স্ত্রী), পুঁটি (কন্যা), মাইনকা (শিশুপুত্র), মিলন, অনঙ্গ মিত্র (নেতা), ফটকে (চ্যালা), সুমিতা, মঞ্জু (ছ'বছরের মেয়ে।

[মিউজিকের সাথে পর্দা উঠলে আলোতে দেখা যায় সন্ধ্যা নেমেছে। আপ স্টেজে গ্রাম্য রাস্তায় শ্যামল রুইদাস ঢুলে ঢুলে হাঁটছে আর কাঁপা গলায় গান

গাইছে। হাতে ঝুলছে এক জোড়া চটিজুতো, কেউ সারাতে দিয়েছে]

শ্যামল : "বিপিনবাবুর কারণসুধা মেটায় জ্বালা

মেটায় ক্ষুধা, মরা মানুষ বাঁচিয়ে তোলে...

[পড়ে যেতে গিয়েও টাল সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে]

শালা, আমার পাওনা ট্যাহা আমারে দিলো না! শালা হারামির বাচ্চা সব। থু! সব্বারই হাত ফাঁকা। আর আমার যেন ট্যাহার গাছ আছে। পোলাপানগো লাইগ্যা সোয়েটার কিন্যা বাড়িত লইয়া যামু ভাবছিলাম। দূর ছাই। চুল্লু খাইয়াও তো ভুলতাসি না। কিন্তু ঠাণ্ডা আর লাগতাসে না তো! হ্যাঁ, সারা জেবন আর আমার জ্যাকেট না কিনলেও চলবো। [চলতে শুরু করে] কিন্তু ময়না..! [আবার আতঙ্কে দাঁড়িয়ে পড়ে] ইস, ময়নারে যে কি কমু। আইজ আমারে শ্যাষ কইরা থুবে। [হাঁটতে শুরু করে] যা হওয়ার হইবো। কপালে যা আছে তারে

খণ্ডাইবো ক্যাডা? [গান] "আজ যে রাজা কাল সে ফকির, বরাতের ... [গান থামিয়ে ঢোক গেলে। সামনে মন্দিরের দেয়ালে কিছু একটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে বলে]

ঐডা আবার কি সাদা সাদা? হে ভগবান, একেই তো ঠাণ্ডায় কাবু। তার উপরে এমন কইরা ভয় দ্যাখাইতাসো কেন!

*** *** *** ***

[আপ স্টেজের আলো নেভে। ডাউন রাইট স্টেজে আলো জ্বলে। দারিদ্রের নিদর্শন একটা ঘর। বারান্দার ডানদিকে বেঞ্চ পাতা। তার ওপরে ঘরের জানালা। মাঝে দরজা। বাঁদিকে জুতো সেলাইয়ের সরঞ্জাম। বাঁশ আর পুরোন পলিথিন শিটের নিচু চালা। বারান্দায় ময়না শ্যামলের ছেঁড়া জামা সেলাই করছে। মাইনকা তার পিঠের ওপর ভর দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরেছে। পুঁটি ময়নার কেটে রাখা জ্বালানি কাঠ গুছিয়ে রাখছে]

মাইনকা : কি আনন্দ না মা? ও মা, সত্যিই আমাগো নতুন সোয়েটার আনবো বাবা?

পুঁটি : হ, আনবোই তো। আমারডা লাল

রঙের হইলে ভালো হয়।

মাইনকা : আমার তো কালা ভালো লাগে।

ময়না : না, কালা রঙ কুষাইট্টা।

পুঁটি : মা, বাবা কি অনেক টাকা লইয়া গ্যাছে?

ময়না : হ, আমার খুটিতে জমানো ছয়শ' ট্যাহা লইয়া গ্যাছে। পাওনাদারদের থিকা আরো হাজার দেড়েক পাইবো। তগো তো আনবোই, তর বাবারও একটা লাগে। দ্যাখ না, আমার লম্বা জ্যাকেটখান তর বাবাও পরে। আইজও ঐখান পইরা গ্যাছে।

মাইনকা : বাবায় তো কিনবার পারে। কেনে না কেন?

ময়না : না রে, সংসার চালাইয়া আর পাইরা উঠে না। আচ্ছা, তরা আইজ পড়তে বসবি না?

পুঁটি : না মা, আইজ পড়ুম না। আনন্দের দিন, শুদ্ধু আনন্দ করুম আইজ।

ময়না : ঠিক আছে। ছাইড়া দিলাম। [পুঁটির দিকে তাকিয়ে হাসে] আলো নেভে। মিউজিক।

***   ***   ***

[আপ স্টেজে আলো জ্বলে। আতঙ্কিত শ্যামল একটু ডান দিকে বেঁকে লেফ্ট মিডল স্টেজে একটা মন্দিরের দেওয়ালের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগোয়]

শ্যামল : ঐডা কি পাথর? নাঃ, সে তো কুনো দিন দেখি নাই! তাইলে কি গরু? অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারতাসি না। উঁহ! নাকি ভূত? ওরে বাবা। ঘাড় মটকাইয়া দিবো না তো! ধুর, নেশার ঘোরে কি যে বলি। ভূত কি ঐভাবে চুপ কইরা বইসা থাকে? মানুষের মতো লাগতাসে! [ভয়ে] কিন্তু মরা মানুষ না তো? নাঃ, দ্যাখতেই হয় ব্যাপারখান। [কাছে গিয়ে] হ্যাঁ, মন্দিরের দেওয়ালে হেলান দিয়া বইসা আছে একখান মানুষ! দেহি তো! এ মা, ছিছি ছি। এক্কেবারে ল্যাংটা! আচ্ছা, কেউ অরে খুন কইরা এইহানে রাইখা যায় নাই তো!

নাঃ,

ঝামেলায় জড়ানোর কাম নাই। পলাইয়া যাই। [দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়] কিন্তু

একখান মাইনষেরে এইভাবে ফেইল্লা রাইখা যাই ক্যামনে! ওই তো, একটু নইরা উঠলো যেন! নিচ্চয়ই ঠাণ্ডায় কাবু হইয়া পড়সে।

[নিজের জ্যাকেটটা খুলে যুবকটিকে দেয়]

আগে এইডা পইরা ন্যাও। পরে কথা কইবা। হ্যাঁ, এইবার চটিখান পরো দেহি। এট্টু ছেঁড়া আছে। হরিপদর ছেঁড়া চটি, ঠিক করতে দিসে। হুঁ, অহন হাঁটো। ঠাণ্ডা কম লাগবো। হাঁটতে পারবা তো? কি হইলো, কথা কও না কেন? এই দিকে আসো। [তাকে ধরে একটু হাঁটিয়ে নেয়] তুমি কুথায় থাকো কও তো।

মিলন : এই অঞ্চলে নয়।

শ্যামল : সে তো জানি। এই অঞ্চলের হক্কলরে আমি চিনি। কিন্তু তুমি এইহানে আইলা ক্যামনে?

মিলন : তা বলতে পারবো না।

শ্যামল : তোমার নাম কি?

মিলন : মিলন।

শ্যামল : মিলন কি? এই আমার নাম যেমন শ্যামল

রুইদাস। তেমন তোমার পদবি কি?

মিলন : জানি না।

শ্যামল : কও কি? কেউ তোমারে মাইর দিসিলো?

মিলন : আমাকে কেউ মারে নি। ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।

শ্যামল : ঈশ্বর তো সব জায়গাতেই আছেন। কিন্তু তোমার তো কুনো আস্তানা আছে?

মিলন : আমার কাছে সব জায়গাই সমান।

শ্যামল : এ তো মহা ঝামেলায় পড়লাম। ঠিক আছে, তুমি আপাতত আমার বাড়িত চলো। ধুত্তোর, কুথায় শীতের কাপড় লইয়া বাড়িত যামু। তার বদলে একখান ল্যাংটা মানুষ লইয়া যাইতাসি। ময়না কি আমারে ছাইড়া দিবো? কপালে যে কি আছে, কে জানে! ধ্যাৎ, যাই তো আগে। তারপর দেখন যাইবো।

[ওরা হাঁটতে থাকে। আলো নেভে। শ্যামলের বাড়ির আলো জ্বলে]

ময়না : মানুষটা অহনো ফেরে না কেন? এতক্ষন আসে নাই যখন, নিচ্চয়ই খাইয়া আইবো।

আইজ যা রুটি বানাইছি, উনি যদি না খায় কাইল কিছুটা হইয়া যাইবো। আইজ তো সদাই কইরা ফিরবো। কত্ত সকালে গেছে, এতক্ষণে তো ফেরার কথা! কি জানি, খাইলো কিনা, এমন ভোলাভালা মানুষ দেখি নাই। নাকি আবার কুথাও মজা লুটতাসে। [বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ময়না কাপড়ে সুঁচ ঢুকিয়ে রেখে বাইরে আনন্দে উঁকি দেয়। সেলাই করা জামাটা ঘরে রেখে আসে]

ওই পুঁটি - মাইনকা, তগো বাবা আইলো মনে হয়!

[বাচ্চারা আনন্দে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। শ্যামল মিলনকে নিয়ে প্রবেশ করে]

শ্যামল : আসো আসো। এই হইলো গিয়া আমার বাসা। লজ্বার কি আছে। আরে আইসা পরো।

ময়না : [কোমড়ে হাত রেখে সামনে যায়] কি ব্যাপার, খালি হাতে ফিরলা যে? সাথে একটা ল্যাংটা মাইনষেরে লইয়া আইসো? উঃ, কি গন্ধ, ছিঃ! মদ খাইয়া ফুর্তি কইরা এতটা সময় কাটাইয়া আইসো! লজ্বা করে না তোমার?

একটাই জ্যাকেট। তাও অরে দিয়া থুইসো?

[কর্ণপাত না করে শ্যামল মিলনকে বারান্দায় নিয়ে যায়। পুঁটি আর মাইনকা ভেতরে যায়]

শ্যামল : এই বেঞ্চিতে বসো।

[মিলন মাথা নিচু করে বসে। হাত দু'টো হাঁটুর ওপর। ময়না আরো ক্ষেপে যায়]

আরে ময়না, রাত্তিরের খাবার বানাও।

ময়না : পারুম না। [ছিটকে দূরে যায়]

শ্যামল : রাগ করে না সোনা। ছিঃ, ও কি ভাবতাসে! আচ্ছা, কি রান্না করসো হেইডা কও।

ময়না : না, আমি মাতালগো লাইগ্যা রান্না করুম না।

শ্যামল : ওঃ ময়না, আগে শুনবা তো, লোকটা কেমন।

ময়না : না, আগে কও, তুমি ট্যাহাগুলান কি করসো।

শ্যামল : [পকেট থেকে টাকা বের করে] এই যে ট্যাহা। তিনকড়ি দেয় নাই। কাইল দিবো

কইসে। আর নীলকমল বাড়িত আছিলো না।
অর বউ কইলো সামনের হপ্তায় দিবে। ট্যাহা
না দিলে আমি কি করুম, কও।

ময়না : [ছোঁ মেরে টাকা নিয়ে] আমি পারুম
না। যত রাইজ্যের মাতাল ল্যাংটা মাইনষেরে
আমি খাওয়াইবার পারুম না।

শ্যামল : ওহো ময়না, আগে শোন লোকটা ...

ময়না : কুনো কথা শুনুম না। [কাঁদে] এই
বিয়াতে আমি রাজি ছিলাম না। আমার মা জোর
কইরা বিয়া দিলো। মায়ে যা গয়না আর জিনিষ
পত্র দিসিলো, সব তুমি উড়াইসো। আইজ
পাঠাইলাম শীতের কাপড় কিনতে, হেইডাও মদ
খাইয়া উড়াইয়া দিলো!

শ্যামল : আরে বাবা, মাত্র সত্তুর ট্যাহায় এক বতোল
দিশি মাল খাইসি। তাতে হইলোডা কি?

ময়না : আবার কয়, তাতে কি হইলো!
[ঝাঁপিয়ে কলার চেপে ধরে] আমার
জ্যাকেট আমারে ফিরাইয়া দ্যাও। তারপর
জাহান্নামে চইলা যাও। মাতাল কুইত্তা

কোথাকার! চইলা যামু আমি। থাকুম না আর। [কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে মিলনের দিকে তাকায়] হায় হায় রে, মদ গেলনের লাইগ্যা গায়ের জামা কাপড়ও বিক্রি কইরা দিছো? এ কেমন তরো মাতাল!

শ্যামল : আঃ ময়না, আগে শুনবা তো ঘটনা কি হইছে।

ময়না : শুননের কম নাই। এ যদি ভালোই হবে, তাইলে অর জামা কাপড় নাই কেন?

শ্যামল : আরে শুনো আগে, তারপর কথা কইও।

ময়না : কও, কি কইবা।

শ্যামল : আমি ঐ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়া আইতাছিলাম। দেহি সাদা মতো কি যেন পইরা আছে। পরথমে এট্টু ভয় ভয় লাগতাছিলো। সাহস কইরা সামনে যাইতেই দেহি এই ঠাণ্ডায় কাবু হইয়া কুঁকরাইয়া পইড়া আছে। তহন এই জ্যাকেট খান অরে পরতে দিয়া হরিপদর ছেঁড়া চটি

পরাইয়া দিলাম। এমন দেবদূতের মতন চেহারার মানুষ কি খারাপ হইতে পারে? ঠিকানাও কইবার পারে না। তাই তো বাড়িত লইয়া আইলাম।

[মিলন মাথা নিচু করে চোখ দু'টো কুঁচকে থাকে আঘাতে। ময়নার একটু মায়া হয়। সে ঘরে ঢোকে]

শ্যামল : বুঝলা ভায়া, ময়নার উপরটাই ওই রকম রাগী। ভেতরটা একদম নরম। আইজ অর রাগ করাটা স্বাভাবিক। এত আশা কইরা অপেক্ষায় ছিলো, শীতের পোশাক ...

[ময়না দু'টো থালায় রুটি আর গুড় নিয়ে বারান্দায় আসে]

ময়না : এই যে ভালো মানুষের পো, খাইতে বসো।

[দু'জনের সামনে খাবার দেয়। মিলন খেতে বসে ময়নার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। এই প্রথম। তারপর খেতে শুরু করলো দু'জন]

ময়না : তোমার বাড়ি কুথায়?

মিলন : এই অঞ্চলে নয়।

ময়না : মন্দিরের পাশে আইলা ক্যামনে?

মিলন : বলতে পারবো না।

ময়না : তোমার সব কিছু চুরি করলো ক্যাডা?

মিলন : ভগবান আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।

ময়না : তাই কি তুমি ল্যাংটা হইয়া পইড়া ছিলা?

মিলন : আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম। উনি দয়া করে না বাঁচালে আমি বাঁচতাম না। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

[ওদের খাওয়া শেষ হয়। ময়না সেলাই করা জামাটা মিলনকে দেয়। ঘর থেকে একটা পাজামাও এনে দেয়]

ময়না : ন্যাও। ঘরের পিছনে এইগুলা পইরা ন্যাও। তারপর এই বেঞ্চিতে শুইয়া পড়ো।

[মিলন সেগুলো নিয়ে পেছনে যায়]

এই শুনছো, ঘরে তো খাবার কিছুই নাই। কাইল যে কি খামু। ওই মলিনার কাছ থিকা হাওলাত নিমু। কি আর করুম।

শ্যামল : হ, কাইলকার দিনডা কুনো রকমে চালাইয়া দ্যাও। দেইখো, সব ঠিক হইয়া যাইবো।

ময়না : হুঁহ, তুমি আর কথা কইও না।

শ্যামল : [ময়নার গলা জড়িয়ে]এই লাইগ্যাই তোমারে এত্ত ভালোবাসি।

[ময়না লজ্জা পেয়ে হাত ছাড়িয়ে দেয়]

ময়না : মরণ! এট্টুও লজ্জা নাই। ওই মানুষটা দেইখ্যা ফেলবো না!

[মিলন এসে জ্যাকেটটা শ্যামলের হাতে দেয়]

শ্যামল : না, এইডা তুমি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়ো। আমাগো আর বাড়তি ক্যাথা নাই।

[মিলন বেঞ্চে শুয়ে পড়ে। শ্যামল আর ময়না ঘরে

চলে যায়। মিউজিকের সাথে আলো নেভে।

পরের সকাল। মিউজিক, আলো। শ্যামল আর মিলন কাঁচের গ্লাসে চা খাওয়া শেষ করে]

ময়না : আমি মলিনাগো বাড়িত যাই। এট্টু চাউল হাওলাত কইরা আনি। [বেড়িয়ে যায়]

শ্যামল : শুনো ভায়া, প্যাটে তো খাবার লাগে। আর পরনে জামা কাপড়। পেত্যেককেই উপার্জন করতে হয়। তা তুমি কি কাজ জানো?

মিলন : আমি কিছুই জানি না।

শ্যামল : জানি না মানে? এতদিন কি করলা তাইলে? বাপের হোটেলে খাইছো আর ফুটানি মারছো। তাই না? ইচ্ছা থাকলে মানুষ কুনো একটা কাম ঠিকই করতে পারে।

মিলন : মানুষ কাজ করে, তাহলে আমিও করবো।

শ্যামল : তুমি তো নিজের সম্পর্কে কিছুই কইলা না। হেইডা তোমার খুশি। কিন্তু তোমারে তো ট্যাহা কামাইতে হইবো। আমি তো তোমারে বসাইয়া খাওয়াইবার পারুম না।

মিলন : হ্যাঁ। তা ঠিক।

শ্যামল : হুঁ ঠিক আছে, আমি যেই কাজ দিমু হেইডা তুমি করবা। তাইলে তোমারে খাইবার দিমু।

মিলন : ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। নিশ্চয়ই করবো। তুমি বলে দাও কি করতে হবে।

শ্যামল : হ, এই দ্যাহো, এইডারে কয় তুরপুন সুঁই। আগায় একখান খাঁচ আছে। পরথমে চামড়ায় এইভাবে ঢুকাইতে হয়। তহন মোটা সুতাটা ওই খাঁচে বাজাইয়া চামড়ার উল্টা পাকে টাইনা

আইনা এইভাবে গিট্টু মারতে হয়। এইরকম কইরা
লাইন বরাবর সিলাই হইয়া যাইবো। তুমি এট্ট চেষ্টা কইরা দ্যাহো। ঠিকই পারবা।

মিলন : হ্যাঁ, পারবো তো। দেখি ...

[মিলন সেলাই করতে থাকে। শ্যামল আনন্দে লাফিয়ে উঠে]

শ্যামল : বাঃ! এই তো শিখা গেছো।

[মিউজিকের সাথে আলো নেভে। আলো জ্বললে দেখা যায় ওই পরিবারের পরিবর্তন। পোশাকও ভালো হয়েছে। শ্যামল আর মিলন বারান্দায় কাজ করছে। পুঁটি আর মাইনকা স্কুলে যাচ্ছে। ময়না গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসে]

ময়না : এইযে ভালো মানুষের পো, তোমার এত সুন্দর কামের লাইগ্যাই আমাগো সংসারের হাল ফিরছে। ভগবান তোমার ভালো করুক।

[মিলন কোনো কথা বলে না। ভাবলেশহীন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাইরে গাড়ির হর্ণ বাজে। কেউ একজন হাঁক দেয়, "ভাই বাড়ি আছো নাকি?"

শ্যামল বাইরে যায়। তার সাথে নেতা অনঙ্গ মিত্র আর তার চ্যালা ফটকে প্রবেশ করে। অনঙ্গ আড় চোখে ময়নাকে দেখে নেয়। ময়না ঘোমটা টেনে ঘরে চলে যায়। অনঙ্গ ফর্সা, ফোলা ফোলা গাল, ষাঁড়ের মতো গর্দান, চুড়িদার পাঞ্জাবির ওপর জহর কোট আর চোখে সানগ্লাস]

ফটকে : এই যে মোসাই, এনাকে চেনেন?

শ্যামল : না মানে ঠিক...

ফটকে : আরে ইনি হলেন আমাদের দাদা এখানকার সব্বময় কর্তা সব্বার নেতা অনঙ্গ মিত্ত।

শ্যামল : [নমস্কার করে] আসেন, আসেন কত্তাবাবু। ওই বেঞ্চিতে বসেন।

অনঙ্গ : ঠিক আছে, ঠিক আছে। [বারান্দায় উঠতে গিয়ে নিচু চালাতে মাথায় আঘাত লাগে। সবাই উৎকণ্ঠিত] উঃ, ঘরটাও বানাতে পারো না।

ফটকে : দাদা এত্ত বড় নেতা। তোমার বাড়িতে এসেচেন, তাতে ধন্য হয়ে যাও। সেবা যত্ন করো।

অনঙ্গ : এই থাম। এখানে বড় মুচি কে?

শ্যামল : আইজ্ঞা আমি।

অনঙ্গ : হুঁ। তোমার বৌটা কিন্তু বেশ সুন্দরী!

শ্যামল : জুতা ...

অনঙ্গ ও ফটকে : কি?

শ্যামল : বানাইবার দিবেন তো?

অনঙ্গ : ও হ্যাঁ, এই ফটকে, চামড়াটা নিয়ে আয় তো!

[ফটকে বাইরে যায়। অনঙ্গ বারবার টাক ঢাকা চুল হাত দিয়ে ঠিক করে নেয়। তারপর উঠোনে নেমে এদিক ওদিক হেঁটে গান গায়, যেন কোনো স্টেজে গাইছে মাইক্রোফোন হাতে]

অনঙ্গ : "এত কাছে রয়েছো তুমি

আরো কাছে তোমাকে যে চাই
তুমি ছাড়া এমন আপন
আমার যে আর কিছু নাই।
সঙ্গী, অমর সঙ্গী, আমরা অমর সঙ্গী।

শ্যামল : বাঃ, আপনি তো সোন্দর গানও করতে পারেন!

অনঙ্গ : হ্যাঁ। আমাকে তো বিভিন্ন জায়গায় স্টেজে গান গাইতে হয়। আর এই গানটাই আমি বেশি করি। মিটিংয়ে আমার কথা শুনবে কি! গানেই

সবাই মাত হয়ে যায়।

[ফটকে কাগজে মোড়ানো একটা চামড়ার বান্ডিল নিয়ে আসে]

অনঙ্গ : হ্যাঁ, ওটা খুলে ওকে দে।

ফটকে : এই নাও। এমন চামড়া দেকেচো কখনো? বিদেস থেকে দাদা এনেছেন। দাম কত জানো?

শ্যামল : বাঃ, খুব সোন্দর চামড়া! এইরকম চামড়া দেখুম ক্যামনে?

অনঙ্গ : হ্যাঁ, জার্মানী থেকে এনেছি। শোনো, এই চামড়া দিয়ে সুন্দর একটা শু, মানে জুতো বানিয়ে দেবে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে যেন এটা কুঁচকে না যায় বা সেলাই খুলে না যায়। যদি সেটা পারো তবেই অর্ডার নেবে। না পারলে আমি ফেরত নিয়ে যাচ্ছি। কি পারবে? [শ্যামল ইশারায় মিলনকে জিজ্ঞেস করে। মিলন অর্ডার নিতে বলে]

শ্যামল : হ, পারুম।

অনঙ্গ : তাহলে মাপটা নিয়ে নাও। কাল এটা নিয়ে যাবো। অন্য কাজ ফেলে এটাই এখন করবে।

[অনঙ্গ বারান্দায় ওঠে। মিলন অনঙ্গ-র পেছনে

তাকিয়ে হাসে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। আলোতে সে ফোকাসড হয়। শ্যামল তাই দেখে অবাক হয়। কারন, সেখানে কিছুই নেই। সে মাপ নেয় কাগজে পায়ের চারপাশে দাগ দিয়ে। পায়ের মাপ দিয়ে অনঙ্গ নামতে গিয়ে আবার চালায় গুঁতো খায়]

অনঙ্গ : উঃ, ঘরটাও ঠিক করতে পারো না?

ফটকে : দাদাকে এই ভাবে গুঁতো খাওয়ালে? এত্ত ইনকাম করো, ঘর বানাতে পারো না?

শ্যামল : কি করুম, এইডা আমার জায়গা না তো। অইন্যের জমিতে ঘর বানাই ক্যামনে?

ফটকে : ও, তাহলে জমি কিনে নাও।

শ্যামল : কত্তা মশাই, নতুন কলোনীতে আমারে দয়া কইরা এট্টু জায়গা দিবেন? তাইলে একখান ঘর বানাইতে পারতাম।

অনঙ্গ : হুঁ, জমি চাই?

শ্যামল : [খুশি হয়ে] হ কত্তা।

অনঙ্গ : হয়ে যাবে। তবে আমি কিছু বলবো না। যা বলার ফটকে বলবে। হ্যাঁ, ব্যবস্থা আমিই করে দেবো।

শ্যামল : [ফটকেকে] তাইলে কবে যামু?

ফটকে : দাঁড়াও দাঁড়াও। আগে কথাটা সুনে নাও।

শ্যামল : বলেন কি করতে হইবো।

ফটকে : [কানের কাছে মুখ নিয়ে] তুমি পাঁচ কাঠা জমি পাবে।

শ্যামল : পাচ কাঠা!

ফটকে : হ্যাঁ পাঁচ কাঠা। তবে, তোমাকেও কিছু ছাড়তে হবে।

শ্যামল : কি ছাড়ুম কন।

ফটকে : মাল্লু।

শ্যামল : মানে! হেইডা আবার কি?

ফটকে : মাত্র তিন পেটি।

শ্যামল : চিতল মাছের ? হ, খুব সোয়াদ।

ফটকে : আরে দূর মশাই। এতেই পাগল হয়ে যাচ্ছেন? তাও তো খোকা দিতে বলি নি।

শ্যামল : কি! আমার একখান পোলা, তারে দিমু ক্যান?

ফটকে : ওঃ, কি মুশকিলে পড়লাম রে বাবা। আরে

টাকা, টাকা। [দুই আঙ্গুল নাড়িয়ে দেখায়]

শ্যামল : ও, কিন্তু কত ট্যাহা?

ফটকে : তিন লাখ।

শ্যামল : তিন লা.. ওরে বাবা, অতো দিমু ক্যামনে?

অনঙ্গ : এই ফটকে চল। এত সময় দেয়া যাবে না। ও চিন্তা ভাবনা করুক। তারপর দেখা যাবে। চলি। [চুল ঠিক করতে করতে ঘরের দরজায় ভেতর তাকিয়ে] চলি। কাল আবার আসবো। ইয়ে, তোমার নাম কি যেন?

শ্যামল : আইজ্ঞা, শ্যামল রুইদাস।

অনঙ্গ : হ্যাঁ শ্যামল, জুতোটা যেন সুন্দর হয়! তা না হলে ...

ফটকে : পেঁদিয়ে বিন্দাবন দেখিয়ে দোবো।

শ্যামল : চিন্তা কইরেন না। সোন্দর জুতা বানামু। আর যখন যার সময় হইবো, শ্রীকৃষ্ণের চরণে যাইতেই হইবো।

ফটকে : হ্যাঁ, চলো দাদা।

অনঙ্গ : হ্যাঁ চল চল। সঙ্গী, অমর সঙ্গী [গুন গুন করতে করতে ওরা বেরিয়ে যায়। ময়না আসে]

ময়না : আইচ্ছা, এই রকম বদ চরিত্রের মাইনষে ন্যাতা হয় কি কইরা?

শ্যামল : কি আর করবা। অহন এমন মাইনষেরই দর বেশি। ভালো মাইনষেরে কেউ পোছে না।

[মিউজিক। আলো নেভে। মিউজিকের মধ্যেই আবার আলো জ্বলে ওঠে। পুঁটি আর মাইনকা উঠোনে এক্কা দোক্কা খেলছে। বারান্দায় মিলন এক মনে কাজ করছে। শ্যামল বাজার করে ব্যাগ নিয়ে ফেরে। ময়না কিছু কাপড় নিয়ে ঘর থেকে বেরোয়।]

শ্যামল : কিরে তরা ইস্কুলে যাইস নাই?

পুঁটি : আইজ ইস্কুল ছুটি।

শ্যামল : হুঁ, তদের খালি ছুটি আর ছুটি।

[মাইনকা বাজারের থলে নেয়]

মাইনকা : বাবা, খাসীর মাংস আনছো তো?

শ্যামল : হ আনছি।

মাইনকা : [খুশিতে] হে ..... . বাবা খাসীর মাংস আনছে .....

ময়না : ব্যাগডা রান্না ঘরে রাইখা দে। এই পুঁটি, তুই এট্টু মাংসগুলান পরিষ্কার কইরা রাখ। আমি এই

কাপড়গুলান ধুইয়া আসি। আর মাইনকা তুই বিড়াল তাড়াবি।

পুঁটি : হ মা, যাইতাছি।

মাইনকা : আমারে মাইট্টা দিবা কিন্তু। [পুঁটি - মাইনকা ঘরে যায়। ময়না ঘরের পেছনে চলে যায়]

শ্যামল : কি হে ভায়া, ন্যাতার জুতা তৈয়ার কি শ্যাষ? দেহি তো! [দেখে চামড়া যেমন ছিলো তেমনই আছে। একটুও কাজ এগোয় নি। আঁতকে উঠে] কি সব্বনাশ! ন্যাতার জুতাখান বানাও নাই কেন? শুনলা না, আমারে প্যাদাইয়া বিন্দাবন দেখাইবো! উঃ, অহন আমি যে কি করি। এ যে কথাও কয় না। হায় রে হায়! আইজ যে কপালে কি আছে কে জানে। [বাইরে গাড়ির হর্ণ বাজে। কেউ হাঁক দেয়, " শ্যামলভাই আছো নাকি?"]

শ্যামল : হ, ক্যাডা? ভিতরে আসো। [হন্তদন্ত হয়ে ফটকে প্রবেশ করে। শ্যামল শঙ্কিত হয়। ময়না এসে বোঝার চেষ্টা করে]

অ, আ-আপনি? কিন্তু ...

ফটকে : কোনো কিন্তু নেই।

শ্যামল : মাপ কইরা দ্যান। সব্বনাশ হইয়া গেছে।

ফটকে : হ্যাঁ, সব্বনাসই তো! [একটু থেমে] তা তুমি কি করে জানলে এমন সব্বনাস হয়েচে?

শ্যামল : কেমন সব্বনাশ?

ফটকে : এই যে তুমি যার জুতো বানাচ্চো, সেই মহান নেতা আমাদের দাদা অনঙ্গ মিত্ত আর নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন সগ্যে। কাল এখান থেকে যাবার সময় গাড়িতেই টেঁসে গেলেন[কাঁদে] শ্যামল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মিলনের দিকে তাকায়] যাই হোক, দাদার জুতো আর বানাতে হবে না। বৌদি বলে দিয়েচে, ওই চামড়া দিয়ে তার জুতো হবে। আমি যাই। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। অনঙ্গ মিত্ত যুগ যুগ জিও। অনঙ্গ মিত্ত অমর রহে, অমর রহে [হাত ছুঁড়ে বলতে বলতে বেরিয়ে যায়]

শ্যামল : যাউক, বাইচ্চা গেছি। বারান্দায় বসে।

[আলো নেভে। মিউজিক। আলো আসে। শ্যামল আর মিলন কাজ করছে। পুঁটি আর মাইনকা বেঞ্চে

বসছে আবার দৌড়াদৌড়ি করছে। মাইনকা হঠাৎ মিলনের পিঠে ঝুলে পড়ে গেটের বাইরে তাকায়]

মাইনকা : মিলন কাকা, ওই যে দূরে দ্যাহো একখান বাচ্চা মাইয়ারে লইয়া একজন আইতাছে। [মিলন সেদিকে তাকিয়ে থাকে। শ্যামল অবাক হয়ে যায়। সে তো কখনো রাস্তার দিকে তাকায় না। শ্যামলও তাকিয়ে তাই দেখে। তাদের বাড়িতেই আসছে মনে হয়]

পুঁটি : এই ভাই, আয়। চল এক্কা দোক্কা খেলি।

মাইনকা দৌড়ে যায়। মিডল স্টেজে দাগ কেটে ওরা খেলা শুরু করে। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা এক মহিলা পাঁচ ছ' বছরের এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান নিয়ে প্রবেশ করে]

সুমিতা : নমস্কার। আমি সুমিতা নস্কর।

শ্যামল : নমস্কার। ওই বেঞ্চে বসেন। বলেন, আপনের লাইগ্যা কি করবার পারি।

সুমিতা : [মেয়েকে দেখিয়ে] শীতে পড়ার মতো ওর পায়ের এক জোড়া জুতো তৈরি করাবো। সবাই বলছে আপনি খুব সুন্দর জুতো তৈরি করেন, তাই

এলাম।

শ্যামল : কবে নিবেন? এট্টু কিন্তু দেরি হইবো। এই যে মিলন আমাগো বড় কারিগর। যদিও এতো ছোট জুতা আমরা বানাই নাই। তবু কইরা দিমু।

সুমিতা : দশ পনেরো দিন পরে দিলেও চলবে।

শ্যামল : কেমন জুতা চাই? পুরা চামড়ার, নাকি কাপড়ের লাইনিং দেওয়া?

সুমিতা : না, পুরো চামড়ার। কত দাম পড়বে?

শ্যামল : দিয়েন বারো শ' ট্যাহা।

সুমিতা : এত কেনো? না না, কমাতে হবে।

শ্যামল : দ্যাহেন, এতো ভালো জুতা নিতে গেলে ...

[ওরা দর দাম করতে থাকে মাইমে। আলো কমে।

বাচ্চাদের খেলা দেখা যায় উজ্জ্বল আলোয়।

আবার আলো বদল হয়]

শ্যামল : আর কমাইতে পারুম না। পায়ের মাপটা দ্যান। [খুব খুশিতে মিলন মঞ্জুর পায়ের মাপ নেয় আর মেয়েটিকে দেখে। শ্যামল এর মানে খুঁজে পায় না]

আপনারই তো আদরের মাইয়া। খরচ তো এট্টু করবেনই।

সুমিতা : [মঞ্জুকে] মা, তুমি যাও তো, ওদের সাথে খেলো গিয়ে। আমি একটু কথা বলি।

[মঞ্জু পুঁটিদের কাছে যায়। মিলন সব কাজ ভুলে মঞ্জুর দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটি যেন তার অতি পরিচিত। শ্যামল অবাক হয়। এমন তো সে করে না! ময়না দরজায় এসে দাঁড়ায়]

না, ও আমার মেয়ে নয়। আত্মীয়ও নয়। আমরা ওকে শুধু যত্নে লালন পালন করেছি।

ময়না : কন কি! ও আপনাগো মাইয়া না?

সুমিতা : না গো ভালো মানুষের মেয়ে।

শ্যামল : তাইলে ও কাদের মাইয়া?

সুমিতা : ওর বাবা মা আমাদের মতো চাষের কাজ করতো। ছ'বছর আগেকার কথা। ওর জন্মের তিন দিন আগে ঝড়ে বড় একটা গাছ পড়ে ওর বাবা মারা যায়। তার তিনদিন পর ওকে জন্ম দিতে গিয়ে ওর মা-ও মারা যায়। ওদের কোনো আত্মীয় ছিলো না। তাই ওই শিশুটির দায়িত্ব কেউ নিতে

চায় নি। আমার চার বছরের একমাত্র ছেলে তার
দু'বছর আগে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে যায়।
খালি কোলে ওই সবহারা মেয়েটাকে নিজের
করে
নিলাম। ও সংসারে আসার পরে আমাদের
অবস্থাও ফিরলো। এখন আমরা একটা ধান
মিলের মালিক। আমাদের আর কোনো সন্তান
হয় নি। ওকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে বেঁচে আছি।
[চোখের জল মোছে] মঞ্জু আমাদেরকে মা বাবা
বলেই জানে।

ময়না : [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] এর লাইগ্যাই মাইনষে কয়, বাবা মা ছাড়া তুমি বাঁচতে পারো, কিন্তু ভগবানরে ছাইড়া তুমি বাঁচতে পারবা না।

শ্যামল : হ, আপনারাই অর ভগবান।

সুমিতা : তা নয়। তবে ভগবান হয়তো আমাদের মাধ্যমে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছেন! নাঃ আজ উঠি। আমি পনেরো দিন পরেই আসবো জুতো জোড়া নিতে। কেমন?

[সুমিতা মঞ্জুকে নিয়ে চলে যায়। পুঁটি আর মাইনকা দৌড়ে ঘরে ঢোকে। শ্যামল আর ময়না সুমিতাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। তারা দেখে মিলন হাঁটুর ওপরে দু'হাত রেখে ওপরে তাকিয়ে হাসছে]

শ্যামল : এইবার তোমারে আর ছাড়ুম না। কও তো, তোমার রহস্যটা কি?

ময়না : হ ভালো মানুষের পো। তোমার ব্যাপার স্যাপার বুঝি না। পস্ট কইরা কও তো! এতো বছরে মাত্র তিনবার হাসলা। অন্য সময় হাসোও না, কথাও কও না। কারনডা কি? বলো।

[মিলন উঠে দাঁড়ায়। এপ্রনটা খুলে ফেলে বারান্দা থেকে নামে। দু'জনকে হাত জোড় করে নমস্কার করে]

মিলন : তোমরা দু'জন আমাকে ক্ষমা করো। ঈশ্বরও আমাকে ক্ষমা করেছেন।

[মিলনকে ঘিরে একটা আলো ঝলমল করছে। শ্যামল নমস্কার করে মিলনকে]

শ্যামল : বুঝতে পারতাছি, তুমি সাধারণ মানুষ না।

তোমারে আর ধইরা রাখতে পারুম না। কিছু যে জিগামু, হেইডাও চলে না। শুদ্ধু একটা কথাই কও, তোমারে পরথমে যহন লইয়া আসি তহন তুমি মনমরা হইয়া ছিলা। মাত্র তিনবার তোমার হাসি দেখছি। পরথম ময়না যহন তোমারে রুটি খাইতে দিলো, দ্বিতীয়বার, সেই ন্যাতার জুতার অর্ডারের সময় আর শ্যাসে ওই বাচ্চা মাইয়াডারে দেইখা।

ময়না : কও ভালো মানুষের পো কও, তোমার চাইরো দিকে এইরকম আলো কেন? আর তুমি এতদিনে মাত্র তিনবার হাসলা কেন? বলো!

মিলন : বলছি বলছি। আমার শাস্তি হয়েছিলো। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন। তাই এই আলো।

শ্যামল : আর তিনবার হাসলা কেন?

মিলন : কারন, তিনটি ঐশ্বরিক সত্য আমি জেনেছি।

শ্যামল : কিছুই মাথায় ঢুকতাছে না। তুমি সবকিছু খুইলা কও তো!

মিলন : তাহলে শোনো। আমি ছিলাম স্বর্গের দেবদূত।

[ময়না শ্যামলের হাত ধরে]

ময়না : ওগো, ডরে আমার গাও কাপায়।

শ্যালম : ডরের কি আছে? ও ভূত নাকি? ও তো দেবদূত! হ, তুমি কও শাস্তি পাইলা কেন, আর তিনডা সইত্য কি কি? আমরা জানবার চাই।

মিলন : ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এক মহিলার আত্মা নিয়ে যেতে। দেখি সেই মহিলা এক কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। মহিলা আমাকে দেখে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন, কারন তার স্বামী তিনদিন আগে গাছ চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন। এই মেয়েকে মানুষ করবে কে? আমি সদ্যজাত বাচ্চাটিকে মায়ের বুকে রেখে ফিরে গেলাম। ঈশ্বরকে সব বললাম। তখন ঈশ্বর বললেন, "যাও, সেই মায়ের আত্মা নিয়ে এসো। আর তিনটে সত্য জেনে তবেই এখানে ফিরতে পারবে। এক, মানুষের কি আছে; দুই মানুষের কি নেই আর তিন, মানুষ কি নিয়ে বাঁচে।"

ময়না : তারপর?

মিলন : আমি পৃথিবীতে ফিরে মায়ের আত্মা নিয়ে উড়ে চললাম। কিন্তু আমার পাখা খসে পড়লো। আত্মা একাই চলে গেলো। আমি মন্দিরের পাশে

পড়ে রইলাম।

শ্যামল : [ময়নাকে] দ্যাখো, তুমি তো খুব রাইগা গেছিলা। হুঁ হুঁ, আমাগো ঘরে দেবদূত আইছে। ওঃ, কি যে আনন্দ!

ময়না : থামো তো। আগে শুনবার দ্যাও। [আবেগে ময়নার চোখে জল] তুমি কইয়া যাও।

মিলন : হ্যাঁ, মানুষ হয়ে খিদে আর শীতে প্রাণ আমার তখন ওষ্ঠাগত। হঠাৎ দেখি একজন লোক একা একা বক বক করতে করতে যাচ্ছে। আমাকে দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। শীতের কাপড় আর চটি দিয়ে প্রাণে বাঁচায় সে। আমি তার মুখে ঈশ্বরের মুখ দেখতে পেলাম।

শ্যামল : হ, তারপর সেই লোকটা তোমারে নিজের বাড়িত লইয়া গেলো।

ময়না : আর তার ভয়ঙ্করী বউ তোমারে তাড়াইয়া দিতে চাইলো। তাই না?

মিলন : হ্যাঁ, আমি জানতাম যে আমাকে তাড়ালেই সে মারা যাবে। তার স্বামী ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই তার মনের পরিবর্তন হলো।

[দু'জনে ভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে]

আমাকে সে খেতে দিলো। আমি প্রথম

হাসলাম। তখনই ঈশ্বরের প্রথম সত্য জানলাম

"মানুষের প্রেম আছে।"

ময়না : হ, আছেই তো!

শ্যামল : তারপর?

মিলন : বছর খানেক পর একজন প্রভাবশালী

নেতা এসে বিদেশি চামড়ার জুতোর অর্ডার দিলো,

সেই জুতো যেন এক বছরের মধ্যে না ছেড়ে!

আমি

তাকিয়ে দেখি, তার পেছনে আমার সঙ্গী মৃত্যুদূত

দাঁড়িয়ে আছে। যে এক বছরের কথা ভাবছে, সে

জানে না সন্ধ্যে পর্যন্ত তার আয়ু নেই। তখন

দ্বিতীয়

সত্য জানলাম। মানুষের কি নেই। তাই দ্বিতীয়বার

হাসলাম।

ময়না : তারপর ওই বাচ্চা মাইয়াডারে দেইখা। তাই

না?

মিলন : হ্যাঁ ঠিক তাই। মহিলা ওই মেয়েটিকে নিয়ে

যখন এলেন, আমি চিনতে পারলাম। কিভাবে বেঁচে আছে তাও জানলাম। অন্যের মেয়ের প্রতি স্নেহে মহিলা যখন চোখের জল ফেললেন, তখন তার মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখতে পেলাম। জানলাম, মানুষ কি নিয়ে বাঁচে। বুঝলাম ঈশ্বর আমাকে তৃতীয় সত্য প্রকাশ করলেন। আমাকে উনি ক্ষমা করেছেন। তাই আমি তৃতীয়বার হাসলাম। [বজ্রনির্ঘোষে বলে। বজ্রধ্বনি আর আলোর ঝলকানি] আমার যাবার সময় হলো। [তাকে ঘিরে এক অগ্নিস্তম্ভ ওপরে উঠে গেলো] ঈশ্বর চান, সকলে মিলে মিশে থাকুক। সেখানে কোনো রকম ভেদাভেদকে তিনি প্রশ্রয় দেবেন না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সকলের পাশে দাঁড়াতে হবে। তা না হলেই শাস্তি নেমে আসবে। ঈশ্বরের শাস্তি ...

[কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যেতে থাকে। পেছনে সাইক্লোরামায় দেখা যায়, দেবদূত পাখা

মেলে দূর থেকে আরো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

জোরে মিউজিক। ধীরে ধীরে পর্দা নামে]

PENPRINTS SOLUTION

Develop your webiste / e-commerce website at INR 2500/-

We offer a wide range of services including WordPress Development, Content Writing, E-publishing, Journal Hosting, Academic Journal Publishing, Journal Management System, Content Management System (CMS), Reputation Management, Digital Marketing and Referencing in different styles and lots more.

Mail us at admin@penprints.in / website - www.penprints.in

Do not inflict mother nature, love her

Debanjan Banerjee

"Only when the last tree has died and the last river has been poisoned and the last fish has been caught will we realize we cannot eat money"

No, perhaps we will not. The so called civilized humans are pouncing this planet over the centuries. The poisonous and unending evil in the name of #Greed ghastly inflicting the womb where from we havetaken our birth to see this breathtaking planet.

The torment is terrific and multifaceted. No parts of mother's body (read Environment) are spared. Almost all are destructed, devastated and mutilated. From Air to Water – Soil to Noise we are indeed determined to ruin this beautiful bodyand dragging it silently and systematically towards necropolis.
Amidst such gruesome realities there are many rays of hopes. Numerous nations, innumerable sensible humans, uncountable NGOs, nature activists, stalwart organizations like World Wide Fund for Nature, Greenpeace, The Nature Conservancy, UN Environment Programme, European Environment Agency, Global Green Growth Institute etc. are coming up to protect the environment globally. And, the encouraging results are coming up.

In the year 2020 under the frighteningCovid situation the world has witnessed something very positive pertaining to environment. The world has comprehended #Nine extreme

affirmative vibes and ushered a new hope.

1. **Carbon emissions are down**

While social distancing has definitely resulted in some social and economic challenges for many, it also seems to be improving our air quality since travel has decreased across the board significantly. Researchers in New York are reporting early results, saying that carbon monoxide levels produced by cars has decreased 50% in comparison to this time last year. China and Italy have also reported significant air pollution decreases since the outbreak.

2. **Pablo Escobar's invasive Hippos are helping the planet**

The famous Colombian drug lord, Pablo Escobar was known to own many non-native exotic animals which he would allow to roam around his compound in Colombia. These many animals included wild hippos, which over the years multiplied from four to eighty. Due to

their similarities in diet and grazing habits, researchers are now wondering if these hippos are filling ecological holes from the extinct llama-like animal, the Hemiaucheniaparadoxa.

3. Wales to plant a huge national forest

Wales announced the government-led, $5.9 million project to create a National Forest in order to preserve nature, improve biodiversity, and sequester carbon from the atmosphere. Other goals include their "commitment to tackling climate change." The plan is set to plant on 5,000 acres of land each year to eventually increasing to 10,000 acres per year in order to hopefully meet their mark of reducing carbon emissions by 80% by 2050.

4. Dutch man cleans rivers in addition to oceans cleanup efforts

The young engineer Boyan Slat made history when he removed two shipping containers worth of garbage from

the Great Pacific Garbage Patch. He has now set his sights on going to the source of water pollution, the world's most polluted rivers. With his organization The Ocean Cleanup, Slat decided to include rivers in their mission after research revealed that, "1,000 of the world's rivers are responsible for depositing 80% of all the trash that is currently swirling in the ocean."

5. **Scientists close to creating artificial photosynthesis**

Scientists are on the cusp of being able to use artificial photosynthesis to generate renewable energy from the carbon dioxide in our atmosphere. If created in large amounts, this could be a crucial step towards mitigating climate change.

6. **New research finds human ancestor lived in trees**

The ancient human ancestor is believed to date back about 3.67 million years. Nicknamed Little Foot, was believed to take shelter and sleep in trees in order to

avoid run ins with saber-toothed cats and other predators. A new discovery occurred this month in regards to how Little Foot was able to move her head and how the movements are different than how we as humans can move it today.

7. **Restoring soils could remove 5.5 billion tonnes of CO2 a year**

Like trees, soil health has been starting to get some much needed attention. And of course the two go hand in hand. A new study concludes that restoring a protecting our soil could remove the equivalent of the United States' annual greenhouse gas emissions. The benefits gained from soil restoration includes water regulation, water quality, stabilizing production, and resilience in ecosystems.

8. **Global efforts on ozone help reverse southern jet stream damage**

Due to international cooperation in phasing out ozone depleting chemicals, the southern jet stream is returning to its normal state. This is great news because it is evidence that some climate systems are capable of healing when governments agree to make positive environmental changes.

9. **UK plants a "Tiny Forest"**

The United Kingdom has planted a tiny forest said to be the first of its kind in Oxfordshire. The little forest will consist of 600 trees and will be about the size of a tennis court. The forest is intended to not only benefit the environment but to inspire others to plant their own little forests around the world. "We hope to inspire individuals, businesses and government to take environmental action, by supporting a tiny forest in their local area."

Episode of Hope in Indian perspective

Now, the story from the world's most poplous democracy and the land that is

bestowed upon by the abundance of nature. The story of that great son of mother India who relentlessly fought to save and protect environment till his last snuffle. Stood as a savior of environment and outnumbered the inflictors despite all kind of intimidations.

The saga of SunderlalBahuguna - the tallest banyan tree, the pioneering and inspiring leaders of the environmental movement in India, an irreplaceable jewel for very diverse reasons.

With his Gandhian background, frugal lifestyle and a grounded and cultural base in the Garhwal Himalayas, he was a contrasting figure when compared to other environmentalists or wildlife conservationists of that era who were often from urban, privileged backgrounds.

During the struggle against the Tehri Dam this brought some controversies and criticisms for him, which in my opinion was somewhat misplaced. The

environmental movement in many parts of India is often identified on the Left-of-Centre but to have an impact, you sometimes need icons and leaders who command respect across the political spectrum— Bahuguna was one of those figures.

In 1979, during Chipko Movement one of the slogans of the movement was from a folk song: *Kya hain jungle k upkar? Mitti, paaniaurbayar* (what are the gifts of the forest? Soil, water and air). Today, you have terms like 'ecosystem services' that carry the same meaning. These terms didn't even exist back then. Bahuguna was a pioneer with respect to moving away the focus from a wildlife-centric approach to conservation that was then the norm amongst many of us, and making it directly relevant for larger environmental aspects as well as the livelihoods of people.

In fact, when nobody even dreamt about such environmental pollution, his clairvoyance clicked, and he started

working as a doctor to eradicate the environment's main ailments – saving soil, water and air from venomous pollution.

Bahuguna drew our attention to the importance of Himalayan forest, especially oak-dominated forests, and the role the greens played in maintaining the health of local agriculture and water resources for local communities. So this link between healthy agriculture and healthy forests, and between healthy forests and healthy hydrological systems is something that we learnt from the Chipko Movement and in Bahuguna's company. That has left an impact.

Sunderlal's long march from Kashmir to Kohima, the march across the Himalayas an attempt to make his local struggles and discourse pan Himalayas. His focus, however, remained in the western Himalayas in the region now the state of Uttarakhand. His ashram in Silyara is an inspiration to so many people who visited the place and learnt about the Chipko

Movement. Bahuguna referred to the fragility of the Himalayas— that we probably shouldn't have the type of conventional roads in Himalayas that we have elsewhere. He believed smaller villages should be connected with very well-made footpaths linked to few roads. What he said with respect to the hazards of road-building by cutting through mountain slopes is now so relevant, consider the Char Dham project and the widening of the roads and repeated hazards that the Himalayas are facing, like extreme rainfall events and landslides. He was probably the earliest voices that warned us against these dangers, specifically in relation to conservation and sustainable development in the Himalayas.

This greatest Padma Vibhushan warrior against all kind of environmentalcruelty lost his battle in Covid on May 21, this year at the age of 94, but, ushered a new era of hope, positivity and awareness that we have to save our mother at any cost

from those greedy inhumane – make them realize "We cannot eat Money"

Finally, amidst this positivity, let us take an oath – Stop Pollution Is The Best Solution…

জ্ঞানত মানুষ

ওবায়েদ আকাশ

আমরা টিকটিকির মতো দেয়ালে দেয়ালে দৌড়াতে
পারি না
আমরা মসলার মতো খাবারের ভেতর সুগন্ধ হতে পারি
না

অথচ কাঠবিড়ালি সটান দাঁড়ানো বৃক্ষে মুহূর্তে উপর
থেকে নিচে
নিচ থেকে উপরে উঠতে-নামতে পারে

আমরা প্রায়শ গাছের শীর্ষে উঠে পৃথিবীটা উল্টে
দেখতে পারি না

অথচ পাখিরা প্রতিদিন উপর থেকে জীবন দেখতে
পারে
পাখিরা মানুষের বিচরণ ঘিরে অনুপুঙ্খ ধারণা দিতে
পারে

আমরা নার্সিসাস, জ্ঞানত মানুষ, নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে
ভাবি--
কিন্তু মানুষ সম্পর্কে পাখিদের ধারণাগুলো
কখনো আন্দাজ করতে পারি না

প্রথাবদ্ধ শ্রেষ্ঠ আমরা, পরস্পরকে খুব কাছ থেকে দেখি
এবং একে অন্যকে নিজের মতোই মনে করে থাকি

নবকুঞ্জে, সীমান্তে

ওবায়েদ আকাশ

নবকুঞ্জে উদাস হাওয়ার পরত
হায় তার দেহসৌষ্ঠবে সীমান্তরেখার পারদ
হুল ফোটাবার আগেই এখন পরাগায়ন নিষিদ্ধ করেছে
ফুলেরা

এবং হাড়িয়া মাতাল হয়েও মিলছে না পরাগের
পাঁয়তারা
দেহতাল-রাগে স্পর্শ অভিবাসন
সঞ্চারিত স্বেদবিন্দুতে ঘনায়মান সন্ধ্যায়

রাত্রির সুসুপ্তি থেকে বেরিয়ে আসছে উল্লম্ফ তরল

সীমান্তরেখার আঁকিবুঁকি স্পর্শক্ষুধায়
অবশ নিভৃতপাশ। সূর্যোদয় ঝুলে আছে
তৃণসৌষ্ঠবে শীতের রক্তাক্ত ভাষায়

প্রহরীর ঘুম গলানো প্রেম
তোমাকে প্রেরিত অসহবার্তায় এ কী অক্লান্ত যুগের
সূচনা
নির্বাপিত স্পর্শের কমনীয়তা ঘিরে
আলোকায়নের দেহাতীত অকল্প প্রস্থান

মানবীর প্রাণান্ত আগুনে ঝরাপাতা সুদূর বনপথে
সীমান্তের ঢেউজর্জর প্রাণ
নিতান্ত স্পর্শ শেষে গহন সমুদ্রে মিলে গেল

মাহফুজ আল-হোসেন-এর কবিতা

উৎসবের কালো রঙ

(কবি ও গবেষক **Bahata Ansumali Mukhopadhyay** -কে নিবেদিত)

উৎসবের রঙ যে বলেছে কালো নয়
তাকে বলে দাও প্রচলিত সব হরফেই কালো কালিতে
লাল লেখা যায়

শস্যশীর্ষ ট্রেন্ডি টপে শিশিরের শব্দের মতো
আসুক না রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকাল
আর ঐরাবতের পিঠে চেপে
আনন্দময়ীর আগমনী সঙ্গীত গীত হোক পিলু রাগে

ডাল ভেঙে মিসওয়াক করতে করতে
নিজের দ্রাবিড়ীয় নামধাম বেমালুম ভুলে গেলেও
হাওয়াই মিঠাই হাসির বায়োমেট্রিক ছাপ্পড়
অবলীলায় লেপ্টে থাক

স্টারবাকের সফেন পেয়ালায়

আর আবছায়া অতিথির কুসুম গরম
অপ্রকাশ্য অনুভব ভাষান্তরিত হোক
একান্ত অলীক অন্তর্জালের
সাংখ্যিক অচলায়তন ভেঙে.....

নিশীথের নিষিদ্ধ শতরঞ্জ

নিরাশ্রয় উদ্বাস্তু অভিমানী শব্দেরা যখন
সুনসান নীরবতাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে
আপন করে নেয়
ওদের নৈমিত্তিক মানভাঙাতে নিরূপায় কবি
একপাক্ষিক শতরঞ্জে মেতে ওঠে --রাত্রি দ্বিপ্রহরে
আর্তুর র‍্যাবোর সুরাপ্লাবিত সরাইখানায়;

আর একেরপর এক ভুল চালে
পর্যায়ক্রমে খোয়াতে থাকে
অন্ত্যমিলের বেমক্কা বড়ে,
আড়াইঘর লাফিয়ে চলা অসমমাত্রিক অশ্ব,

কৌণিক অনুপ্রাসে গজগজ করতে থাকা
গদ্যস্পন্দের গলদঘর্ম গজযুগল আর
অধঃপতিত বাক্যবন্ধের কাণ্ডারীবিহীন কিস্তি;

পুরো অভিধান ঘেঁটে পটের রাণীকে স্মরণ করতেই
আপাদমস্তক অমূল্য জড়োয়ায় আচ্ছাদিত
বিরামচিহ্নহীন নৃত্যপর নগ্নিকার বাহুপাশে পণবন্দি
অসংযত রিপুর দাসানুদাস কলির কালিদাস।

অতঃপর প্রতিশোধপরায়ণ সশস্ত্র শব্দের
অতর্কিত চুম্বনে শেষ রাতে কিস্তিমাত,
অধুনান্তিক লিপিস্টিকে লেপ্টে যাওয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কবি হঠাৎ কুপোকাত!!

তৃষিত তুষার ও প্রস্ফুটিত লাল গোলাপ

তুষারের শুভ্রজমিনে যখন আগুন লাগে
সে আগুনকে প্রস্ফুটিত লাল গোলাপ ছাড়া
আর কীইবা বলবে তুমি

গোলাপের রমনীয় রঙ
উতলা মন রাঙায়
পোড়ায়ও কখনো সখনো

তেজস্বী তুষার সেও তো
গলে গলে নদী হয় পলে পলে
সে নদীর সুশীতল জলধারায়
অবাধ ক্রীড়াকলহাস্য
জমে ওঠে সহসাই
সাধ্য কী তার ছুঁয়ে যাবে
হৃদয়ের গোপন অধরা মাধুরী

অবশেষে কন্টকিত গোলাপের
সৌগন্ধ মদিরতার কাছে
অন্তরের অপূর্ণ তিয়াস মিটাবে সে
আলুথালু কাঙালের বেশে
নমিত শিরে ভোরের শিশির হয়ে
ভালোবাসার শূন্য পানপাত্র হাতে...

হাত ধরে থেকো

সানি সরকার

গন্তব্য একটিই আকাশ অথবা মাটি
যদি তেমন হয়, যদি নীড় থেকে
খসে পড়ে তারা
গান থেকে ভেঙে যায় সুর

মাটির কাছে এত ঋণ
ওই মুখের কাছে জ্বলজ্যান্ত ঠিকানা
এবং প্রাণের কাছে প্রাণ
বায়ুর ভেতর ও-ই সেই সাক্ষ্য
আজকের না, কালকের না
অনন্তকালের জন্যে লেখা হয়ে গেছে

পৃথিবীকে অন্ধ বল না কখনও
এই মহাজগৎকে অন্ধ বল না কখনও
এই মহাপৃথিবী গভীর ও শুদ্ধ যোনীর মতো
সচল, সৃষ্টিমুখর

এই আকাশ তোমার নীরব কিন্তু চলমান
দৃষ্টির মতন সমান দুটি কম্পন শোনে
আমরা এইখানে আলো থেকে জন্ম নেওয়া পাখি...
এইবার সমুদ্র দর্শনে যাব, হাত ধরে থাকো

ওই তো খোলা পথ, রাতবাতি, টিপ টিপ টিপ টিপ...
একটি গোলক, রিংয়ের মতোই দ্যুতি
খুব কাছে এসে গেছে

এখন ভ্রমণে বেরুব, খুব শক্ত করে
হাত ধরে থেকো

অপ্রাসঙ্গিক

রাখীবৃতা বিশ্বাস

অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর...
অপরাহ্নের আকাশ ছুঁয়ে
নেমে আসা অপ্রাসঙ্গিক আবেগে,
কখনো কখনো ভিজে যায়
অন্দরমহল।

গোধূলির বাতুল গবেষণায়,
খুব চেনা হয়েও অচেনা
যতিচিহ্নের ছেদে,
মন্দ্রিত হয়ে ওঠে
ট্রাম লাইন থেকে কিন্তু গোয়ালার গলি!

দূরাভাষ থেকে মন,
সাহচর্য থেকে প্রাচুর্য
বিশ্বাস বা বন্ধুতা...

বঞ্চনা বা প্রতারণার
কোনো নির্ভেজাল প্রতিষেধক আছে কি?

জানি এই প্রশ্ন মহাপাপ,
বড়ই অপ্রাসঙ্গিক!!!

Sight and Sound

Gopal Lahiri

The staircase knows its place, the door its geometry; Voices are running on empty space, no bigger than itself. Fading twilight begins cup of eveningsover the only river of the city. Bonestoss up other bones, the alleys give angst geography. Life among frail dead grass crawls as though in a time of deepest peace. The streets are full of tall and short people and there is a coin as well in beggar's hat. The morning breeze settles down to sleep.

You arise out of your disappearance, start singing with a guitar in your hand. Those yellow rubber- sleepers shine. Everyone is an island. You appear and reappear. A

sunny shimmer traverses the streets and lanes. The dry lines within us soften up. We turn back to see you, walking behind us. Deafening noise in the road and every brick of the tall buildings turn around the afternoon. A view from the cantilever bridge fades in the smoke screen.

Carefree summer
Go-as-you-like clouds
Drop text messages

Endless Moment

Gopal Lahiri

The dark clouds keep the boats
from leaving, toss up lost words,
not dash but only full stop.

Stroke of a brush,
the pencil tip rays stay for a while,
the light uncovers cracks, fissures,
strong winds bring last year's leaves.
its drowned possessions.

A pinpoint holds fast our eyes,

affixes us to memories,
evening birds peel us from darkness
leading down to corridors,
to stretch out in and burrows through the thoughts.

Something in us read water in desert,
footprints script the opposite,
grave-diggers meet where evening rays intersect
this endless moment waits
with unsaid words.

দুটি আকাশ আর ভিজে শর্ত

তাপস গুপ্ত

এ আকাশ এ শহরের নাম কারা,
এখানে আকাশের নিচে একটু ছড়িয়ে নিজেকে
ভেবেছিলাম হয়তো বা এ আকাশ
নক্ষত্রের মুদ্রায় ঘুম টেনে শোনাবে
সন্ত্রাসী রাক্ষসের কথা
লোহিতাশ্ব মানুষের শুকনো মাটি মেঘ
জলহীন বিদ্যুৎ গর্ভে চন চন করে ওঠে

আফ্রিকায় মানুষের হাত দিয়ে মানুষ দেখা যাবে
এখানকার শুকনো মাটি
মাটির তলার গুম গুম শব্দ
আমার অপেক্ষারত শব্দ ভেদী কর্ণ কূহরে
বধিরতা ঢেলে দিয়েছিল
রুক্ষ পাহাড়ের খাদান খুঁড়ে কিছু হাত
আর কর্তিত হাতের গল্প উঠে এসেছিল,

মৃত বৃক্ষ ডালে আগুন জ্বালিয়ে
তারা সেঁকে নিয়েছিল ঝোলানো রাইফেল
তাদের চোখের রক্ত হিরে আরো গাঢ় ঘন হয়ে
উঠেছিল
এই রক্ত মণি পাওয়াও কিছু নয় বলে
শুধু চোখের বদলে চোখ নিতে চেয়েছিল

এ আকাশ কঙ্গো বা কেপটাউন নয়
প্রিটোরিয়া থেকে একটু দূরে
এ শহরের নাম কারা
এখানে বরফ নেই

অথচ কাংড়ায় গেলেই
বরফের সাথে পরিচিত অর্কিড
উড়েছিল রাতের আকাশে
ওরা জানে আমার পকেটে রুমাল নেই
তাই শৌখিন নির্জনতার ক্যানভাসে
রুপোলি বেড়াল এঁকে রেখেছে,ধরে রেখেছে
তার শরীরে রুপোলি ঝালর আর চোখে

বৈদুর্য মণি

এসবও দেখা যাবে

শুধু পোষাক ছেড়ে যেতে হবে

অনুগত নগ্ন পায়ে

শুকনো ভ্রমণ ছেড়ে

রুক্ষ শব্দ চাইবে শ্যাওলা শরীর

তখন আকাশ চাইবে

ভিজে ঠোঁটের শিরায় জ্যামিতিক শব্দ ত্রিকোণ

ধরা দেয় রুমালের কুসুম কর্ম প্রবাহে

নিবেদন

প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজের কাছেই কিছু সম্বল থেকে যায় বুঝি

সামান্য উথাল পাথাল হাঁফ ধরে বসে থাকে দরজায়

বুকের সাহস ভেঙে শুধু চুরমার চোরাপথ খুঁজি

অল্প আয়ুর পৃথিবীতে শেষ রাতে ঠান্ডা হাওয়ায়...

সন্ধ্যাকালীন এই স্তব্ধতা জঙ্গল গ্রাস করে রোজ
গোড়ালি অবশ হয়ে আসে প্রাণদায়ী গুল্মের পাতা
সংসার বেষ্টন ছিল ছিল কিছু নিরুদ্দেশ ভোর
ভিটেটুকু আঁকড়ে থাকিস আবাদ করিস ওরে খোকা...

আরো একবার

লাবনী বসু

চলো হারিয়ে যাই চেনা
শহরের অজানা পথে।
জেগে থাকুক রাত ঘুমিয়ে পড়ুক সকাল
কোন নিবিড় ঘূর্ণাবর্তে।

আরো একবার নতুন করে নিজেকে
চিনতে চাইছি ধূমকেতুর কাছে।
ছায়াঘন পথ বেদুইন মন ঠিকানাবিহীন গন্তব্য অতীতে
লুকিয়ে আছে।

জমে থাকা গুমোট অভিমান উপচে পড়ুক সীমাহীন
ঢেউয়ের তালে তালে।
নীরব কথনে অব্যক্ত ব্যথা হারিয়ে যাক
নিবিড় ঘন শাল-পিয়ালে।

ঝরা পাতার মতো ঝরে যাক
সোনালী মুহূর্তগুলো আরো একবার।
ছুটে যাক মন বাতাসের অনুরণনে
একাত্ম হয়ে দুর্নিবার ।

আরো একবার পাওয়া না পাওয়ার কাছে পরাজিত
হোক সময়।
সব বৃষ্টিরা একসাথে ভেজাক মাটি সূর্যের আলোকণা
ছড়াক কিরণ আকাশময়।

খুশি তো !

অনিন্দিতা শাসমল

এই তো চেয়েছিলে তুমি !
এবার খুশি তো ?

আর কোনো ফোন নেই, মেসেজ নেই ।
রাতে অপেক্ষা করে করে কারোর জেগে থাকা নেই।
ভোরে কারোর ঘুম ভাঙানোর দায় নেই।
খুশি তো ?

আর কোনো অভিযোগ নেই।
সপ্তাহ শেষে বাড়ি আসার আকুলতা নেই।
দুপুরে ,মাঝরাতে বা ভোরে অন্য ফোনে থাকলে ,
কোনো নকিং নেই।
খুশি তো ?

সময়মতো খাবার ,ওষুধ সব খেয়েছো , ঘুমিয়েছো
কিনা --
জানতে চেয়ে আর বিরক্ত করা নেই ।
খুশি তো ?

আমি কেমন আছি ,বাড়ি ফিরেছি কিনা ,জানতে না
চাইলে , আর ঠোঁট ফোলানো অভিমান নেই, দুচোখ
ভরা টলটলে জল নেই , ফুঁপিয়ে কান্নাও নেই..
খুশি তো ?

সকালে নতুন কবিতা না লিখে ,ফোনে ব্যস্ত থাকলে
বা দেরি করে ঘুম ভাঙলে , ও প্রান্তে আর কোনো
থমথমে গম্ভীর স্বর নেই। অথবা,সদ্য লেখা কবিতা
,কাউকে প্রথম শোনানোর দায় নেই আর,
না শোনালে কোনো অনুযোগও নেই।
খুশি তো ?

পূর্ণিমা রাতে নারকেল গাছের ফাঁকে গোল চাঁদ দেখে ..
কেউ ফোন করে , লেখার টেবিল থেকে তুলে, ছাদে
গিয়ে অপরূপ দৃশ্য দেখার আবদার করবে না আর !
খুশি তো ?

গ্রীষ্ম,বর্ষা , শরৎ,হেমন্ত ,শীত,বসন্ত, সব ঋতুতেই ..
জন্মদিনে অথবা পয়লা ফাগুনে...

বড়দিন , সরস্বতী পুজো , গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটি
পড়লেই ...
চলন্ত ট্রেনের জানলায় মুখোমুখি বসার জন্য ,ছুটে
আসার আবদার করবেনা কেউ ...
খুশি তো ?

একে অপরের প্রতি সমানভাবে সহমর্মী না হলে
কোনো সম্পর্ক বাঁচে না ; দুজনকেই গোড়ায় জল দিতে
হয়, যত্ন করতে হয় -- গাছটিকে সবুজ সতেজ করে
বড়ো করতে হলে...
যাক বাবা ! বাঁচা গেলো !
এই সব জ্ঞানের কথা শুনতে হবেনা আর ..
খুশি তো ?

অনেকগুলো বছরের হাসি-কান্নার সংসারজীবন থেকে
মুক্তি চাইছিলে....
কষ্ট করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত , আর টেনে নিয়ে
যেতে হবে না একঘেয়ে হয়ে যাওয়া সম্পর্কটাকে।
মুক্তি পেলে ! চিরমুক্তি !
খুশি তো ?

যা যা চেয়েছিলে , ঠিক তাই হলো।
এবার খুশি তো ?
বলো না ? খুশি তো ?
আর কোনো রাগ নেই ,বিরক্ত নেই ,অভিযোগ নেই
,গালাগালি নেই ,চিৎকার নেই ...
খুশি তো ?

সত্যি বলো ! খুশি তো !

একটি উমা

শুভদীপ

মহালয়ায় পিতৃতর্পন শরৎ মাখা ভোরে
দেবী পক্ষের শুরু, জাগো তুমি জাগো।
পায়নি ছুটি একটি উমা সেনা নারায়নি
খতম করে শত্রু সব, তিরঙ্গার রঙ গাঢ়।

আমন্ত্রণ তোমায় গৌরী শক্তিভূতে সনাতনি

বোধনে মহামায়া, অধিবাস মহাষষ্ঠী শেষে।
একটি উমা হাল ছাড়েনা ঘুম জড়ানো চোখে
তীব্র প্রাকটিস, অলিম্পিকের স্বপ্ন ভালোবাসে।

ধুপ ধুনুচি, শিউলি গন্ধ, শঙ্খ ঘন্টা ঢাকে
নবপত্রিকার পূর্ণস্নান, মহাসপ্তমীর সকাল।
একটি উমা লড়ে চলে আদালতের তারিখে
পাপের শাস্তি ডেকে আনে ধর্ষকের মৃত্যুকাল।

পুষ্পাঞ্জলি মহাঅষ্টমীর, কুমারী পূজা সাধনা
সন্ধিপূজার মাহেন্দ্রক্ষণে পদ্ম প্রদীপে আরতি।
রকেটে আগুন একটি উমার মঙ্গলে পা বাসনা
মাধ্যাকর্ষণ পারেনা রুখতে বেপরোয়া দ্রুতি।

মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হয় মহানবমীর সন্ধিক্ষন
ভক্তিভরে প্রসাদ, হোমের টিপ সবাই চাই।
একটি উমা আইসিউতে বাঁচায় রোগীর প্রাণ
অতিমারী টিকা আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি।

বিজয়ার সুর ভাসে মহাদশমীর ধুনুচি ধোঁয়ায়
সিঁদুর খেলা, কোলাকুলি, বিসর্জনের বেলা।
একটি উমা সাহসী, চাকর বৃত্তি তার নয়
উদ্যোক্তা সে, নতুন উদ্দামে শুরু পথ চলা।
একটি উমা মিলে যায় অন্য উমার সাথে
সব মেয়েই উমা হয় বারুদ আগুন পেলে
সৃষ্টিস্থিতি দশভুজা ঘর থেকে বাহিরে
শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।

জলরঙ

নির্মাল্য ঘোষ

সবটাই যখন জলীয় বাষ্প হয়ে যায়
তখন আর কোনো অনুভূতি থাকে না...
পুরোটাই শুধু ঝরা পাতার কঙ্কালসার
আল্পনা..
তবু কিছু জিনিস তখনো ঘোরা ফেরা করে
আশেপাশে... সবুজ আশ্বাস নিয়ে...
বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি...

আর ভেতরে জল স্পর্শে সবুজ জাগার
সাহসী স্বপ্ন...
একটা অন্যরকম ভাস্কর্য কোথায় যেন মাথা
চাড়া দিয়ে ওঠে...
শরতের নীল আকাশের জলরঙে...

রক্তাবহ

সুজয় চক্রবর্তী

রক্ত-যেন ঝরাতে পারলেই অন্তর-জ্বালা মিটে যায় / রক্ত-যেন দান করতেই জীবন ফিরে পায়। / রক্ত-যা কিনা বংশকে উঁচু-নিচুর বরাত দিয়ে মাপে / রক্ত-যা কিনা মাতৃগর্ভে ভ্রূণীয় ধাপে ধাপে। / রক্ত-এটি আবার কাঁচা বয়সে গরম / রক্ত-এটি পিতার জল-ঘাম ঝরানো শ্রম। / রক্ত-রাঙা ফুল-চন্দনে ইষ্টদেবী তুষ্ট / রক্ত-চক্ষু দেখেই বুঝি সেই ব্যক্তি রুষ্ট। / রক্ত-গঙ্গা বহমান হয় দেশ দখলে আজি / রক্ত-তাজা প্রাণ দিয়েছেন শহীদ থেকে গাজী। / রক্ত-শোধের অগ্নিপথে ভুলে আপন-

পর / রক্ত-লাভের হিংসাতে আজ ভাঙছে সুখের ঘর। / রক্ত-শীতল গাত্রে ছুটে মস্তক হতে সর্বত্র / রক্ত-বর্ণে আকাশ সাজায় সবিতা নক্ষত্র। / রক্ত-পরেই শুষ্কভূমি সিক্ত যে হয় চড় / রক্ত-রিক্ত হও আগুয়ান বিশ্ব মান্যবর।...

স্তব্ধ

রুষা

বাড়িটা আজ নিঃশব্দ,
গতকাল রাতেই গমগমে আওয়াজে ভরে ছিল।
আজ যেন নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে...
সামান্য জিনিসে থিক থিক করছে বাড়িটা।
এধার ওধার কাঁচের গুঁড়ো,
পিপড়ের সারি পথ পাল্টায়নি।
মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে বাড়িটা...
অচেনা চিৎকার, অচেনা আওয়াজ মানতে পারছেনা
কি?
স্তব্ধতা চাবুক মেরে যাচ্ছে...
সব হাওয়া শুষে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,

মর্গে রয়েছে দেহটা...
এতক্ষনে হয়তো ছাই হয়ে গেছে।

তোরা বাঁচবি ক'দিন বল ?

রবিলাল মুরমু

গাছগুলো সব কেটে ফেলে
কারখানা সব হয়,
পুকুর-ডোবা ভরাট করে
পার্কিং বানানো হয়।
চারিদিকে কল-কারখানা
চারিদিকে সব গাড়ি,
চারিদিকে হচ্ছে বাড়ি
দিন দিন সারি সারি।
কারখানার কালো ধোঁয়ায়
যায় না নেওয়া শ্বাস,
দিনে-রাতে হচ্ছে ক্ষতি
পাশেই যাদের বাস।
সরষের তেলে শিয়াল কাঁটার বীজ

খেলেই শরীর খারাপ,
লোক ঠকিয়ে ব্যবসা করে
আজ শিক্ষিতরাও খারাপ ।
সব কিছুতে ভেজাল এখন
খাঁটি দুধেও বেশি জল,
এইভাবে চললে পরে
তোরা বাঁচবি ক'দিন বল?

অঙ্কের ইতিহাস

সোমনাথ সামন্ত

(১)

গণিতে রয়েছে এক অদ্ভুত মিস্ট্রি;
গণিতকে নিয়ে রয়েছে সবার ভুল ধারণা,
ম্যাথ ইস ফার বেটার দ্যান হিস্ট্রি!
তোমরা সবাই কেন এই কথাটা বুঝতে পারো না?

(২)

একে চন্দ্র দিয়ে হয় সূচনা,
আস্তে আস্তে শুরু হয় ম্যাথের খেলা।
বানান দিয়ে শুরু হয সংখ্যা চেনা।।
তারপর আসে যোগ-বিয়োগের বন্ধুত্বের পালা।।

(৩)

নামতা শেখাটা ম্যান্ডেটরি
না হলে শিখতে পারবে না গুণ;
ভাগের রূপ রংবাহারি;
তা দেখতে সবাই এবার ঘুম থেকে জাগুন।।

(৪)

সরল শেখার নেশায়;
বদমাস নিয়ম শিখতে হয় ভালো করে;
তবে একটু যদি উনিশ বিশ হয়;
শূন্য তার জুটে যায় কপালে।।

(৫)

সমস্যার সমাধানে যখন আসে গল্প
মোট আর বাড়া - কমার মধ্যে দ্বন্দ্ব;
ভাগ গুনের সমস্যা মোটেই থাকেনা অল্প,
তাদের করতে কিন্তু লাগে না আমার মন্দ।।

(৬)

বীজগনিত তো সূত্রে বাঁধা,
তা যদি ভালো করে শিখতে পারো;
আমার কাছে এটা মোটেই নয় গোলকধাঁধা;
যতই করি করতে ইচ্ছে করে আরও।।

(৭)

জ্যামিতি মানেই স্কেল পেন্সিলের কথা আসে,
আঁকাতে যেন ইউজ না হয় ইরেজার;
ভালো নম্বরের কথা মাথায় ভাসে;
যদি ঠিক করে করতে পারি মেজার।।

(৮)

গণিতের কথা যতই বলি
শেষ হয়না এর রেশ।।
গনিতের সূত্র আমি সর্বদাই মেনে চলি;
তাই নম্বরটাও আছে বেশ।।।

পুজা

নিখিল মিত্র ঠাকুর

মাতলো আকাশ পুজোর গন্ধে পরে নীল রঙ শাড়ি
আসছে উমা বছর পরে মর্তে বাপের বাড়ি
ছুটছে বাতাস এলোমেলো পাকা ধানের মাথায়
মনের সুখে বাতাস মেখে ধানগাছ কোমড় দোলায়।

নদীর তীরে পাকা চুলে দাঁড়িয়ে আছে ওইকাশ
মাথা তুলে দেখছে তারা শরতের নীল আকাশ

ভোরের বেলা শিশির মাখা ভূমে শিউলি লুটায়
দীঘির জলে নানা রঙের কমল মাথা দুলায়।

মাথায় নিয়ে হিমের ফোটা সবুজ দূর্বা হাসে
সকাল বেলার সোনার কিরণ সেথা প্রেমে ফাঁসে
দরজা গোড়ায় গোবর দিয়ে বধূ মারুল আঁকে
চেয়ে আছে পথের পানে নাগর আসার বাঁকে।

ঝোলা বোঝায় করে আনবে নতুন জামা কাপড়
ছেলে পুলে সবুর করে আছে সারা বছর
কুমোড় পাড়ায় মায়ের মূর্তি সাজে তুলির টানে,
ছেলে-পুলে সকাল বিকেল ছুটছে সেদিক পানে।

কারো ধৈর্য আর ধরেনা চঞ্চল মনে প্রাণে
এসে গেল পুজোর চারদিন খুশির তুলির টানে
নতুন পোশাক পরে সবাই বলছে আপন মনে
দেখতে কেমন লাগছে আমায় দ্যাখো জনে জনে।

রাত্রিকথা

দীপঙ্কর সরকার

ফেলে আসা রাত্রিকথা ভেসে ফেরে উজানের পথে হৃদয়ে গভীর ক্ষত প্রলেপ মাখা ওই ঠোঁট তির তির কাঁপে যেন পত্র-মর্মরে । সবজে রঙ ফিকে হয় ক্রমে আগুন উৎসবে মাতে ঝোড়ো হাওয়া । সবকিছু খাক হয় অন্তর্দাহে , নীল জ্যোৎস্নায় আদ্র উঠানে ডেকে ওঠে নিশাচর পাখি অশনি সংকেত লেখা যেন ফলিত জ্যোতিষে ।

কে করে খণ্ডন কার ললাটের লিপি , অশ্রুজলে লেখা ইতিহাস আজও মিথ্যা বলে , যা কিছু গৌরবগাথা লেখা থাকে উচ্চকোটির কথিত বয়ানে । বাকি সব মিথ্যা শ্রম দান অত্যাচার-বঞ্চনা ছাড়া কিচ্ছুটি জোটে না--অদৃষ্ট লিখন লিপি উড়ে যায় ফুৎকারে , শুধু এক গভীর ক্ষত লেখা থাকে রাত্রিকথনে ।

সুন্দরতা

নির্মলেন্দু কুণ্ডু

সুন্দরতা তোমার সাথে আমার আড়ি,
যাবো না আর দেখো আমি তোমার বাড়ি,
তুমি কেবল রূপে আমায় ভোলাতে চাও,
গুণের কথা বলতে গেলে শুনতে না পাও!
তোমার শুধু ধানাই-পানাই একই কথা,
বাজার-চলতি ক্রিম যে করে কথকতা!
তবু জেনো বুকের মাঝে যে মন আছে,
সুন্দরতা ঠিক সেখানেই লুকিয়ে আছে।
খুঁজতে হবে মনকেমনের দরজা দিয়ে,
দেখবে তুমি লালরঙা এক মিষ্টি টিয়ে।
সাদা মেঘে দেখবে তুমি বকের উড়ান,
ছোট্ট শিশুর মুখে মায়ের বুকের উজান,
সুন্দর যে সে সব কিছুও,খাপছাড়া নয়,
এককেন্দ্রিক ভাবনাগুলো পাল্টাতে হয়।
পাল্টে ফেলো দেখার চোখ আর মনের নয়ন,
সুন্দরতা করবে তোমায় মনোনয়ন।

প্রজাপতি এফেক্ট

পারিজাত প্রীত

"আমার একটা নদী আছে,
নাম রেখেছি - প্রজাপতি।
রূপালী তার ঢেউয়ের বাহার,
আমায় বলিস, দেখবি যদি।"

"নদী নিয়ে করিস কী তুই?
নদী কারো আপন নাকি?
মিথ্যে এত বলতে পারিস!
সত্যি বলত ইচ্ছেটা কী?"

"নদী থাকলে সাগর পাবো,
একটা হলুদ বালিয়াড়ি।
সেইখানেতেই তোর আর আমার
ছোট্ট মতন একটা বাড়ি।
তুই সাজাবি নিজের হাতে,
ফুলের বাগান।"

"কল্পনাতে!
এমন কেন স্বপ্ন দেখাস,
সত্যি হতে পারবে না যা!
এমন কোথাও পালিয়ে গিয়ে,
চল না বাঁধি সংসারটা!"

"তাই কি রে হয়!
খাওয়াবো কী?
জীবনটা আর গল্প তো নয়।"

"তোর তো কেবল কথার ফাঁকি।
কাব্যি করে ভাষার জালে,
মিষ্টি মধুর কথা বলে..."

"আমি কেবল স্বপ্ন বুনি।"

"মিথ্যে কথা, তুই তো খুনি!
আমার স্বপ্নগুলো খুন করেছিস।"

"তবুও কেন ভালবাসিস?
যখন জানিস নেই ক্ষমতা,

আমার কিছুই..."

"এর জবাবে অনেক কথা
বলতে পারি কবির ভাষায়।
কিন্তু কেন বলবো তোকে,
কোন কারণে, কিসের আশায়?
এ গল্পটা শেষ হয়ে যাক
খুব শিগগির..."

"হতেই হবে,
আমার এই যে প্রজাপতি,
যেদিন নিজের সাগর পাবে।"

"আসি এবার।
জীবন নিয়ে তোর হেঁয়ালি
জটিল ভারী।
তোর কাছে রাখ।"

আপন মনে মুচকি হাসি।
জীবনটাই তো হেঁয়ালি এক।
নদীর মতন সারা জীবন

সাগর খোঁজা।
প্রজাপতির পাখার হাওয়ায়
বদলে যাওয়া
বাঁচা মরার এই তরজা।

মহামারী

সোনালী ঘোষ

এই কি স্থির থাকার সময়, সমাধির থেকে নানা বর্ণের মানুষ অনন্ত নীলিমায় ছুঁড়ে দিচ্ছেন ভেতরের আয়ু,ক্ষীণ ডানা ঝটপটিয়ে আরো একটি শূন্যতা....গ্রহণ লেগেছে, তালকানা মানুষের চৈতন্য নাই, দীর্ঘ পুচ্ছওয়ালা সরীসৃপ চোরাটানে ভেসে আসে, একটু পরেই আছড়ে পড়বে ক্রম অচল কিছু শব্দ...আমি কি জানতাম না স্মৃতিভ্রংশ অর্ধ উন্মাদনা নিষ্কম্প চিত্তে মূক বধিরের মত অন্তর্ঘাত হানে...দংশন বিধি নিয়ে একটি মেয়েলী কান্না হু হু করে ঢুকে পড়ছে,যে মুখে ছিল কোনদিন অবেস্তীয় আলো....

নকল সোনার আংটি

অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাদশাহী আংটি পারবো না দিতে তোমায়
ছোটো একটা কিছু ,সাধ্যের মধ্যে যা কুলায় ।
গরিবের প্রেম রোগ ; নিজেদের মত করে ভালোবাসা ।
সব কিছু মানিয়ে গুছিয়ে
কাদামাটি মাখামাখি হবে সে প্রেম ।
সোঁদা মাটির গন্ধ থাকবে তাতে ,
বেল ,জুঁই ,আকন্দ ,কদম আর কিছু বুনোফুল
ভালোবাসার আতর ছড়িয়ে দেবে
তোমার আমার প্রেমে ।
সাঁঝের বেলায় ঠান্ডা হবে মাটি ,
কোঁদাল কোপানো ঘামে ভেজা বলিষ্ঠ শরীর
ঝিরঝিরে শুকনো বাতাসে তপ্ত দুপুরের ক্লান্তি ঝরাবে ।
ঠিক তখন নীল ডুরে শাড়ি পরে আসবে তুমি
জাম গাছটার আড়ালে তোমার আমার প্রেম ।
তোমার চুলে বেঁধে দেব রাতের রজনীগন্ধা ,
আঙুলে পরিয়ে দেব মেলায় কেনা নকল সোনার আংটি ।
আমি রাজা বাদশা নই ,

দিতে পারব না বাদশাহী আংটি ।
আমি আকবর আলী , মাটি কোপাই ,
একশো দিনের বাঁধা কাজ, বাকি মাস বেকার
তবুও তোমার প্রতি আমার হৃদয়
আলো ছড়ায় ঠিক যেন জ্যোৎস্না মাখা রাত ।

ডাকছে সবাই

রতন বসাক

ডাকছে অম্বর বুকটা খুলে
আয় না চলে কাছে,
বলছে হেসে দেখতে পাবি
অনেক কিছু আছে।

ডাকছে সাগর তীরে এসে
পা ভিজিয়ে দিয়ে,
পড়ে থাকা বিশাল সম্পদ
যা রে সবই নিয়ে।

ডাকছে পাখি কূজন করে
ডানা মেলে এসে,
দু'জন মিলে নীল আকাশে
উড়ে যাবো ভেসে।

ডাকছে পাহাড় গম্ভীর স্বরে
আয় উপরে চলে,
অনেক কথা বলার আছে
তোকে দেবো বলে।

ডাকছে জঙ্গল পাতা নেড়ে
ফুলের সুবাস ছেড়ে,
বলছে সবাই ঘরের কোণে
কেন আছিস হেরে?

একটি অনন্ত মুহূর্ত

নির্মল বসু

মুহূর্তগুলো যদি অনন্ত মুহূর্ত হোত,
আমি তাহলে হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে বসতাম,

বাবার হাত ধরে রেললাইনের পাশে কাঁটাওয়ালা গাছে
হলুদ ফুল দেখতে দেখতে হাঁটতাম,
বাবা আমাকে আগের মতো জীবনের গল্প শোনাতেন,
মুহূর্তগুলো যদি অনন্ত মুহূর্ত হোত, আমি তাহলে হাঁটু
গেড়ে তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে বসতাম,
মাকে আমার পরাজয়ের কথাগুলো বলতাম,
যে কথাগুলো মাকে ছাড়া কাউকে আমি কখনো বলিনি,
মুহূর্তগুলো যদি অনন্ত মুহূর্ত হোত, আমি তাহলে হাঁটু
গেড়ে তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে বসতাম,
কাকুকে বলতাম, সরষে ক্ষেত থেকে বৃষ্টিভেজা শালিক
পাখি এনে আমরা দুজন যত্ন করে পুষবো,
মুহূর্তগুলো যদি অনন্ত মুহূর্ত হোত, আমি তাহলে হাঁটু
গেড়ে তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে বসতাম,
অনুরাধাকে বলতাম, কলেজ যাবার পথে গড়িয়াহাট
মোড়ে সেদিন তুমি আমাকে ফিরিয়ে না দিলে, আমার
কবিতা লেখা হতো না, আমার কৃতজ্ঞতা টুকু তোমাকে
দিলাম,
মুহূর্তগুলো যদি অনন্ত মুহূর্ত হোত, আমি তাহলে হাঁটু
গেড়ে তাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে বসতাম,
বলতাম, সেদিনের বাঁশবন, রাতের জ্যোৎস্না, পুকুরে
কাঠ বাদাম গাছের ছায়া, আট টাকা ভাড়া মাটির বাড়ি,

রঙিন ঘুড়ি ওড়ানো দিনগুলো,কেউ কি আমাকে ফেরত
দিতে পারো, সোনালী বিকেলে ঢাউস ঈগল ওড়া
আকাশ ফেরত দিতে পারো,

এখন সূর্যটা পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ছে, দিনান্তের শেষ
আলো অরণ্য পাখির ডানায় মুছে যাচ্ছে,
একটু বাদে মাটিতে সন্ধ্যা নামবে, রাতের পালকি চড়ে
আকাশে চাঁদ উঠবে, তারার আলোয় ভরে যাবে
আকাশতল,
একটা অনন্ত মুহূর্তের জন্য আমি আর কত কাল
অপেক্ষা করে থাকবো।

মায়ের আগমন

শুভ্রব্রত রায়

মা তুমি আসবে বলে সকলের মনে আনন্দ,
সকলে আশা করে আছে কবে যাবে এই বিশ্ব
মহামারীর নিরানন্দ।
দূ:খ-বেদনা ভুলে জীবনের নতুন স্বপ্ন দেখা বাকি,

তাই তোমার আগমনের পদধ্বনির চিত্র আঁকি।
মা দুর্গা তুমি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী,মহিষাসুরমর্দিনী,
শরতের শুভ্র মেঘে তোমার আগমনের বার্তা বহন
করছে এই ধরনী।

তাই প্রকৃতিও মেতেছে মানবজাতির সঙ্গে আজ,
আকাশে বাতাসে গন্ধে ভরা দুর্গা পুজার সাজ।
মা তুমি আসবে বলে লাগলো মনে দোলা,
বহিছে জগতে অসংখ্য আনন্দের মেলা।
শিউলি-কাশফুল ফুটছে তোমার আগমনে,
তাই রয়েছি আমারা প্রতীক্ষায় প্রতি সনে।

শরৎ এলে মোরা তোমার মাহাত্ম্যের কথা বলি,
এসো মাগো পদ্ম তুলে দেব তোমার চরণে অঞ্জলি।
ঘরে ঘরে আনন্দে মেতে ওঠে সমস্ত বাঙালি,
খুশি নয় তারা, হয় যারা শুধু কাঙালী।
ক্ষুধার তাড়নায় আজ তারা অসহায়,
মা এই যন্ত্রণা যেন আর তাদের সইতে না হয়।

এই পৃথিবীতে ঘটছে নানা হাহাকার,
মা তুমি সেইসবের এসে করো তিরস্কার।

শরতে তোমার আগমন, তাই বাজলো ঢাকে কাঠি,
পুজোর সাজে উঠলো সেজে, আকাশ বাতাস মাটি।
মা তুমি এসো গনেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে,
মোরা বরন করবো তোমাদের পদ্ম দিয়ে।

বহিছে বাতাসে আগমনীর সুর, কাটবে সকল দুখ,
মঙ্গলময়ী জননী তুমি, মঙ্গল করে ফেরাও সবার
হাসিমুখ।
মা তুমি আসবে নতুন রূপে নতুন সাজে,
তাইতো আগাম ঢাক-কাঁসর-ঘন্টা বাজে।
মা এবার আসতে করলে এত দেরি?
আগামী বর্ষে এসো যেন তাড়াতাড়ি।

বাসস্টপের সেই প্রেম

প্রদীপ কুমার দে

ফেলে আসা সেই সব দিনে
বাসস্টপের সাদা-কালো মুহূর্তগুলো আজও রঙিন,
আজও প্রাণবন্ত।
শহর যখন আলসে দুপুরে ভাতঘুমে আচ্ছন্ন,

তুমি আমি তখন প্রজাপতি পাখার রঙ মেখে
অচেনা মেঠোপথ চিনে নিচ্ছি।
স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় দুপুরের বয়স ক্রমশ বাড়ছে।
ভ্রুক্ষেপ নেই -
পায়ের তলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে
সময়ের শিষধ্বনি।
জোনাকির আলো বন্দক রেখে
তোমার নরম হাতে সবটুকু আদর মেখে,
ফিরে আসি বাসস্টপে;
আদিম শুন্যতা রেখে শেষ বাস চলে গেছে।

তবুও বোলো না আমি মৃত

সোমনাথ সাহা

"Do not weep
The joy that has gone will come again in another form.
Have no doubt about this!”
Jalaluddin Rumi

আমার মরণের পরে যখন বিপন্ন বাতাস একা একা
বিলাপ করবে তবুও তুমি বোলো না আমি মৃত।
আমার অগোছালো সংসার বলিরেখা দেহ নিঃশব্দে শুয়ে
তোমার বিলাপ শুনবে।
আমি যদি কথা না বলি, তুমি কিন্তু কবিতা শুনিও
তবুও তুমি বোলো না আমি মৃত।
আমার বুকের ভিতরে চাপাপড়া কাশ ফুল কাঁদবে,
আমি দিগন্তের দিকে হেঁটে যাবো, সরে যাবে
পুরাকালের শোক।
তবুও তুমি পাশে থেকো, কপালে বুলিও হাত।
কিন্তু আমাকে বোলো না তুমি মৃত।
আমার নিথর শরীর শুক কীটের মতন রেশম গুটি
কেটে উড়ে যাবে উত্তরের দিকে চিনে নেবে হাজার
হাজার বছরের পরিযায়ী পথ।
তুমি তার আগে তোমার চোখের জলে পা ধুইয়ে এঁকে
দেবে পদচুম্বন। তবুও আমায় বলবেনা তুমি মৃত।
আমার নিঃস্তব্ধ চিতা থেকে জন্ম নেবে মৃত্যুঞ্জয়ী হাসি।
আমায় তুমি দেখতে পাবেনা, তবুও আমি আছি।
আমার কবিতার খাতা, গোলাপের কাঁটা তোমার কাছেই
থাক।
আমি এর চেয়ে বেশি মূল্যদি মূল্যবানে।

তাই, আর যাই বলো আমাকে বোলো না মৃত।
আমার মৃত্যু বুঝতে গেলে ততখানি সুন্দর হও,
যতখানি সৌন্দর্য আমার জীবনে আসার জন্য তোমার
প্রয়োজন হবে।
আমার অস্তিত্ব যদি খুঁজে না পাও তোমার আত্মার
নিকটে গিয়ে দেখো নিঃসঙ্গ পলাশের মতন আমি
দাঁড়িয়ে আছি, তবুও কিন্তু বলোনা আমায় মৃত।
ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে দেখবো আমি,
আমার জন্ম দাগে চুম্বন করে তুমি ঈশ্বরের কাছে
জীবন ভিক্ষে চাইছ। তবুও হ্যাঁ তবুও তুমি বলবে না
আমি মৃত।
কারণ, আমি আত্মা জীবন-মৃত্যুর ওপারে দাঁড়িয়ে
অমরত্ব নিয়ে খেলা করি, কর্ম দিয়ে অমর করি।

অশ্রুদিনের কবিতা

অশোক কুমার দত্ত

তোমার কথার প্রতিটি শব্দ রেণু আজ
ভাঙাচোরা স্মৃতির মায়াঘেরা ফুল !

প্রতিটি স্নেহলতা আজও আলো কথার
দোলায় কী ভীষণ অপরূপ মোহময়!
যদিও
চোরামেঘ ঢেকেছে আজ নক্ষত্র খচিত
রাতের বিস্তীর্ণ আকাশ............ মা
বলো না তুমি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি
আজ সেই কিশোরবেলার রঙিন
প্রজাপতি বাতাস ?

যাব বললেই কি যাওয়া যায়

সুমিত বৈদ্য

যাব বললেই কি যাওয়া যায়?
হয়ত যেতে হয়,
তবু'
সব যাওয়া কি যাওয়া হয়!

কতকাল হয়ে গেল
তুমি চলে গেছ,

তবু'
আজও নিরন্তর তোমার উপস্থিতি।

এ বুকে একদিন ফুটেছিল প্রেমের কলি
এসেছিলে ভ্রমর তুমি, আজ
স্মৃতি শুধু তোমার দংশন জ্বালা।

উজান-ভাঁটির খেলা শেষে
পড়ে থাকে ধূ-ধূ বালুচর,
তারই তলে
বয়ে যায় ফল্গু নিরবধি।

লাশফুল

দেবাশিস সাহা

রক্তের পাশে ফুল রেখো না
ফুল ভিজে গেলে
সংক্রামিত হবে গন্ধ

গন্ধের গভীরে
জীবনের কুয়ো

লজ্জা পেয়ে
আমার মা আমার বোন
আমার বারবণিতা
ঝাঁপ দিচ্ছে কুয়োয়
নতজানু হচ্ছে মৃত্যুর কাছে

তুমি ফুল রেখো না
ওদের পাশে
জল্লাদের উল্লাসে
ওদের যেন ঘুম না ভেঙে যায়

যারা জেগে আছে
তাদের ঘুম ভাঙাও
জেগে উঠুক
তাদের আগুন

ফুলের গন্ধ সংক্রামিত হলে
এই দেশ ভরে যাবে লাশফুলে

আকাশ গঙ্গায়

তুষার ভট্টাচার্য

ভোরের কৈশোরে যে মেঘ কিশোরী
দু'চোখে অফুরান স্বপ্ন বুনে
হারিয়ে গেছে
অন্ধকার গাঙুরের জলে
তাকে আমি খুঁজি রুপোলি জোছনা
রাতে
অগণন স্বপ্ন লেখা
ওই আকাশ গঙ্গায় ।

বার্তা

হামিদুল ইসলাম

শান্ত নদী ধলেশ্বরী
বিকেলের ক্লান্ত রোদ গায়ে মেখে ভাসছে হাওয়ায়

দূরে সমুদ্র ছায়া
নরম বাতাসে শিউলির সুবাস। সন্ধ্যা নামছে কুমারী চাঁদের মতো ।

ছায়া ছায়া পথ
আলো আঁধার
দুচোখে নরম সোহাগ
পাহাড়ের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে দ্রাবিড় শতাব্দীর পুরোনো সভ্যতা ।

হাসনাহানার গর্ভে নতুন ভ্রূণ
নতুন প্রজন্ম
ছায়া ছায়া বৃষ্টি। বৃষ্টির কথকতা
নির্জন সৈকতে আমার ঊনিশের যৌবন মজিদা। আমার আলোর উৎসব ।

মজিদার খোঁপায় রঙধনু। রামধনু
আবিরে ছেয়ে গেছে বিকেলের সবুজ ধানক্ষেত
মায়াময় দিগন্তে ছবির কথামালা
আমরা ঝুল বারান্দায়। চারদিকে উথলানো অপার্থিব হাওয়া ।

মনে মনে নদী হচ্ছি
মনে মনে নৌকো
কখনো জলছবি
শ্বাসে প্রশ্বাসে গুণে রাখছি মজিদার শরীরের ভাঁজ।
ঠোঁটের লালায় মাখি চুমু ।

পূজো পূজো মন
মনের গভীরে আমরা দুজন
নীরব আলোয় ওড়ে ছাতারে, চাতক, মনের বুলবুল
আমরাও পাখি হই। উড়ে চলি ধানসিঁড়ি কাঠের গুদাম
পূজো মণ্ডপ ।

মা আসছেন। ঢাকের বাদ্যিতে ব্যস্ত মণ্ডপ। ব্যস্ত
আগমনী বার্তা।

I will be destitute in love with butterfly

Rana Zaman

Butterfly love flowers, or just eat honey?
Butterfly swell from one flower to
another

No problem of butterfly's love with
flowers
I am fascinated by the beauty of butterfly

I never touch it, thinking it will run out
Never wash my eyes mixed with
butterflied colors

I cultivate flowers to get near butterflies
I sleep twelve months dreaming of
butterflies

I don't want a thousand of butterflies
Let there be a colorful butterfly in my
tree.

I will diffract my world in the colors of
butterflies

I will become destitute in love with butterflies

জয়ীর জয়যাত্রা

সুস্মিতা নন্দী

মানুষ যখন পশুর অধম,
মানবিকতার চর্চা কম!
দুর্নিবার তখনও কে?
মনের জোরে জিতবে কি সে?
আর্দশের পথে চলে
বিপদ সব পায়ে দলে,
জেগে দিন ও রাত্রি
সে যে জয়ের পথযাত্রী।
পথে বাধা যতই আসুক
আশার সদাই ফুল ফুটুক।
আপদ-বিপদ তুচ্ছ করে
সাহস অনেক বুকে ভরে,
পথ চলছে আজও সে—

মনের জোরে ফেরাবে
নতুন করে ভাগ্যকে।
কুৎসা যতই হোক না সরব,
ভালোবাসাই জিতবে যেন
থেকে মৌন, হয়ে নীরব।

বাঘঢুলু

শ্রীকান্ত মাহাত

বাঘঢুলু .....রে .....ঢুলু ঢুপু
আলতি পাতায় ভাত দেব
মেখে মেখে খাবি ?
দে....ধরা....দে ------- দে.....ধরা....দে
না হলে শুলিকাঠে যাবি ।
মেঘ বরষা আসার লাগে
আগে আগে উড়ে যাবি।
খানিক বাদে বরষা আসে
বসুমাতাও চাতক পাখির
মতন থাকে আশে ;

ঝম্ ঝমাঝম্ বৃষ্টি নামে
হরষ মনে বসুমাতা
    হাসে ।

যাওয়া আসা

ডঃ রীনা রানী রায়

জনম মরণ পেরিয়ে শুধু অনেকটা পথ চলা,
কান্না হাসির কাব্যগাথায় একটি কথাই বলা-
তুমি আছো বন্ধু আমার, আমার ধ্রুবতারা,
অন্ধকারে দেখাও দিশা, ঝরাও আলোকধারা।
আমি শুধু আমায় নিয়ে ফিরি কেবল বয়ে,
কাঙ্গাল হয়ে বেড়াই শুধু নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে।
লক্ষ্য জনম ধরে চলে আমার মাধুকরী,
ভালোবাসার অমোঘ দানে দাও যে হৃদয় ভরি।
আরো খানিক পাব, মনে এইটুকু তো আশা,
তাইতো আবার ফিরে ফিরে এই মাটিতে আসা।
আবার আসি নতুন করে, নতুন পরিচয়ে,

নতুন করে চলার শুরু, নতুন পথিক হয়ে
সারা জীবন চলে গাঁথা কান্নাহাসির মালা-
আর কত যুগ চলবে এমন আসা যাওয়ার পালা?
জানি আমি পূর্ণ হব তোমায় ভালোবেসে ,
তোমার মাঝে মিশবো আমি সকল চলার শেষে।।

স্বপ্ন আছে

সুতপা ব্যানার্জী (রায়)

আমিত্বকে ভেদ করে যেন একটা বহু জেগে উঠেছে,
গণ দাবী, গণ আন্দোলন আজ গণ চিতায় ভস্মীভূত,
অগ্রাহ্য দেওয়ালের ওপাশটা আজ বড় বেশী কাম্য,
শুধু ফেরিওয়ালারা জীবন বাজি রেখেছে হাঁকে,
রোদ নিয়ে কোন কাব্যকথা ছাড়া ভিটামিনের প্রত্যাশা,
একটা নিষ্ঠুর চর আস্তে আস্তে মাথা তুলছে বেশ,
লেলিহান অগ্নিশিখা গিলতে আসছে প্রবাসী স্বপ্ন,
এরই মাঝে নবজাতকের কান্না প্রত্যয় জাগায়,
আছে আছে সবকিছু, যেমন ছিল তেমনই,
একটা অতি নতুন জীবনধারা সাক্ষী থাকছে,
মানব মন অতিক্রম করবে,সভ্যতার বিকাশের মতো,

ততদিন প্রতিবেশীর টেলিফোনিক দূরত্ব সয়ে,
এগিয়ে চলেছে তরুরাজির নতুন নৈকট্য নিয়ে,
আগুনের মাঝে আস্ত একটা স্বপ্ন মাথাচাড়া দিচ্ছে।

ব্যথার প্রদীপ

শান্তনু গুড়িয়া

ব্যথার প্রদীপ জ্বলে, ফিরে ফিরেই সে-ব্যথা বুকে বাজে|
ঈষৎ নীরবতা, পাগলামি ও কবিতা কথায় প্রদীপ জ্বালি,
তেল ঢালি তেল ফুরালে ;
অনন্ত আঁধার যেন দীপাধার ---
হাত পেতে যে ভালোবাসা নিয়েছি একদিন
একটি কণাও পেরেছি কি ফিরিয়ে দিতে?
দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি আজও একান্তে নিভৃতে |

ভরা বর্ষা

সুব্রত সামন্ত

একটা বৃষ্টি ভেজা দিনে আমার নয়নও দর্শনে,
একটা কাঁক ভিজিতেছে গাছের ঈশান কোণে।।
এই ভরা বর্ষায়, মন ভিজিতে না চায় ,
ঐ কাক বসে আছে দীর্ঘ অপেক্ষায় ।
বৃষ্টিতে ভেজে ক্লান্ত শহর, দেখি বৃষ্টি শুরুর পর
অন্ধ নামে গগন কোণে ,শূন্যে ডাকছে জলধর।
আজি ভাবি বর্ষা মুখর দিনে ভাবছি কি করবো মনে,
অভাগা মনে শুধু পড়ে থাকে আমার সবুজ গ্রামের
কোনে।
দিন গুনি বারবার কবে আসবে শনিবার,
শহর ছাড়িয়ে যাব, যাবো গ্রামের ওপার।
বেলা কত বয়ে যায় , নদী নালা ভরে যায় ,
ডুবছে আমার শহর এই ভরা বর্ষায়।

শিব ও শ্মশান

পরিমল চট্টোপাধ্যায়

এই আমি রাতজাগা ভোর ও ভোরাই
সূর্যের তির এসে বিঁধছে এ গালে
আমার মরদটি এইমাত্র ঘুমে গেল
আধখাওয়া ছেঁড়াখোড়া আমাকেই ফেলে।

এ সংসার আমারই,শ্মশান দুয়ার
দিবানিশি হল্লা করে শিবঅনুচর
অত্যাচারের দাগ লেগে থাকে গায়ে
ভুলেই গিয়েছি আমি কে আমার বর!

দিনে ভিক্ষাজীবী আর মাতাল সঙ্গিনী
রাত্রি জুড়ে চরাচরে শেয়ালেরা হাসে
যে খায়,সে খায় আর ভোরে যায় ভুলে
আমার শ্মশান আমায় তবু ভালোবাসে।

ফুলকিরা নক্ষত্র হয়ে গালে দেয় চুমো
পোড়াদাগ উঠে যায় দাঁতের আঘাতে

বুড়ো শিব ফিরে তবু আমাকেই চায়
খণ্ডযুদ্ধে দণ্ড তার আমাতেই মাতে।

কলমের বিচরণ

বিনিময় দাস

বিগত অধ্যায়ে যা ছিলো আমার চাওয়া-পাওয়া,
কিয়দাংশ তার পূর্ণতা
ভরেছিলো হৃদ শূন্যতা ।
হৃদাকাশে তরঙ্গাকারে বইছিলো সন্তুষ্টির হাওয়া ।

আমার কলম লিখেছে তা ডাইরীর সাদা পাতায়,
যে লেখা অন্তর কথন,
স্মৃতি হয়ে আজীবন ---
রয়ে যাবে জীবনের নেপথ্যের জমা খরচের খাতায় |

কলম নিরপেক্ষ---তাই লিখে রাখে যত অসফলতা,
অশ্রু ভরা অপমান,
বিগত পথের অভিযান ।
কলম লিখে রাখে দুঃখে দ্রবীভূত অতিতের সব ব্যথা ।

জীবন অতিক্রম করে এক একটা মাইলস্টোন,
কোনোটাতে আছে জয়,
কোনোটাতে হার আর ভয় ।
কলমের কাজ শুধু তুলে ধরা জীবনের প্রতিটি কোণ ।

ধরা পড়েছিলো ভালোবাসা আন্দোলিত জিভে,
প্রেম হয়েছিলো প্রকাশ,
জীবন পেয়েছিলো আকাশ,
সবকিছুই ধরা পড়েছিলো প্রিয় কলমের নিবে ।

শুদ্ধতা আর অশুদ্ধতা, প্রশংসা আর যত গালি,
মিষ্টতা আর হাসি,
বেদনা রাশি রাশি ।
সবকিছুই ধরে রাখে কলম, নিয়ে দোয়াতের কালি ।

ছবির দেশে, কবিতার দেশে

রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

আর ভাববো না বলে সেধেই নিয়েছি নিশ্চিন্ত বিশ্রাম
সময় মাঝে মাঝে বিভিন্ন দাবী নিয়ে হাজির হলেও
শুনব না কোন কথা - চলে যাব ছবির দেশে, কবিতার দেশে
যেখানে শব্দগুলো পাশাপাশি বসে গঠন করবে কাব্য-অবয়ব
যেখানে ঘরের দেওয়ালে ঝুলবে বহুবর্ণ চিত্রের কোলাজ,
আমি চেয়ে থাকব বৈভবীর দিকে অপলকে

পৌষের কুয়াশামাখা কোন এক গোধুলীবেলায়

আমি চলে যাবো কবিতার দেশে -
যেখানে প্রতিপদের রাতে আমার শব্দ নিয়ে খেলা
যেখানে মোমবাতি নিভে গেলে জোনাকীর আলোয় ভরে ঘর
যেখানে অনাগত বিধাতার প্রতীক্ষায় কাটে আমার প্রহর
যেখানে কবিতার পার্থিব মায়া ঢাকে চরাচর

জমে থাকা দুঃখগুলো ভরেছি সিন্দুকে
স্বপ্নগুলোর উপরে চাপিয়েছি গাঢ় নীল রং
ঘাড় পেতে নিয়েছি সব ব্যর্থতার দায়
তারপর ছবির দেশে, কবিতার দেশে যাব বলে নেমেছি পথে

হে বৈভবী, পথের গল্প তুমি কতটুকু জান?
জান কি যন্ত্রণার রং বিবর্ণ হলুদ?

সাফল্যের মগডাল

আশিস ভট্টাচার্য্য

প্রায় তিন যুগ বাদে দেখা , তুমি কিন্তু একই রকম আছো রমলা। হ্যাঁ মানিক তুমি কিন্তু বুড়োটেমার্কা হয়ে গেছো, অবশ্য আমাদের দুজনেরই ষাট ছুঁই ছুঁই ।রমলা তোমার মনে আছে আমরা ভোলার মন্দির বাগানে বসে কত রকম নেশা করেছি সিগারেট ,গাজা, সিদ্ধি, মদ।

কি জানো মানিক, নেশা করে আমি তোমার মত বুদঁ হয়ে থেকে রঙিন স্বপ্ন দেখতাম না সাফল্যের সিঁড়ি খুজতাম- যেকোনো মূল্যে। আজ আমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আর তুমি একটা টিম টিম করে চলা হার্ডওয়্যারের দোকানের মালিক।রমলা আমি শুধু তোমার স্বপ্ন দেখতাম, তিন বছর প্রেম করেছিলাম, তোমাকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পায়নি ।দেখো মানিক তোমার সাথে মিশতাম কেবল গোপনে নেশা করার জন্য ওটা প্রেম ছিল না। সত্যি বলতে আমি অনেকের সাথে মিশেছি। অনেকে আমার অনেক কিছু ছুঁয়েছে ভাস্কর ,প্রশান্ত, অজিত । এরা আমায় ওপরে উঠতে সাহায্য করেছে। রাজনীতি, ফিল্ম, স্পোর্টস- সব জায়গায় টপদের সাথে আমার চলাফেরা। আমি সেখানেই কিছু দিয়েছি যেখানে অনেক পেয়েছি বুঝেছ হাঁদারাম ! রমলা তুমি যে আমার সাথে অভিনয় করেছ, বুঝতে পারিনি। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম , দ্যাখো মানিক আমার মা আমাকে দুধের সাথে ওরাল পিল খাওয়াত।আমি চব্বিশ ঘন্টা পড়াশোনা, নাচ-গান ,যোগব্যায়াম আঁকা ,পলিটিক্স ,ছেলে বন্ধু নিয়ে কাটাতাম। ঘুমিয়েছি কতটুকু মনে নেই। আমার চোখ ছিল গাছের মগডালে উঠবো ।আমি আমার ব্রেন ও

আমার শরীরকে মূলধন করে সেই ছোটবেলা থেকে লড়েছি মগডালে উঠব। তোমাদের মত দিবা স্বপ্ন দেখি নি । বালিগঞ্জের বিশাল ফ্ল্যাট, দুটো ফোর হুইলার , এবং আমার হাবি ব্যাংকের ম্যানেজার বুঝেছ । দাও একটা গাজাঁপোড়া সিগারেট দাও। সাফল্যের মগডাল থেকে ছোটবেলায় ফিরে যাই।

উত্তরপুরুষের কাছে

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

শেষকালে এক চিলতে তুলসীমঞ্চেও কোপ পড়ে।
ছেনি, হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে যায়
ঐতিহ্যের লালিত প্রতীক।

কোথাও কোন কান্নার শব্দ ওঠে না।
যারা ঐ তুলসীতলায় জ্বালত বাতি
রোজ সাঁঝে ভ্রান্তিহীন
তারা কেউ ইহলোকে নেই।

স্বপ্নে যদি কোনদিন তারা এসে জিজ্ঞাসু হয়
কী জবাব দেবো তাকে?

স্মৃতিও কী কাতর করল না --
রোজ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলত
চৈত্রে জলের ঝারি দিতে হত মাসভর,
বিস্মরণ এত শীঘ্র উত্তরপুরুষ!

আঘাত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অনন্তের শিকড় যদি বলো নিয়ে আসবে সৌভাগ্য
অহর্নিশ
চারদিক খোলা সেই অরণ্য
হরিণের বুকের উত্তাপ

মাথার উপরে থমকে যাওয়া সদ্য জড়ানো একফালি
মেঘ
সাময়িক শীতাতপ

সে মধুর অরণ্যে প্রলাপের মত খুঁজে নেব অভিমান
তারা হয়ে জ্বলবো আকাশে
তবু শরীরের ছোঁয়া লাগবে না
ছোঁয়াচে নদীর নামে ছড়াবে না কোন রোগ

আঘাতের শেষ ধাপে তুমি জেগে

আমি বীতশোক..

অধঃপতনের শব্দ

উদয়ন চক্রবর্তী

অধঃপতনের শব্দ শোনা যায়না
নির্মম সে বিষাদ ব্যথা --
ঝরা পাতার কান্নাও শব্দহীন
মাটির বুকে লুটোপুটি খায় নিঃসঙ্গ
জীবনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে,
সে বিবর্ণতা না চাইলেও এসে যায়
এঁকে দিয়ে যায় উলঙ্গ শব্দদের সংলাপ,
পাশাপাশি আকাশ বাতাস অবসাদে

ফিরে পেতে চায় জোৎস্নার চন্দন,
যদিও সে দূরত্ব মুছে ফেলা অসম্ভব
যা হেঁটে ফেলেছে বরাদ্দ নিয়তি পথ
সে শব্দের অক্ষরেখা দূর বৃত্তস্থ
দৃশ্যহীন কুয়াশা ঢাকা দৃশ্যপট,
জীবন জটায়ুর মতো তাকিয়ে থাকে
মুক্তির আকুতি নিয়ে রামরথের অপেক্ষায়
যেখানে রাবনেরা রাম রাজ্য চাইছে
শব্দহীহ অধঃপতনে নেমে যাচ্ছে খাদের গভীরে।

স্মৃতিচিহ্ন

বিউটি কর্মকার

একদিন সব পিছনে পড়ে যাবে।
যেভাবে গাছপালা, বাড়িঘর সরে সরে যায়,
সেভাবেই এগিয়ে যাব আমি।
অনন্ত নীলাকাশে জেগে উঠবে একটি তারা,
আমার নামে জ্বলবে সাঁঝবাতি।
কোথাও হয়তো কোন নীল পাহাড়ে

একটুকরো বরফে ঢেকে যাবে সব।
সত্যিই ঢাকবে কি?
অচেনা ঠিকানায় পড়ন্ত বেলায়
ডানা মেলবে কোন এক বলাকা।
তুমি চিনতে পারবে কি তখনও?
নাকি ভুলের খাতাখানি ফেলে দেবে
আবর্জনার ঘরে?
আমি জেগে রব তখনও,
তোমার পথের প্রান্তে যতদিন না ফোটে কৃষ্ণচূড়া,
আমি জেগে রব তখনও
নব বসন্তের লোভে তোমার আসার প্রতীক্ষায়।

উত্তরণ

জয়া মজুমদার

শূণ্য ঘরে শব্দের কারফিউ জারি
    দুচোখে রাত্রি নামে
অন্ধকারে ধূসর স্বপ্নের পারাবার
প্রাতঃভ্রমণে খুঁজে পায় আলোর ঠিকানা

বুক জুড়ে শুরু স্পন্দনের উৎসব মহড়া
রোদ্দুরময় সকালে স্বপ্নের ফিউশন
রঙীন ডানায় হারিয়ে যায় মন
জীবনস্রোতে ভাসে প্রত্যয়ের উত্তরণ

তোমায় পাওয়া

পাপু মজুমদার

রাত, হেডফোন
সকালের ক্লাশ
অলস কথার চিরকুটে
খেয়ালী দুপুরের হাহুতাশ.....
ভেজা বৃষ্টির স্পর্শে
মনে রঙের ছোঁয়া-
সবটুকু ভুলে
স্বপ্নীল চোখে
শুধুই তোমায় পাওয়া !

আমি ও থাকব তোমার সাথে

নিত্য রঞ্জন মণ্ডল

চার রাস্তার মোড়ে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো
তুমি আসবে ছায়ার মত মেঘ হয়ে
রাস্তার মানুষ গুলো রাত জাগে
যাযাবর হয়ে যায় বড় মুক্ত মনে
কোনো দেশের কাঁটাতারের সীমানা আটকে রাখতে
পারে না
এ দেশ সে দেশের
খিদের পারিষদ বন্দী করে রাখতে পারে না
বৃষ্টির জল তারাদের জীবন ভেজাতে পারে না
ভালবাসা সারা প্রকৃতিময় হয়ে জাগে
হৃদয়ের পাখি গুলো উড়ে যায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে
চোখের ভিতরে যেন প্রাণ কবরে ও জেগে থাকে
মনে হয় আমি ও থাকব তোমার সাথে।

পাপ

সৌরভ পাল

পাপেরো দরজায় কড়া নাড়ি, টকা টক, টকা টক
–পাপবাবু বাড়ি আছেন না কি?

পাপমশাই চমকে ওঠে– এই অসময়ে কে করে
ডাকাডাকি?

–আমি বাবু, আমি!

–কে তুমি, কী চাও? কেন করো ডাকাডাকি?

–বাবুমশাই, ভরেছে পাপের ঘড়া মোর
যদি দয়া করে একটু খোলেন দোর...

সিংহরোষে পাপমশাই খোলেন দোর,
সভয়ে বলি আমি- চোর, আমি মস্ত চোর!

–তুই চোর? তা করেছিস কী চুরি? শোনা, একটু শুনি।

তেতোধিক ভয়ে বলি আমি– করেছি যে আমি
এক টুকরো রুটি চুরি!
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পেট যে জ্বলে যায় মোর ছোট্ট পুটির।
না পেরে থাকতে করেছি যে চুরি,
লোকে তাই দিয়েছে নাম
রুটি চোরের বদনাম।
সত্যিই আমি করেছি যে চুরি!
বিষন্ন হয়ে আসে গলা মোর
আমি যে রুটি চোর!

ক্ষীণ কণ্ঠে স্বগতোক্তিতে বলি– না পেয়ে খেতে
করেছি যে রুটি চুরি, লোকে নাম দিয়েছে রুটি চোর!
যাঁরা দিনে রাতে করে চুরি কাঁড়ি কাঁড়ি,
লোকে তাঁদের সম্মান করে, ডাকে বাড়ি বাড়ি!
তাঁরা করেন যে পুকুর চুরি, তাই তাঁদের কদর ভারি।
আমি করেছি রুটি চুরি, তাই পাপ হয়েছে মস্ত ভারি।

ভীষণ হুঙ্কারে পাপমশাই বলেন– কি করিস বিড় বিড়?
তা দোষ হয়েছে তোর, তুই করেছিস কী... আস্ত রুটি
চুরি?

কে আছো বলবান, বাঁধো দড়ি, আনো আমার তরবারি
একে এখুনি ঝোলাতে হবে, ঝোলাতে হবে তড়িঘড়ি
এ রোগ যেন না হয় খুব বাড়াবাড়ি।
এই তো আমার কাজ, আমিই যে সমাজকে সাফ করি।

মনে মনে আমি বলি– পাপমশাই লোক রাশভারি
উনিই তো সমাজের সাফাইকারি।

সব শেষে কবি বলেন– করে রুটি চোরের পেটমারি
'উনি' করেন পুকুর চোরের উমেদারি।

সফর নামা

অরুণা চক্রবর্তী

ডানা মেলে ওই আকাশে
হারিয়ে গেলাম একদিন
মেঘ পরীরা উড়ে এসে

নিয়ে গেলো সেদিন ।

সন্ধ্যাতারা দেখালো আলো
নামলো যখন আঁধার
চাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে
পথ ধরে সে যাবার ।

চাঁদনী ফের সঁপে আমায়
ভোরের তারার কাছে
আলো ফোটার আগেই আমি
বাড়ি গেলাম পৌঁছে।

লজ্জায় মুখ ঢেকে যায়

বহ্নি শিখা (ঊষা দত্ত)

কারোর জন্য কিছু করতে পারলেই ভীষন ভাল লাগে আজকাল।

ইচ্ছে করে জড়াজড়ি করে গাছেদের মতো বেঁচে থাকি কিছুকাল,

জীবনটা তো যন্ত্রণায় চোয়ালের শেষ নড়বড়ে দাঁতটির মতো,

ক্ষয়ে যেতে যেতে একদিন ঝরে যাবে
স্বাদ-গন্ধ নেয়া মুখগহ্বর থেকে।

সেটা বুঝতেই পৃথিবী সমান বয়স যখন,লজ্জায় মুখ ঢেকে যায়।

বৃষ্টি দাও

বীণা বর

আমাকে ক্ষণিক বৃষ্টি দাও
আগুনে দেহ পুড়ছে ।
গুটিয়ে যাওয়া চামড়ার রস

প্রশ্বাস টানছে বাতাসে ।
পুরো না হোক
কিছু
ঘুমন্ত পিচকিরির ছেঁড়া রঙে
ঝাপসা মুখ রঙিন চুল ভেজাও ।
কাঁচা-পাকা পথের রেখায়
তোমার ছায়া আমার হতাশায়
একটু বৃষ্টি দাও ।
রোদের তাপে শুকনো মন
কাঁদছে কদমতলায় ।

বোলবো না ফিরে এসো

রেজাউল করিম রোমেল

যদি যেতে চাও যেতে পারো,
বোলবো না ফিরে এসো।
যে যেতে চায় তার পথে
বাঁধা হয়ে দাঁড়াব না কখনো!
যত ব্যাথা পাই, নীরবে সইব।

তবু কেন এ অশ্রু ভেজা চোখ?
ভুলতে বোলো না আমায়,
শুধু শুধু ভাল থাকার মিথ্যে অভিনয়।
তোমাকে মনে পড়বে আনমনে কোনো ক্ষণে।
তোমাকে মনে পড়বে বিকেলে
কফির টেবিলে কোনো এক মুহূর্তে।
তোমাকে মনে পড়বে যখন
হাজারো তারার মাঝে উঁকি দেবে চাঁদ।
তোমাকে মনে পড়বে
নিঝুম রাতে জোনাকির আলো আঁধারির খেলাতে।
মিথ্যে মোহে ভেসে যেতে পারিনি অস্তিত্বের প্রশ্নে,
হতাশার চাদর সঙ্গী হলেও।
যেতে চায়লে যেতে পারো বলবো না ফিরে এসো।
যে যেতে চায়, তার পথে
বাঁধা হয়ে দাঁড়াব না কখনো!

Chiaroscuro

Pratik Mitra

One

The path of waiting
Seems to be so long that I
Sometimes forget that
I need to move with the time
To give effort a goal, an end-rhyme.

Two

Even if I fail
Could the morn look otherwise?
There will be the light
On the deep of my mind from where
Another dream will take it's flight.

মুক্তমন

দীপ্তেশ চ্যাটার্জী

জাগ্রত গোধূলির আন্তরিক কথপকথন,
গেয়ে যায় রণক্লান্ত জীবনের রক্তিম বিজয়গাঁথা।
জীবনপ্রবাহের বৈচিত্র্যময় তরঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়,
প্রতিজ্ঞার আবেগঘন মুগ্ধতা।
মায়াময় বিভীষিকার অন্তরালে জেগে ওঠে অপূর্ন
প্রতিশ্রুতির কলতান,
রেখে যায় এক অব্যক্ত ব্যঞ্জনময় মূর্ছনা।
ইচ্ছেগুলো হয়ে ওঠে জীবন্ত,
অজানার উদ্দেশ্যে রওনার জন্যে নেয় প্রস্তুতি।
অদ্ভুত এক প্রশান্তি দিশাহীন ক্লান্ত ভাবনায় দেয় প্রাণ।
বৃষ্টিস্নাত শান্ত প্রকৃতির ন্যায় মনে সঞ্চার করে
মনমুগ্ধকর এক জীবনসুধার।
অকৃত্রিম স্নেহের পরশে, উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে
শ্যামল ইচ্ছাগুলি।
কফিনবন্দি আশারা নিজেদের মুক্তির দিশা পায়।
ঈশান কোণের বিদ্যুতঝলক মনে জাগায় এক অব্যক্ত
অনুভূতি।

চিন্তারা আজ স্বাধীন, দেয় অসীমের উদ্দেশ্যে পাড়ি।
উন্মুক্ত উদারতা খামখেয়ালি মনের মাঝে ভাসায়
বিশ্বাসের ভেলা।
কল্পনার চোরাস্রোতে পরিণত জিজ্ঞাসারা হারিয়ে যায়না
আর।
চাওয়া পাওয়ার ছকবন্দি খেলায় ওড়ে সততার
জয়ধ্বজা।
মনের একতারায় গোপনে বেজে ওঠে বাউলের মেঠো
সুর।
সুদীর্ঘ অপেক্ষার অবসান,ব্যাকুলতাদের আজ ছুটি।
সামনে শুধুই এগিয়ে চলা উৎকণ্ঠারা আজ প্রশ্নাতীত।

বিচ্ছেদ

কল্লোল বিশ্বাস

সব বিচ্ছেদ সাজো সাজো রবে আসে না,
কোন কোন বিচ্ছেদ
অনিমন্ত্রিত আত্মীয়র মত হঠাৎ এসে যায়।
যাকে দুহাত বাড়িয়ে আপ্যায়ন করা ছাড়া

আর কোন উপায় থাকেনা।
কাল পর্যন্ত আমি যার পৃথিবী ছিলাম
শুধু একটা রাতের ব্যবধানেই
জীবন গল্পের চিত্রনাট্য পাল্টে গেছে।
আমার কাছে কোনো কারণ না বলেই
সে কেবলি বিচ্ছেদ চেয়েছে।
হয়তো আমার মত আরো একটা পৃথিবী
তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে...

Journey of Life

Diptarupa Mallick Dasgupta

Uneven road –
Stormy wind,
Merciless sun,
Helpless me.
Tumbling van,
Knocks down the road,
Flying umbrella,

Defies my tight hold.
The driver sweats,
I pity him, I swear;
But what's the option left for me?
Home is far, house is near!
Waiting eagerly for the summer holidays,
There's still two and a half weeks more –
Calculating how much then to enjoy
As well as how fast the days will go!

It happened as I had expected,
And now the holidays are gone –
There's only one king at present –
And that's the raging, fierce sun.
Staggering days, sleepless nights,
No current or low voltage,
Such is my miserable plight!
Our guest, the rain,
Has not yet come,
How to pass the remaining days?
I shudder down –
To think upon.
My first experience of rainfall in
Sundarban,
Was an appalling one!
The sticking of my shoe in the mud
Had terribly begun.

How to go to school the next day?
Was my everyday nightmare!
For the van couldn’t proceed till the school building,
The mud wouldn’t permit the driver.
The struggling season ended,
The count for the pujas began –
The puja too started and finished,
Calling me back to Sundarban!

That session somehow expired,
With the onset of December,
I came back home briefly;
Having God in my prayer.
The next session began
In March I completed a year
My only appeal to the Almighty now
Is to arrange for my transfer.

বিসর্জন

অচিন্ত্য কুমার দাস

বাইরে বেরোতেই কানে ভেসে আসছিল--
"ঠাকুর থাকবে কতক্ষন,
ঠাকুর যাবে বিসর্জন।"
বিজয়া দশমীর সন্ধ্যার চেনা সুর।
অগাধ আনন্দের জোয়ারে ভাসলে ও
এই দুটো লাইন মনের মধ্যে এক ঝড় তোলে।
ঝড় তোলে মনের কোনে জমে থাকা যন্ত্রণা।
একি শুধু মায়ের বিসর্জন?
মায়ের তো বিসর্জন হতে পারে না,
মা চিরদিনের, সর্বক্ষণের, সর্বজনের।

বিসর্জন হোক মনের মাঝে
জমে থাকা এক রাক্ষসের।
বিসর্জন হোক ধর্মান্ধতার,
ধর্মের নামে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের।
বিসর্জন হোক অমানবিকতার,
মুখোশের আড়ালে মুখের।

বিসর্জন হোক রাজনীতির,
রাজনীতির নামে শোষণের।
বিসর্জন হোক অপসংস্কৃতির,
সংস্কৃতির নামে নোংরামীর।
বিসর্জন হোক জাতপাতের,
জাতের নামে মানুষে মানুষে বিভেদ।
বিসর্জন হোক ঘৃণ্য আধুনিকতার,
আধুনিকার নামে স্বার্থপরতার।

বেড়াল চিহ্ন

অমিত মজুমদার

মৃত্যুর কোনো আয়োজন তুমি রেখে যেতে পারোনি
দোষ তোমার নয়, এত মৃত্যু দেখতে দেখতে
জল মাটি আর আগুনের সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলেছিলে
সাময়িক
মুখে জল নিয়ে মাটিস্পর্শ নেয় শরীর তারপর আগুন
তারপর আবার জল, জলে ভেসে যায় যাবতীয় বেড়াল
চিহ্ন
যা তুমি দরজা খোলার পর প্রতিদিন দেখতে

ডানদিক থেকে বাঁ দিকে চলে যেতো তোমার আগে
আগে
কখনও মনে হয়নি সে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে
মহাপ্রস্থানের গোপন রাস্তাটাই।

স্কোরবোর্ড

হিল্লোল ভট্টাচার্য

পাহাড়ে মেঘ করলেই
একটা মনখারাপের দরজা খুলে যায়
কিছু জমানো বিষাদ ঝরে পড়ে–
সেই ছোট্টবেলার দার্জিলিং...
জানালা দিয়ে ঢুকে পড়া ঝুপুস মেঘ
ভিজিয়ে দিল বিছানা-বালিশ, আমার চোখও
শিখিয়েছিল ছোটদেরও বড় ভুলের অধিকার নেই–!

কলেজের নর্থ-বেঙ্গল ট্যুর
শেষদিন সেবকে বৃষ্টি ঘনিয়ে এলো– আমরা মুখোমুখি
পেছনে ফেলে এসেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা, ঘনিষ্ঠ সূর্যোদয়
চোখে শরীরের স্বাদ, নিঃশ্বাসে আঁচ

কয়েক মুহূর্ত অপলক
সারা জীবন অগুনতি অপচয় তবু
জরুরী কথারা ভাষাহীন, খাদের ভিতর
তারপর... ব্রিজ পার হয়ে ভুল রাস্তায় মোড় ঘুরে যায়।

কোদাইকানাল ২০০৫
কিভাবে আশ্চর্য রাশিফলে বন্ধুদের রোডট্রিপের দিনক্ষণ
মিলে গেল
তোমার মধুচন্দ্রিমায়–!
মিউজিয়মে চোখে পড়ে ছিল পুলওভার– বাহুলগ্নতা
পশমিনা আদুরে যাপন; বাম হাতে পাইনের বন
আমার দীর্ঘশ্বাস লেগে আছে পাতায় পাতায় আজও
অনেকদূর হেঁটে গেছি একা; খুব মেঘ শ্রাবণে সেদিন
গলিত ক্ষতর মতো গাঢ়
নীলগিরি হেসে বলেছিল,

"কিভাবে একটা লোক বারবার আকাশে কয়েন ছোঁড়ে
তবু সব কটা পদক্ষেপ ভুল!"

সমুদ্র ফিরিয়ে দেয় সবই
পাহাড়ও– তবে স্মৃতি

সবকটা দাগ, গ্লানি, ঈর্ষা, হেরে যাওয়া
পাহাড়ে বৃষ্টি হ'লে নিজেকে নুড়ির মতো লাগে
কেউ কি কখনো মেপেছে
কতটা হেঁটে গেলে পরে পাহাড় নিবিড় হয়, পরাজয়
ফিকে হয়ে আসে–!

নতুন সকাল

তীর্থঙ্কর সুমিত

বহুদিন পর আবারও যে পথ ধরে
বেড়িয়ে পরলাম সবুজের দেশে,
নীলকে পিছনে ফেলে
ক্রমশঃ ক্রমশের দিকে
সরলরেখা বরাবর শুধুই...
যেখানে নদী শেখায় ভালোবাসার গান
পাখি শেখায় উচ্ছ্বাসের সুর
সবুজ জানায় আমন্ত্রণ

ছেঁড়া চিঠি আজ খাম ছেড়ে আকাশের পথে

এসো মুগ্ধতা কুড়োই ভোরের আলোয়।

অন্ধকারের ঘর-সংসার

কৃষ্ণ রায়

সূর্যোদয়ের পরে অনন্ত অন্ধকারে
যে আলোটুকু পড়ে থাকে
আমি সেই দিকে তাকিয়ে
দেখার চেষ্টা চালাই- অন্ধকারের ঘর-সংসার। যখন
ঘরে ফিরছে দু'চারটে বেঁচে থাকা পাখির ছানা, ইঁদুর
নিজের গর্তে
ফিরছে যখন ঘরছাড়া শ্রমিক
ঢালাইয়ের অসম্পূর্ণ মিস্ত্রির দল
একে একে ঠিকানার ভেতর
ভরিয়ে তুলেছে ঘর-সংসার।
তখনই অন্ধকারের ঘাসের ওপর
নিজের পৃথিবীর ঘ্রাণ নিই।
একটা অসমাপ্ত বাতাস আমাকে
নবীন করে তোলে বারবার।
আমি ফিরতে ফিরতে আবার

দেখার চেষ্টা চালাই- অন্ধকারের ঘর-সংসার।

এবার আমিও

উত্তম চক্রবর্তী

এবার আমিও অক্ষর হয়ে শোভা পাব
তোমার বরফ সাদা মনের পৃষ্ঠায় ।
তোমার অবসন্ন মুহূর্ত গুলির ফাঁকে ফাঁকে
ঘুম জড়ানো চোখে কয়েক লাইন পড়ে নিও,
আর একঘেয়ে ভাব যদি কোন দিন
কাগজওয়ালার কাছে নিশ্চিন্তে বেচে দিও।

এবার আমিও বর্ষার জল হয়ে রয়ে যাব
তোমার শুকিয়ে যাওয়া মনের কুয়োয় ।
তোমার উপোস করার দিনে কাক ভোরে
দু’ বালতি জলে স্নান করে নিও,
আর যদি ময়লা বাসন এতে ধুতে চাও
বাড়ির ঝি’কে দিয়ে নিশ্চিন্তে ধুয়ে নিও ।

এবার আমিও খাট হয়ে শোভা পাব
তোমার মনের সাজানো বেডরুমে।
তোমার যৌবন ক্লান্ত শরীরটাকে ফেলে
যখন খুশি এতে ঘুমিয়ে নিও,
আর যদি কোনদিন উঁই ধরে যায় এতে
নিশ্চিন্তে কেটে কুটে উনুনে জ্বেলে দিও ।

কথা দিলাম

বাসব রায়

যেদিন সত্যিই আমি আর নেই,
আমার উপস্থিতি যেদিন শুধুই কল্পনা আর ভাবনায়
সীমাবদ্ধ হয়তো -
আমার বিলীয়মান অস্তিত্ব যখন অদৃশ্যলোকে,
স্মৃতির খেরো খাতায় ক্রমশঃ অস্পষ্ট মলিন আমি
নিশ্চিত -
অবহেলায় যদি কখনও খুঁজে দেখো অনিচ্ছায় হলেও -
দু'একটি বিক্ষিপ্ত অক্ষরে চোখ মেলো
একটুখানি ,

কথা দিলাম - দেখবে আমার ম্লান হাসিটুকু ।

শেষ বিকেলের আলো

স্বপন গায়েন

ভালোবাসার জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছে শেষ বিকেলের আলো
ডুবুরি মন আজীবন খুঁজে বেড়ায় মনের মানুষকে
পরশমণির স্পর্শ পাওয়ার মত ভালোবাসা আজও অমৃত।

দিগন্তের কাশফুলের মত আবেগী সোহাগের পরশ
শেষ বিকেলের মায়াবী আলোয় খেলা করে ভালোবাসা মন
রূপকথার পাঠশালায় প্রতিনিয়ত জন্ম নেয় অলৌকিক রূপকথা।

ভালোবাসায় জোছনা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে হ্রদ
মাঝারে
মন যমুনায় লেগেছে শরতের মিষ্টি রোদের ছোঁয়া –
ওষ্ঠের বারান্দায় আজীবন গান গায় প্রেমিক পুরুষ।

শেষ বিকেলের আলোতে আকাশে দেখা মেলে
পাখিদের সঙ্গম
ধূসর সাঁঝের সময় গড়িয়ে যায় আঁধারের পথে
ভালোবাসা অভিমান করে বসে আছে মাটির উঠোনে।

শঙ্খচিলের ডানায় কারা যেন লিখছে প্রেমের কাব্য
নীল দিগন্তে ভালোবাসার গান গাইছে এক দল
পরিযায়ী পাখি
জনম জনম প্রেমিক প্রেমিকা তাকিয়ে থাকে একে
অপরের দিকে।

সংগোপন

সুমনা ভট্টাচার্য্য

“..Come, thick night,
And pall thee in the dunnest smoke of hell,
That my keen knife see not the wound it makes,..”

অধ্যবসায়ে মুছেই যাচ্ছ যেন
ছুরির ওপর কৃতকর্মের রেখা-
ঝরনা স্নানের রুদ্ধ সংগোপনেও
সতর্কতার সহজপাঠ শেখা ;

তোমার হাস্য জ্যোৎস্না মসৃণ
তোমার লাস্যে স্পর্শ কাতরতা ...
তোমাদের চোখে আমার গোপন ঋণ
নিঃসঙ্গতায় সহানুভূতিই প্রথা -

হাতের আদলে ধূর্ত হয়েছে ফণা
আস্তিনগলি অতর্কিতের ঘ্রাণ-

ফুলের স্তবকে আলপিন মূর্ছনা
বিলিয়ে দিচ্ছ করুণা খতরনাক ।

মুখ স্মরণিকা মুখোশই পার্থিব
অন্তরালেই নিগূঢ়তা সঞ্চয়-
আত্মনেপদে যথার্থ প্রাপ্তি
যদিও শেকড়ে ছুঁয়েছে গোপন ক্ষয়...

The Flow and Glow of Happiness

Abanti Pal

Happiness is that tiny stream
Flowing down the mountain sides,
Meandering as the magnanimous river;
Merging with the ocean tides!

Happiness is that tiny glow
Of a teeny twinkling starlight,
But if you close your eyes and feel;
You'll see the dazzling lights!

Happiness is that tiny bubble
That pops out into the air,

And the little happiness that you have given;
Now surrounds you everywhere!

So when you see the magical world
Smiling at you with joys untold,
Its the happiness that you have sown;
Coming back to you manifold!

In the Pen of a Retired Teacher

Supriya Mandal

Alone sitting in my old armchair
In the front veranda
Purposelessly think of by-gone working days,
The very first day and the grand farewell

In my honour,
And the days between them,
Mixed with joy, smile, tears and grief.
Memories are flashing one by one
Making me flown in their streams.
Was there almost three and thirty years;
And this thought is tormenting

The required strength of living
The remaining days.
Now all days are my holidays,
And leisure is my only mate.
I enriched the vessel of my teaching life
A little.
I witnessed the birth of many new possibilities,
And the death of many young hopes.
In the cycle of Nature
Some go and some come to fill the emptiness.
I will not be perennial,
But I will live, and surely live
In the hearts of my children—my students.

যুদ্ধ শেষে

সুদীপ্ত আচার্য্য

ট্রেনটা এখনও প্লাটফর্মে ঢোকেনি
দীর্ঘ প্রবাসের স্মৃতির আড়ালে
বিরহে ব্যবধানে অন্তরালে

আজ বছর শেষে যুদ্ধ শেষ-
বিজয়ের উল্লাসে রত্রির পর
অপেক্ষায় তোমার প্রিয়তম,
চোখের তৃপ্তির জল সময় গোনেনি।

কতদিন আমি প্রহর গুনেছি
কতরাত ভিজেছে বালিশ দুশ্চিন্তায়,
যত ছিল ব্যস্ত হিয়ার ক্রন্দন ধ্বনি
সাদাকালো পোট্রেট তুলির আকাঙ্খায়
যেমন বাঁচতে চায় স্নেহের স্পর্শে,
তারা থেকেছে আশায় প্রতীক্ষায়
মিলনের মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা মেখে।

ট্রেনটা এখনও প্লাটফর্মে ঢোকেনি
প্রেমিকের অপেক্ষায় আবার আলিঙ্গনে
এলোকেশী মাথা ছোঁয়ানো উষ্ণতম বক্ষে;
হয়তো রক্তের দিনলিপি প্রেম মানেনি-
বন্ধ কফিনের চাদর জুড়ে
আজ হাহাকারেও বিজয়ের সুর!
শুধু আমার প্রেমিক ফেরেনি।

চন্দ্রগুপ্ত থেকে গুরুনানক

তাপসকিরণ রায়

চন্দ্রগুপ্ত থেকে গুরুনানক বেরিয়ে আসছেন
গতি প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে--
এ ছাড়া একই অঙ্গ রূপান্তরিত হচ্ছে,
তুমি এগিয়ে যাচ্ছো আস্তে আস্তে
বালুচর অথবা পাহাড় খাইয়ের গর্ভে চাপা থেকে থেকে
স্বয়ংক্রিয় একটা জন্তু উঠে আসতেই পারে।
আগুন উপহার দিচ্ছে কত কিছু--
আবার কখনো স্ফুলিঙ্গ গুপ্তচর
বেছে নিচ্ছে--শত্রুর আস্তানা
যা কি না অনায়াসে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।
আয়না থেকে কিছুতেই ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারছ না তুমি
বন্দি হৃদয় ও তোমার শরীর জুড়ে আছে।
রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করতে গেলে
কবিতার বিস্তৃত এক মাঠ..আর আমরা নিশ্চিন্দি ঘুমিয়ে গেছি।
কিছু জ্বলা পোড়া ছাই চাপা হিংস্র বারুদ

বাষ্পীভূত হয়ে গেছে--প্রেম শলাকায় সেও এক
আমআদমি।
তোমার শরীরে একটা নিরীহ বৃক্ষ কিংবা আওরঙ্গজেব
বাসা বেঁধে আছে l

দ্বন্দ্ব

তোফায়েল তফাজ্জল

এক দিক থেকে আনন্দ ও অন্য দিক থেকে দুঃখ
সমান গতিতে এসে মুখোমুখী হলে
তরমুজের ঠাণ্ডা-মিষ্টি-কাঙ্ক্ষিত-সংবাদ বনে মাটি,
মনে ঠেকে ঝঞ্ঝা-অস্থিরতা,
ধৈর্য শক্তি বিক্ষিপ্ত প্রশ্নের সামনে নতজানু হয়,
নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয় ইট-ভাটার আগুন ;
করাতের ধারালো দাঁতের মুখে পড়ে
ঠিক পথের দু'ধারে বাড়তে থাকা বৃক্ষ, পদক্ষেপ।

এমন কাম্য-অকাম্য দ্বন্দ্বে ছন্দে ফিরে কেউ পায়
পাকা লিচু বা আমের স্বাদ,

ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে প্রতীক্ষার ঘ্রাণ,
চেনা-অচেনা সুরের নৃত্য চলতে থাকে অভ্যন্তরে।
আবার এটিই কারো কাছে লবণ না দেয়া আলুভর্তা
বা মৃত্যুর যাত্রী পাণ্ডু-কামলার মুখ ।
দূরের কাছের সকল প্রকার সান্ত্বনার বাণী
ঘরে-বাইরে, ক্লান্ত শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাপের ছোবল রূপে।

এসব দ্বন্দ্বের কাঁটা অলা খাড়া লেজ দেখা গেলে
সরল সমাজে কি কি ঘটে জানাবে কি ?

উপন্যাস

গৌতম দন্ডপাট

সব মানুষই মনের মধ্যে একটা
উপন্যাস লুকিয়ে রাখে,
যে উপন্যাসের
সে নিজেই লেখক,
নিজেই পাঠক।

সকলেই তো সেই উপন্যাসে
সফলতার গল্প লিখতে চায়,
তবুও না চাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের
কত মানুষের উপন্যাস
শুধু বিয়োগান্ত কাহিনীতে ভরে যায়।

আগামীর অন্বেষণে

সন্দীপ গাঙ্গুলী

কাল হয়তো হারিয়ে যাব আগামীর ভিড়ে
পৌঁছে যাব আর এক আমিতে,
দিনান্তের রবি যেমন মনে করায়
নতুন ভোরের আস্বাদন
তেমনি মনের কার্নিশে জমা স্মৃতির কোলাজে
বিলীন হব স্বপ্নিল অন্বেষণে,
অতীত আগামী সব মিশে
তৈরি হবে এক নতুন বিশ্বাস,
সন্ধ্যার নিয়ন আলোর সঙ্গী হবে
অস্ত্রহীন,শোষণহীন,স্বতন্ত্র এক দেশ

ফুটপাথের ঐ শিশুটা স্থান পাবে
কোন স্নেহ কুটিরে
ভগবান বললে যে চেনাবে
তার পালক বাবা মা কে,
ধর্মের আধিপত্য মলিন হবে
মানবতার সবুজ সংলাপে।

কাল হয়তো আমি থাকব না
ভালবাসার নির্যাসে মিলিয়ে যাব আগামীর ভিড়ে....

বলতে নেই

নিমাই চন্দ্র দে

বলতে চাই অনেক কিছুই কিন্তু বলতে নেই,
আসলে সহজ কথা সহজভাবে বলতে নেই।
কালো কে কালো বলতে নেই, দুঃখ পাবে। মহত
কে মহান বললে লজ্জা দেওয়া হবে।

বলতে চাই কিন্তু বলা হয়ে ওঠে না ফিরে আসি,

ভালবাসার মানুষ টিকে কতখানি ভালবাসি।
বললে আদিখ্যেতা দেখানো হয়, হয়তো তাই।
গুরুজনদের কাছে শুনেছি অপ্রিয় সত্য বলতে নেই।

আবার বলতে চাইলেও অনেক কিছুই বলা বারণ।
নিমন্ত্রণ বাড়ির আহার যেমন-ই হোক, মন্দ বলতে নেই।
পাত্রীর রঙ কালোর পরিবর্তে বলতে হয় শ্যামলা বরণ।
মেয়েদের বয়স আর চাকরির বেতন সঠিক বলতে নেই।

নিজের সম্পর্কে অপরের যেমন ধারনাই থাক না কেন
আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজেকে জাহির করতে নেই।
প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যায় কথার ভুল ধরতে নেই।
আবার নীতিকথা গল্পের রাখালের মত মিথ্যা ও বলতে নেই।

অপ্রিয় সত্য ও বলতে নেই, আবার -
মিথ্যা ও বলতে নেই সবার।
তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়ালো এবার

অর্থাৎ তুমি চোখ কান বন্ধ রাখ, হয়ে যাবে যা হবার।

দেহতত্ত্ব ও মানবতা

কমল কৃষ্ণ কোঙার

শরীরের অধঃপাত জীবাণু ঘটিত,
লৌহদৃঢ় মন তবু সাধনায় রত।

দায়বদ্ধতা রাখে মনকে সজীব,
ক্ষয়িষ্ণু মন রাখে দেহকে নির্জীব।

সাধনার লক্ষ্যে ও যে নিবেদিত প্রাণ,
মানুষকে ভালোবেসে জীবনের গান।

রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বাঁধে কিটানু পামর,
গন্ধ শুঁকে বিহঙ্গী বসায় কামড়।

কীটের দংশনে দেহ হয়নি অস্থির,

সুদিনের ভ্রমরী করে নত শির।

সুসময়ে সোহাগিনী রূপের বাসর,
অসময়ে গোয়ালিনী বাজায় কাঁসর।

মানুষের পাশে থাকা বিষম দুর্দিনে,
জীবনের বন্ধন রাঙা হয় খুনে।

লোভ আর লালসায় বৃত্ত তনুমন,
সয়ে যায় সবকিছু দমন সমন।

সব গাথা পুরাতন, নয় মানবতা,
ষড় রিপু অধিষ্ঠিত, সততা মমতা।

হাজার বছর বেয়ে মানুষের গতি,
দমিত মনটা ভাবে রাখিব সংগতি।

মাঝে মাঝে স্খলনের নগ্ন পরিণতি,
আবরনে মুখ ঢেকে হয় নাক সতী।

অরন্যানী শ্বাপদের নাই লজ্জা ভয়,

জনপদ একদিন ছিল অরণ্যময়।

তত্ত্বজ্ঞান নীতিজ্ঞান চলে অবিরত,
মানবতা সর্বোপরি বিরাজে শ্বাশত।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ গুণীজন কথা,
সাধকেরা মৃত্যুঞ্জয় স্মরণীয় গাথা।

শেয়াল মামা

মুসাফির গৌতম

শেয়াল করে হুক্কা হুয়া
বাঁশ বনের-ই ফাঁকে,
সন্ধ্যা হলে কোরাস সুরে
দলটি বেঁধে ডাকে।

বন বাদাড়ে বন্য শ্বাপদ
ঘুরে ফিরে বনে,
পারলে বাগে ধরতে পারে

খামচে এক্ এক্ জনে।

শেয়াল শুনি চতুর প্রাণী
বুনো জন্তুর মাঝে,
তবু তারা সজাগ থাকে
আকাল নামা সাঁঝে।

আসলে কি জানিস রে ভাই
কেন এমন করে?
ওরা হলো রাজার চেলা
বিশ্ব চরা-চরে।

ছলা-কলা ভালোই জানে
চুপটি থাকে দিনে,
সন্ধ্যা হলে পোকা-মাঁকড়
বিনে পয়সায় কিনে।

দলটি বেঁধে ঘুরে বেড়ায়
খালে বিলের ধারে,
যেন রে সব লাটের জামাই
নাগাল কে পায় তারে?

মরা কিম্বা জ্যান্ত যা হোক
সবটা পারে খেতে,
মহানন্দে ভোজন সারে
হই হুল্লোড়ে মেতে।

এমন জীবটি আর কি কোথাও
পাবে বন্ধু দেখা,
তাই তো কতো গল্প গাঁথায়
নামটি আছে লেখা!

শরীর

সজীব দাস

হাড়, মাংসপেশি, ইন্দ্রিয়ের সংমিশ্রণে আঁকিবুকি,
বাহির হতে সাদা - কালো চামড়ায় বিদ্বেষী;
নাশকতার চৌকাঠ অতিক্রম করে খুনসুটি,
মানবতার আস্তানায় হয়ে ওঠে চির বিরোধী।
শীতের অমলিন বাতাসে হয় গুটিসুটি,

অস্থিরতায় চাঞ্চল্য তৈরি করে গ্রীষ্মের পরিধি;
বাহুবলে , জ্ঞানবলে উপস্থাপন করে ভুরিভুরি,
বিকশিত হলে তবে বলে আমি বিজ্ঞানী।
সবলতায়, দুর্বলতায় বিভাজিত হয় নারি - পেশি,
সময়ের তৎপরতায় সাক্ষ্য করে আকারের গতিবিধি।
সদ্যোজাত, শৈশব, বয়সন্ধি, পরিণত,বার্ধক্যে - ইহার নতিগতি,
অগ্নিগর্ভে ভস্ম হয়ে যায় এই সাময়িক অতিথি।

আদরের নৌকো

জহিরা খান

নিঃসঙ্গ সময় কে পার করে নিঃসংকোচে ভেসে যায়
আদরের নৌকা
আদরের পালে উদ্দাম ঝোড়ো হাওয়া.....
আদরের নৌকো বড়ই টালমাটাল।
ছেড়া পাল, বাতাসকে ভর করে ভাসিয়ে দেয়
নিজেকে...

টুকরো টুকরো স্মৃতি ,ওই যে ভালোবাসা, গাঢ় চুম্বন
সব সব উড়ছে ,

উদ্দাম ঝড়ে নাবিক আমি।
আদরের নৌকা দুহাতে আগলে রেখেছি।
প্রাণপণে বৈঠা বাইছি,
উড়ন্ত ভালোবাসাগুলো জড়িয়ে প্যান্ডোরার বাক্স বন্দি
করছি,
তবু কেন আদরের নৌকা অশান্ত!!

বুকের আঁচল উড়িয়ে এখন নিজেই পাল তুলেছি।
উদ্দাম হাওয়ার সাথে খণ্ডযুদ্ধে আমি কি জিতেছি?

জানতে, প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেখলাম
সব ভালোবাসা জোনাকি হয়ে উড়ে গেছে
উদ্ভ্রান্ত আমি জোনাকিকে চুম্বনের আশায় দৌড়াচ্ছি।
এখন আমার আদরের নৌকা বড়ই নিঃসঙ্গ।
দিক্ শূন্য,একা একেবারে একা,আমার মত।

খুঁজে নেবে

স্বপন মুখোপাধ্যায়

সময়ের ঝোড়ো বালুতটে
উবে যায় শিশিরের ঘ্রাণ
আরুশির মোহ মেখে জেগে ওঠে
ঘাস আর জলফড়িং।

আমি এই পশ্চিমা বাতায়নে
একা একা রই--
দূর আলাস্কার সুষমায় কান পাতি
খুলে যায় গির্জাঘরের কপাট।

বেলা পড়ে,বিকেল হয়ে আসে
পলাশের জামরঙা গোধূলির আলো
আলোদের কাছাকাছি এসে--
তুমি আমার বান্ধবী হয়ে
কুড়িয়ে নাও বিকেলের হলুদ।

এখুনি চাঁদ উঠলে,আলাস্কার চাঁদ--

চাঁদের আলো চাঁদের গান
মেতে উঠবে তুমি;
ঘাস আর জলফড়িংরা খুঁজে নেবে
সন্ধ্যার সন্ধানী ঘর।

উন্মুক্ত দরজা

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

উন্মুক্ত করে রাখি দরজা
সকলের প্রবেশ অবাধ

কখনো বিনম্র রোদ এসে পড়ে
ত্বকের বারান্দায়
অজানা পাখি আসে, গান গায়
আর আমার গলায় সাতসুর খেলা করে

আষাঢ়ের মেঘ আসে
গল্প শোনায়
দুঃখেরা বৃষ্টি হয়ে আমাকে করে তোলে দ্রব

ঋতুবৈচিত্রে মনেতে ফুটে ওঠে রুদ্রপলাশ

বাতাস এসে কানে কড়ি মধ্যম ছুঁয়ে
দাঁড়ায় পঞ্চমে
সারা শরীরে যেন বেহালার ছড়
তোলে ঝঙ্কার

সকলেই আসে, শুধু কিছু দিয়ে যেতে চায়
আমি তাই আগল খুলেছি এই দরজার।

ওয়েসিস

বিপত্তারণ মিশ্র

মৌসুমি, তুই ওয়েসিস হবি?
এক মরুভূমি জীবন যাপন
মধ্যে মধ্যে তুই,
আগুন বালির ঝালাস লাগা
ক্লিষ্ট বুকে শুই,
তোর স্নিগ্ধ বুকের ফুলে
নতুন জন্ম থুই।

জীবন যুদ্ধে তুই আছিস
ভয় মানি না ঝাঁপ দিতে
বুক জোড়া ওয়েসিস।
জল আছে আর
নরম, কচি ঘাস আছে,
দোয়েল পাখির গান আছে,
লতায় বুনো ফুল আছে,
মরুভূমি মধ্যে তবু
মরুযাত্রী প্রাণ আছে।

কবিতার গল্প

শুভ্রকান্তি মজুমদার

সে কোন কালের কথা!
চাঁদকে নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখব বলে,
হাজার ভেবেও প্রথম লাইনটা খুঁজে পাইনি!
চাঁদকে নিয়ে আমার কবিতাও লেখা হয়নি এই

সেদিন পর্যন্ত। এই গত ভরা পূর্নিমাতে আমার ঘর
জোছনায় ভরে যেতেই,সব অমাবস্যা কেটে গিয়েছিল।
আমি চাঁদকে নিয়ে লিখে ফেলেছি আমার সাধের চাঁদের
কবিতা। আসলে প্রথম পংক্তিটা ঠিকঠাক খুঁজে না
পেলে
পেলে কবিতা হয়না।

উচ্ছল উজ্জ্বল কিশোরী,এক পাগলি মেয়ের মত ঝালং
নদীর বয়ে চলা দেখে, নদীর কবিতা
লিখতে গিয়েও অবাক হয়ে দেখি,
ওই প্রথম লাইনেরই বড় অভাব!
নদীর কবিতাও লেখা হলনা আমার।
এখনও সেই বহমান নদীর ধারে ঠায় বসে আছি।
আমি নিশ্চিত। চাঁদই একদিন উচ্ছল উজ্জ্বল
কিশোরী,এক পাগলি মেয়ের মত নদী হয়ে আমাকে
দিয়ে লিখিয়ে নেবে তার কবিতা।
প্রথম পংক্তিটা ঠিকঠাক খুঁজে না পেলে কবিতা হয়না।

আকাশকে নিয়েও একটা ব্যাপক কবিতা
লিখবার ইচ্ছে ছিল মনে, কবিতা লেখা
শুরু করার কথা খুঁজে পাইনি এখনও, তাই

আকাশের কবিতা লেখা হলনা আজও।
আমার আকাশ এখনো অন্ধকার।
প্রথম পংক্তিটা ঠিকঠাক খুঁজে না পেলে কবিতা হয়না।

এসবে আমি একদম হতাশ নই,
তুমিও হতাশা হয়ো না
জানলে তুমি খুব খুশি হবে,তাই জানিয়ে রাখি,
মেঘ ও সমুদ্র,পাহাড় নিয়েও কবিতা লেখার পরিকল্পনা
আছে আমার। তারপর একদিন সব কবিতা লেখা হলে,
যুৎসই প্রথম পংক্তি খুঁজে নিয়ে,তোমাকে নিয়ে
লিখবই লিখব আমার শেষ কবিতা!
তোমাকে ভালোবাসার কবিতা।

আসলে ,কবিতা লিখতে
প্রথমে একটা আকর্ষক পংক্তি খুঁজে নিতে হয়।
প্রথম পংক্তিটা ঠিকঠাক খুঁজে না পেলে কবিতা হয়না।

চোরাবালি

বদরুদ্দোজা শেখু

আগুন-ঝরা রোদ ছিল কাল ,ঘাম -ঝরা অস্বস্তি
আজ এখানে মেঘের মাদল বাদলের বিপত্তি –
ঝোড়ো হাওয়া, আসা- যাওয়া নাওয়া -খাওয়া বন্ধ
প্রবল প্রতাপ ঘূর্ণিব্যতার জলোচ্ছ্বাসের সন্দ
সমুদ্রোপকূল বরাবর , আইলার বিধ্বংসী
ফণীর ফণার উড়ণচণ্ডী ভয়াল করাল- দংশী
আক্রমণের সম্ভাবনা , পালাও সবাই পালাও
জীবন নিয়ে পালাও দ্রুত যেখানে পারো পালাও
নিরাপদ আস্তানায় ওঠো, হাঁড়িকুঁড়ির সংসার
তুচ্ছ এখন , নৌকাজীবির জীবনযাপন ছারখার
এই অকালে , নদী নালা খালবিল অরণ্য
ভরা দারুণ দস্যি দামাল জলজ লাবণ্য ,
মনোরম এই সাগর বেলায় জীবন এমন যুদ্ধ
হঠাৎ হঠাৎ বদলে যায় এই সমুদ্র বিক্ষুব্ধ ---
ভেসে যায় সব ঘরসংসার চালচুলো চৌহদ্দি
খড়কুটোর থেকেও নস্যি,অনিশ্চিতির মধ্যি
প্রতিনিয়ত ধ্বস্ত জীবন দুঃস্থ দৈন্যার্ত ---

ভিটে ছেড়ে কোথায় যাবো ? জীবন-জীবিকার্থ
সব আমাদের এই সমুদ্র রুদ্র সুন্দরবন ,
ঊর্ধ্বে নীচে ঝড়-তুফান আর ক্ষুদ্র জীবন-পণ
এই আমাদের বাঁচার মন্ত্র সন্ত্রস্ত সন্ধি
সর্বক্ষণ সারা জীবন কুমীর বাঘে বন্দী ।
ত্রাণের কথা আর বোলো না ,রাজনীতি-ত্রাণতন্ত্র
পাশাপাশি দুটোই আসে পরিহাসের রন্ধ্র,
শূণ্য থেকে আবার শুরু, আবার বোঝাপড়া
গাঙ-মহলের সারসত্য নিত্য ভাঙাগড়া--
মূহুর্মূহু পালাবদল খামখেয়ালী আবহাওয়া,
জীবন যেন চোরাবালির হেঁয়ালি চাওয়া পাওয়া

বান্ধবী

সবুজ জানা

একটা বীজ অঙ্কুরিত হলে সে শুধুই একটা গাছ হয়ে থেকে যায় না...
নিসর্গ ছায়ায় সবুজ শ্রীকবিতারা সারি বেধেঁ বুকে জংলা আবেগ নিয়ে

আর কোমরে বাকল জড়িয়ে তৃপ্তির মহুল গহীনে ডুব
সাঁতার কাটে।

কিছু রোদ ছ্যাঁকাপোড়া ম্লেচ্ছ কালোমানুষ ক্যাকটাস্
পাশ কাটিয়ে
স্নেহভাজন ছায়ার ভেতর পা রাখে ল্যাটারাইট পাহাড়
দেশে চোখে পড়ে
আহা! বেচারা সব কটার পাথরের পাঁজরে অন্তোদ্বয়
আজন্ম অধিবাস।

প্রবাদ প্রবচন ঠোঁটে গেঁথে পায়ে কুড়াল মারার
করিতকর্মা একজন
পেলব ছায়া মাধুরী অপরিহার্য অক্সিজেনের স্থিতিশীলতা
মেপে নিয়ে
আমার সে পরিবেশ বান্ধবীকে আদিম হিংস্রতা দেখিয়ে
যায় বারবার...

এরপরেও এই বাঁজা পৃথিবীর একমাত্র সন্তান সম্ভবা
আমার বান্ধবী
গর্ভধানে অনুভূতিশীল...পোড়া মাটিতে শেকড় নামার
প্রসব বেদনা

মানুষের শরীরে জন্ম নেয় গাছের নাক, মুখ... আই ভি এফ্ মানবিক।

Pets/ Kids

Dr. Sangeeta Sharma

It is in vogue these days to pet dogs!
Of breed diverse.
The rarer the breed, the prouder the owner
The puniest to the largest
You find them on the leash
In all sizes…
An irony:
A bewildering sight-
A father taking an evening walk with barely a year-old child
With all his attention focussed on his German Shepherd
The child staggering and tottering, in another direction, few feet apart,
On its own, on an uneven ground
Ready to trip whereas
The father more concerned
About the canine than the child

Who lets his leash go loose allowing the dog freedom to track around
And pee and poop
The wobbling kid stops and gawks at his father
But the father hardly concerned…

Poor Workers

Dr. Sangeeta Sharma

They are the poor unfortunate daily wage earners
Who live lives like butterflies for wanton boys
To make life comfortable and joyful for the prosperous
On stake, they put their existence

Perched high on the temporary scaffolds fixed on the skyscrapers
Swinging up and down, high and low
On the rope that suspends them between life and death, heaven and earth
They clean the glasses and beautify the facades

Masses, unconcerned about their plight, peril and powerlessness
Carry on life, customarily, on the busy streets
Until one day, a poignant scream reverberates
In the neighbourhood of a tumbling worker who meets his disastrous death.

Georgetown, Penang

Aneek Chatterjee

The smell of the sea is visible here,
on the plate, in seaweeds.
This old white mansion and
the black streets take you to colonial periods.
The smart lady in the reception shapes her nails,
always; and seems nowhere to go in this world, ever.
Our time has also stopped on the wooden decks,
where blue of the sky fights a twin in the sea.

Decorated rickshaws and colorful people
on ride are excellent murals on the wall,
we watch lazily in the afternoon.
The sea is wavy here, sending messages
to colonial rulers.

The bi-cycle rider from the wall took me
on
his two-wheeler and roamed in the town
and
we talked to the orange lady in a
forgotten wall.
And in one bright morning,
banana leaves and coconut rice
whispered that they would wait for us
thousand years more on the deck,
over the old sea.

Confusions

Aneek Chatterjee

Heartily allowed confusions to
reign over.
Straight lines are flat & boring.
They lie long, as if in deep & smooth
sleep all the time,
like indifferent runways.
As if, without any dreams.

Confusions are zig zag; in every
turn there is tension & expectation;
dismay, dark; hopes alluring.
Confusions are like friends staying in
distant lands; but with you in joy
& sorrow all the time

Sometimes like vibrant seasonal
flowers; wavy mountains.
Not smooth, sleepy straights,
without colored life.

GODDESS—I WAS SEARCHING FOR YOU

Dr. Paramita Mukherjee Mullick

I was searching for you for so long.
I have worshipped you through poetry and song.
You came in silently many a times.
You made no sound, no bells chimed.
You hugged me and kissed me and showered me with love.
You enwrapped me in motherly love.

I was searching for you, was I blind?
I searched and searched but YOU, I couldn’t find.
You cared for me day and night.
You protected me from every fight.
You came in to fulfil my dreams.
You were in the guise of my father it seems.

I was searching for you in every nook.
I didn’t realise you were hidden in my loved one’s look.
With you I travelled my life’s way.

Collecting precious life gems every day.
You made me grow leaps and bounds.
You filled my life with happiness, rarely found.

I was searching for you every day.
You came hushedly and showed me the right way.
You made me fulfilled and busy.
You taught me how to be simple and easy.
You in the form of my child transformed me.
You are always with me Goddess, at last I could see.

They are Walking...

Supriya Mandal

Miles after miles, cities after cities,
Bare feet, empty stomachs are walking,
Walking along the rail tracks,
Under scorching sun, in heavy rain.
These dry faces do not know to stop—
These men— the "migrant labourers",
As we have termed them, they only know
That birthland is synonym of heaven;
So, they are walking with pregnant wives,
little babies,
When we are sitting idly before tv screens
With nutritious meal and secure roof,
And swallowing the news of weary
workers,
They are walking day and night, hours
after hours...
They are walking and walking…

THOUSAND LESSONS

Sumanta Dhara

A strong wind came and
blew me up to the lane of past.
I was twice awoke to find
myself covered with black dust.

Lot of pale shadows around me
ready to put up sharp claws.
Forcibly reminded me that-
"we are your poisonous flaws."

Somehow I managed to escape
clutching the rope of pierce rays
that is now clearly revealed
in full round phase.

Still though scattering
deep holes of quicksand.
They are unable to engulf
present with lessons thousand.

Limbs can be weak for uneven path,
yet eye lids focus on destination.
There may be rain or storm ,

yet to forward with same attention.

তানসেনের ধর্না দিবসে

গৌতম বাড়ই

বিদেহী মেঘের আত্মারা শুচিপথের বাষ্পে
গুটিসুটি তানসেন ধর্নায় বসেছে
বরবুদুরের মতন স্থাপত্যের রোদেলা
মগধের কবেকার প্র্যাকটিকাল খাতায়
বল্লাল সেন কচিখুকিদের পায়ে আলতা বোলাচ্ছে
শাহেনশাহ্ কালচার কোতল করাচ্ছে খোকাবাংলা
শুঁয়োপোকা ঋতুমতী হয়ে উঠে শীতঘূর্ণিতে

অবশেষে বাঙালি নবাব আসে
তারচেয়েও খারাপ যুদ্ধ স্বভাবের ইংরাজ-রাজ
কী মজা বলে বণিকরা ঢোলক বাজায়
আর কীটদের চেয়েও অধম কিছু ক্ষমতাবান
জন্মাবার এক অমনিবাস রিলেরেস লাগিয়েছে
শেষ নেই কোথাও অনন্ত আসে বাটন
তানসেন বিলেতী ধর্নায় বসেছে কোকিলদিনের

সময়ের শেষ মুখরা

গৌতম বাড়ই

আমাকে নিয়ে কী পেতে পারো?
শুধু নিংড়ে নিলে এক বিষণ্ণজল
আর বিষাদময় কান্নাকথা
সারাটা জীবন আদতে একলা থাকা
একলা ভাবা একলা চলা
আসল কথা সেভাবে অন্যকেউ ভাবনাছাড়া
নিজেকেও তো সম্ভবত না এবং না
আগুন বেটেছি দু- হাতে ভরপুর
তারপর হাতায় ছুঁড়েছি মুখে
মুখগুলি বড় অস্পষ্ট মনে পড়ে
এখন প্রতিটি রাতে যে মুখ দেখি
প্রতিবিম্ব বোধহয় আমার
মুখোশ খুলতে খুলতে শেষ মুখোশের তলায়
ঐ মৃতমুখ ভেসে উঠে সাদরে

সম্পর্কটা

সুবর্ণা সরকার

আমাদের সম্পর্কটা অসুস্থ
অথচ তার জন্য তোমার সময় নেই;
আনন্দ ভরা মুহূর্ত নেই,
দুঃখে ভেজা কান্না নেই,
আবেগ মাখা অভিমানও নেই,
শুকনো কোন হাসি নেই,
ক্ষণিক কালের গল্প নেই,
শুধু রয়েছে সম্পর্কটা!

আর থেকে গেছে সেই মানুষ দুটো
শুরু করেছিলো পথ চলা
যারা বছর চারেক আগে-
সবকিছুর বিনিময়ে থেকে যাবে বলেছিলো
তাই হয়তো থেকে গেছে আজও,
তবে আজ মুহূর্ত যেন থমকে গেছে,
হারিয়ে গেছে অনুভূতিগুলো।

ঘটবে অপেক্ষার অবসান,

সৃষ্টি আবারও জন্ম নেবে
সুস্থ হয়ে উঠবে পৃথিবী ।
ঝাপসা চোখ মুছে নতুন আলো দেখবে
সেই দিনটি অপেক্ষায় বেঁচে আছি আজও,
হয়তো সেদিন আবারও জীবনের গতি ফিরবে।
বৃষ্টির পর শীতল সবুজ স্নিগ্ধ মনোরম বাতাস,
নীল আকাশে আবার ও রামধনু দেখা দেবে,
সম্পর্কগুলো বিশুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রাণ ফিরে পাবে।

বেশ্যা নই

পলাশ পাল

বারংবার ফিরে আসি সেই একই পথে
যেখানে সন্ধ্যে হলেই
সন্ধ্যার চিৎকার শোনা যায়
মুহুর্তের ব্যালকনিতে।
যেদিকেই তাকাই নিকষ কালো আঁধার,
আরেকটু এগোলেই আরো ঘন।
সময়ের বেড়াজালে বন্দী বেশ্যা আলোর

অনুভবের আগুনে নিজেকে পোড়ানোর
শত চেষ্টা,
তবুও এগিয়ে যাই অন্ধকারের দিকে...
আমার রাস্তা রুখে দেয় অপেক্ষা।
সামনে নাকি ভয়ের পাহাড়,
তবে কেন শোনা যায়
তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ?
তোমায় ঘিরে সাজানো সংবাদের আজ
ইতিহাসের পাতা ছোঁয়ার প্রয়াস,
আর আমি ছুঁতে চেয়েছি সেই ভয়।
একবার চেয়ে দেখো,
তোমার আনন্দাশ্রু আবারও ফিরিয়ে আনে
মাটির সোঁদা গন্ধ।
শুধু একবার বলো,
"কিসের ভয় ?
আমি তো বেশ্যা নই।"

অভিসার

মহাজিস মণ্ডল

এক একটা নিঃস্ব প্রহর পেরিয়ে দেখি
বিকেলের কার্নিশে ঝুলে থাকে মেঘ
অবিরত হাতছানি তাকে আর ডাকে না আড়ালে
হৃদয়ের উঠানে কখনও রোদ ঝরে কখনও বৃষ্টি
গোপন প্রপাতে গড়িয়ে যায় আলোর অভিসার
অন্ধকার যেখানে নতজানু গভীর
আত্মসমর্পণে...

জ্যান্ত দুর্গা

রোহিত দাস

পথের ধারে মোরের বাঁকে কখনো কি
জ্যান্ত দুর্গা দেখেছো?
শুকনো শরীর রুক্ষ চুল নিরস চোখে
কখনো কি নিজেকে হারিয়েছো?
সেসবের আর সময় কোথায়,যানজটে

হয়তো দাঁড়িয়েছে তাদের পাশে,
সুযোগ বুঝে তারাও দিয়েছে বাড়িয়ে হাত
দুটো পয়সার জন্য তোমার কাছে।
কখনো তুমি দিয়েছো উদারতা দেখিয়ে কখনো
ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ অন্য পানে,
কখনো ঠেলে ফেলে দিয়ে দিয়েছো গালাগালি
বারে বারে তোমাকে বিরক্ত করার কারণে।
কখনো কি ভেবে দেখেছো কিসের অভাব এত যে
তোমার কাছে পেতেছে হাত
কখনো কি কাঁদতে দেখেছো তাদের খিদের জ্বালায়
সারা সারা রাত
না তার আর সময় কোথায় তুমি তো ব্যস্ত তোমার
আপনদের নিয়ে স্বার্থপরের দুনিয়ায়,
যেখানে মাটির মূর্তি কে তুমি দেবীরূপে পুজো করো
আর জ্যান্ত দূর্গারা পড়ে থাকে পথের কিনারায়।

আত্মানং বিদ্ধি

শান্তনু মাইতি

হে ইশ্বর, আমায় দয়া করো,
ভিক্ষে দিয়ো আর একটু জীবন…
নিজেকে জানার আরও কিছু পথ হাঁটা আছে বাকি…

জন্মসূত্রে আমার কোনো জমিজিরেত নেই
নিড়ানিই ছিলো আমার পূর্বজীবিকা,
পরের জমিনে লাঙলের সার্কাস
দিনান্তে সেদ্ধ পোড়া রাতের ঘুম।
এরই মাঝে জন্মালো প্রেম আমার…

একদিন পঙ্গপালে খেয়ে গেলো শব।
কোনো টীকা, কাকতাড়ুয়া, সার আর সারমর্ম ছিলো না সেদিন।
ছিল শুধু আমার কোটি কোটি ব্যর্থতার পাপ
ভালোবেসে দূরে থাকার অভিশাপ।
নিজেকে নিঃস্ব ভেবে,

আমি সিঞ্চনে দিয়েছি ফাঁকি,
সমস্ত আনাজ আমি নষ্ট করেছি
বিষাদের জংগলে।

নরকে সমূহ শাস্তি আমি মেনে নেবো,
সহস্র মরুভুমি একা খালি পায়ে হেঁটে দেবো,
শিউলি সকালে কবিতার অঞ্জলি তুমি নিয়ো
ধর্মাবতার, প্রাণদ কিছু শ্বাস ধার দিয়ো···

শব্দই আমার প্রাণপাখি, ইবাদতে আছে জান
প্রোটপ্লাজমে বেসুমার প্রেম, একটু নদী হতে দাও
ভগবান···

জীবনটা এক সাদা খাতা

রণজিৎ সরকার

মনুষ্য জীবন এক সাদা খাতা, আছে অগুণিত পাতা
কালের কলমে প্রত্যহ হয় অদৃশ্য আকৃতিহীন লেখা।
লেখা হয় আনন্দবিষাদ মিশ্রিত সুখদুখের কথাকলি
তৈয়ার হয় জীবন সাহিত্যের নতুন নতুন বই ;

এ বই লেখা চলে জীবনভর।

এ লেখা না মানে ভাষার রীতিনীতি সরল ব্যাকরণ
এ লেখায় নেই কোন দাড়িকমা যতিচিহ্ন,
হয় না প্রেসে ছাপা ছত্রেছত্রে গোপন শব্দ ভিন্ন।
এ লেখায় কত জীবন আলেখ্য কাব্যোপন্যাস হয় রচনা
দিনদিন বাড়ে পৃষ্ঠা জুড়তে থাকে আজীবন !

সাদাপাতার বইখানি সাদাকালো থেকে হয় রঙিন
ছোটোবড়ো সুন্দরবেয়া তেলজলছবি রয় আঁকা,
এ বই পড়ে কেউ শেখে কেউ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।
জীবনবইখানি নিন্দা ভর্ৎসনা শ্রদ্ধা প্রশংসার তুলিতে হয় রঞ্জিত।

ভালো মন্দ যাইহোক -
অক্ষরহীন লেখাগুলি অদৃশ্য বইয়ে ভটভট করে ছাপা থাকে।

বইখানি যদি গুণে ভরা হয় ---
তবে সমাজ কর্তৃক হয় সমাদৃত ,হয় পাঠ্য ;
নতুবা এ বই হয় বর্জিত চরণধূলোয় গড়াগড়ি খায়,

কনকাঞ্জলি

গোবিন্দ মোদক

তুমি বেনারসি শাড়ির আঁচল উড়িয়ে চলে যাচ্ছ।
তোমার পিছনে খই ছিটানো গলিপথের শেষ প্রান্তে
দাঁড়িয়ে আছেন তোমার গর্ভধারিণী জনমদুখিনী মা।
তাঁর দু'চোখ টলটলে দীঘি, উপচে পড়ার অপেক্ষায়।
তোমার পিতাশ্রী এ দৃশ্য দেখতে পারবেন না বলে
নিজেকে অন্তরীণ রেখেছেন স্নানঘরে।
স্নানঘরের জলের তোড়ও হার মানছে
তার হৃদয়াবেগের কাছে।
কিন্তু বাইরে কেউ তা টের পাচ্ছে না।
আত্মীয়-প্রতিবেশীদের জোড়া জোড়া চোখ
তোমার গমনপথের দিকেই তাকিয়ে আছে।
এক ডজন ক্যামেরার চোখও
তাক করেছে তোমারই দিকে নানা ভঙ্গীতে।
এক ... দুই ... তিন ... চার ...
অসংখ্য ফ্ল্যাশবাল্বের ঝলকানিতে
তুমি স্থিরচিত্র হয়ে ধরা পড়ছো অ্যালবামে।
সবার দৃষ্টি তোমার দিকে, তোমার গমনপথের দিকে।

শুধু আমি লক্ষ করে দেখছি ---
তোমার নিজের হাতে লাগানো
ভালোবাসার আঙ্গুর-লতাগাছটা
কেমন যেন শুকিয়ে গেছে জলের অভাবে।
হায় রে কনকাঞ্জলি !
কালস্রোতে ভেসে যায়, হয় নিশ্চিহ্ন !!

রাতের বিভূতি

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

রাতের পরিযায়ী ট্রেনের শেষ পৃষ্ঠায়
উথলে ওঠে দিনশেষ দ্রাক্ষারসবিন্দু।

স্বর্গ চুমে যায় মর্ত্যের সারাৎসার
কাশের পালকে ভাসে পথের পাঁচালী।
বিভূতি কান পাতে,
শিউলি ঠোঁটে অপু দুর্গার গল্প।

বাতাস শূন্যমন,

ভিটেমাটি হারা শব্দরা
অদূরে নদীর বাঁকে
বেহাগ সুরে বেসুরে আঁকে।
দূর শার্শিতে গ্রহপুঞ্জের ব্যর্থ আর্জি
শ্বাসরুদ্ধ বিভূতির মরণাপন্ন ইহকাল...

কালচক্র

অজয় হালদার

তোমাকে দেখেছি
কালো কেশ মেলে পুতনার রুপে
ঝাঁপিয়ে কেড়েছো প্রাণ দুহাত ভরে।

তোমাকে দেখেছি
অবাক হয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে
গাছকে বশীভূত করো মাটির কোলে টেনে
নদীর জল নাচিয়ে তোলো সুনামীর সাজে
এমন কড়াল গ্রাসের কী ছিল প্রয়োজন?
কোন পাপে পাপী আজ বিশ্বচরাচর?

পুনঃ পুনঃ আসছে দুলর্ঘ্য বিপর্যয়।

তোমাকে দেখেছি হৃদয়হীনা,
তুমি নিষ্ঠুর তুমি পরাক্রম
বৃষ্টিকে তুক করে পাঠিয়েছ
বার্তা আনয়নে
বাতাসকে করেছ ভয়ংকরীর বেশে
ঘরে ঘরে বিভীষণ রুপে
তোমার চাউনিতে নেই স্নিগ্ধতা
গোপন অভিসন্ধিতে তুমি চালিয়েছ তরবারি
শিরোচ্ছেদে ভুলিয়েছ আশা
দূর্বল সব নর নারীর।
আজ আর নেই সেই কৃষ্ণ
যে করবে তোমাকে বধ
কালচক্র মরচে পড়ে ব্যক্তি স্বার্থতায়
অনুভূতি হীন নিরস হৃদয়ে কাটেনা কোন দাগ
আজ সকলেই ব্যথিত তোমার কাছে...
সে আমাদেরি নিজ কর্মের ফল!

জাগরণ

সুস্মিতা ঘোষ

ঘুমিয়ে ছিলাম।
এক অসীম অনন্তকাল ঘুমিয়ে ছিলাম, চোখ খুলেই।
দোদুল্যমান চোখের পলক চেয়ে ছিল তবু ,

অনভিজ্ঞ অনভ্যস্ত চোখ আঁতিপাঁতি করে খুঁজছিল কিছু
স্বপ্নের মর্গ থেকে।
অপূরিত স্বপ্নের সংরক্ষণাগার তখনও সংশয়ে।

ঘুমিয়ে ছিলাম ।
সূর্যের রোদটা এখনও খানিকটা তীর্যকভাবে চোখে
পড়ছে,
হয়তো অন্ধ হতে পারে বাদুড় চোখ।
স্বপ্নের ক্ষেতে জলের পাশাপাশি আলো আসছে।

রোমন্থনের ইতিকথা

বাসব রায়

পুরনো প্রেমটা প্রৌঢ় বয়সে তরুণ হয়
নির্লজ্জ হলেও নির্লোভ সে আকাঙ্ক্ষা -
কামগন্ধহীন সম্পূর্ণ - !

যৌবনের সকালটা উপলব্ধির বাইরেই ছিলো
দুপুরটা ছিলো বিমূঢ় অবোধ উপন্যাসের পাতা ;
ঘুমকাতুরে সন্ধ্যেটা সুযোগের অপেক্ষায়-

অকারণ রাতটা চাঁদ দেখতেই গেছে
একসময় অপ্রেমিক মেঘ চাঁদের দখল নেয়-

পুরনো শব্দটি পুরনো হয় না
প্রতিদিন সে ঋতুমতী হয় , সন্ধিকাল পেরোয় ;
সূর্য ডোবার আগে সিগারেটে পোড়া ঠোঁট আরেকবার
যুবক হতে চায়- ।

স্পর্শকাতর সংলাপ

সমিত মণ্ডল

এই পোড়া দেশে
উন্মত্ত সাধু — যোগী
ছাই ভস্ম মদ-মাংস খায় ভোগী
এক পঙক্তিতে দাঁড় করায়
ষাঁড়-বলদ-নারী!
দুহাত ভরে শান দিই
বিষাক্ত তরবারি
এই চরাচরে শিস দিই অবাধ
বেশ ভারি।

শোন রোমিও জুড়ি
পূবে-পশ্চিমে উন্মাদ ঘুরি
এদেশ এখনও আব্রুতে ঢাকা
ঠুসে দেব গরম ত্রিশূল, ছ্যাঁকা

ফুল-মালা জপি
জিগির তুলি, তুলি ভর
ঘুমনোর আগে দেখে নিস
তোদেরও আসবে জ্বর!

ভালো করে দ্যাখ
রোমিও বিরোধী স্কোয়াড
লাভ জিহাদ, আস্ফালনে ভর্তি
সেলাই করে দেব মুখ
জানিস কী খতরনাক দর্জি?

আস্তিনে লুকানো যাদুছড়ি
পাঠাবো ফরমান
মুছে দেব ইতিহাস — বলিদান
হাঃ— ফুঃ—
এদেশ দ্যাখ নতুন তালিবান!

উন্মত্ত ——যোগী
ছাই-ভস্ম মদ-মাংস খায়
ভোগী——!

সমর্পণ

অদিতি ঘোষদস্তিদার

সবে কলাইয়ের থালায় পান্তাটা চটকে সুলুপ করে টানতে গেছি, দুমদাম করে সুপর্ণা ঢুকে পড়ল। আমি পা ছড়িয়ে বসে মায়ের ছাপা শাড়িটাকে হাঁটু অবধি গুটিয়ে মৌরলা মাছের টক দিয়ে ভাত মেখে জম্পেশ করে খাচ্ছিলাম। সুপর্ণাকে দেখেই তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়াতে গেলাম আর থালাটা উল্টে বাকি জলজলে জিনিসটা উল্টে পড়ল পায়ে ।

মাথা আগুন - শেষপাতের অমন সাধের অম্বলমাখা পান্তার জলটুকু মাঠে মারা গেল! চেঁচিয়ে উঠলাম, "আবার তুই প্যান্ট পরে আমাদের বাড়ি এসেছিস! জানিস না মা পছন্দ করে না!"

"ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং এলস?"

কে যেন অনেক দূর থেকে বলল। কেমন যেন সব গোলমাল। কোথায় আমি?

"নো, থ্যাংক ইউ!"

হুঁশ ফিরে এসেছে। ওয়েটারকে ডেকে একটু জল চাইলাম। সব আজ গোলমাল হয়েছে ওই হতচ্ছাড়া অসীমের জন্যে। মালটার কাজ নেই, একটু আগেই মেসেঞ্জারে ফোন করল আর তাতেই আমি...

"আমার এবারের প্রাইজ পাওয়া কবিতাটা তোকে পাঠালাম! যতই হোক তোর পাল্লায় পড়েই তো আমার কবিতা লেখা শুরু! পারলে পড়িস! কবিতাটা আবার তোর এক্স গার্লফ্রেন্ডের নামে! অবশ্য লোকে বুঝবে ভাস্কর চক্কোত্তির সুপর্ণা .." হা হা করে হাসল অসীম।

কাঁচা খিস্তি দিলাম একটা।

"সুপর্ণা কোনদিনই আমার গার্লফ্রেন্ড ছিল না! তুই তো জানতিস ওতে আমাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ!''

"পাবে বসে ঢুকু ঢুকু করছিস শালা হিপোক্রিট! অথচ সুপর্ণার দোষ কী ছিল, না বড়লোকের মেয়ে!"

"মুখ সামলে অসীম!"

"আকাশ থেকে সুপর্ণা নেমে এসেছিল। তুই শালা দারিদ্র্যের অভিমান মেখে সরে রইলি। আসলে তুই এস্কেপিস্ট, পলায়নী মনোবৃত্তি তোর, আসলে... ভীষণ স্বার্থপর! নিজেকে ছাড়া কারুর কথা কোনদিন ভাবিসনি! অথচ মেয়েটা তোকে ভালবেসে..."

বিরক্ত লাগছিল অসীমের ঘ্যানঘ্যানানি! তাই কথা শেষ হবার আগেই ফোনটা কেটে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভাবনাটা এড়াতে পারিনি।
চোখের ওপর ভেসে উঠছে মায়ের রুগ্ন হাত, ঢলঢলে শাঁখা। একার হাতে সংসার চালাচ্ছে। অসুস্থ বাবা। কোনরকমে দিদির বিয়েটা দিয়েছে। এরকম সংসারে কি সুপর্ণাকে আনা যেত?
বিদেশে আসার ব্যাপারে অবশ্য সবচেয়ে সাহায্য করেছিল সুপর্ণাই। মা অনেকবার বলেছিল ওর ব্যাপারে সিরিয়াস হতে। মা খুব ভালোবাসত সুপর্ণাকে। বলত, "ওর মনটা সাদা, তুই সুখী হবি!"
আমি হেসে উড়িয়েছি। কিন্তু নিজেও আস্তে আস্তে সেই সংসার থেকে এসেছি সরে, টাকা পাঠিয়ে কোনরকমে দায় সেরেছি। আজ আর মা বাবা কেউ নেই। সুপর্ণা কোথায় আছে জানা নেই।
মা ওর প্যান্ট পরা নিয়ে কোনদিনই কিছু বলেনি। কে জানে, আমিই হয়ত তখন মনে মনে চেয়েছিলাম সুপর্ণা শাঁখা সিঁদুর পরে ঘোমটা টেনে মৌরলা মাছের টক রাঁধুক!
আমার কথা এখনও ভাবে সুপর্ণা?

অসীম শেষ কথাটা কীযেন বলছিল? আমাকে ভালোবেসে সুপর্ণা কী? আর একবার ফোন করব অসীমকে?
বরফ পড়া শেষ। নিউইয়র্কের আকাশে তারার মেলা। ফাঁকা বাড়িতে ফিরতে হবে।

আমার এখন খুব শীত করছে। আমাকে একটা নরম সোয়েটার বুনে দিবি সুপর্ণা?

সমভূজা

কেয়া চ্যাটার্জি

কাপড়ের থলের ভিতর একে জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখছে নিতাই ময়রা। আরো কিছু পুটলি রয়েছে এদিক ওদিক। কালই ছেড়ে যেতে হবে গ্রাম । রাজা মশায়ের আদেশ। না মেনে কি আর থাকা যায় ! বারান্দায় উঁকি মেরে দেখল নিতাই । গায়ত্রী দাওয়ায় বসে ভাত নামাচ্ছে। উনুনের আঁচে তার মুখের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। নিতাই গুটি গুটি পায়ে দাওয়ায় এসে বসে । গায়ত্রী ভাত বাড়তে বাড়তে তাকায় স্বামীর দিকে । উদাস চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা পূর্ণিমা চাঁদের দিকে। লম্ফের আলোয় মুখটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না যদিও। তবু গায়ত্রী বুঝতে পারে, লোকটা কাঁদছে।

ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত, আলু সিদ্ধ আর শাকভাজা, নুন, কাঁচালঙ্কা থালায় সাজিয়ে স্বামীকে খেতে দেয় সে । শীতের রাত, হাত পাখা নাড়ানোর প্রয়োজন নেই । নিতাই খেয়াল করে না । তাকিয়েই থাকে আকাশের

দিকে। এ গ্রাম তার জন্মভূমি, কর্মভূমি। এ গ্রাম ছেড়ে সে থাকবে কোথায়? গায়ত্রীর ডাকে সম্বিৎ ফেরে তার। ঘটি করে কিছুটা জল গলায় ঢেলে আলু সেদ্ধ দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলে, “ তোমার থালা কই?”
“তুমি খাও তারপর আমি খাবো।” বলে গায়ত্রী। নিতাই বিরক্ত হয় , “কতবার না বলেছি একসাথে খেতে বসতে। এটা আমাদের দুজনের সংসার । দুজনেই সমান।” গায়ত্রী মুচকি হেসে নিজের থালা সাজিয়ে নিয়ে আসে। নিতাই তৃপ্তি ভরে খেয়ে একটা ঢেঁকুর তুলে হেসে ফেলে । হাসি ছড়িয়ে পড়ে স্ত্রীর মুখেও । চৌকিতে শুয়ে ঘুমআসে নাদুজনের । এই বাড়ি, এই পাড়া, দোকান, প্রতিবেশী ছেড়ে মন চাইছে না একেবারেই। কিন্তু উপায় নেই । ভোরবেলা পেয়াদা আসার আগেই চলে যেতে হবে । এমনই হুকুম রাজা মশাইয়ের।

কৃষ্ণনগরের এক ছোট্ট পাড়ায় একটা ছোট মিষ্টির দোকান চালায় নিতাই ময়রা। পসরা বেশ ভালই। সেই কোন বয়স থেকে দাদুর সাথে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গ্রামের বিখ্যাত ময়রাদের কাছে নানান মিষ্টি বানানো শিখেছে। পড়াশুনা শেষ হতেই গোঁ ধরে বসল , মিষ্টির দোকান

লাগাবে। নিতাইয়ের বাবাও খুব একটা আপত্তি করলেন না। চাকরি করতে হলে, যেতে হবে সেই কলকাতা । সেখানে থাকা, খাওয়া বাবদ যা খরচ হবে তা সামলে কত টাকাই বা পাঠাতে পারবে বাড়িতে ? তাছাড়া যার যা করতে ভাল লাগে তার সেটাই করা উচিত । অন্য কিছু করলে বাহ্যিক উন্নতি হলেও মানসিক উন্নতি হয়না।তার চেয়ে বরং ঘরের ছেলে ঘরেই থাক । মহাজনের কাছে ধার বাকি করে একটা দোকান ভাড়া নিল নিতাই । মিষ্টি তৈরির সমস্ত উপাদান , হাঁড়ি, কড়াই, খুন্তি সব কিনল বাকিতে । নিতাইয়ের বাবা একবার প্রমাদ গুনলেন । এতো গুলো টাকা , ছেলে শোধ করতে পারবে তো? তবু মুখে কিছু বলেননি । ভরসা রেখেছেন সন্তানের ওপর । নিতাইও মা বাবার মুখ রেখেছে । ধীরে ধীরে নিতাই ময়রার নাম কৃষ্ণনগরবাসীর মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করল। কি নেই নিতাইয়ের দোকানে? লেডি কেনিং , চমচম, মিহিদানা, সীতাভোগ, সন্দেশ , জলভরা সন্দেশ এমনকী সদ্য খ্যাতি পাওয়া রসগোল্লা পর্যন্ত । তার সাথে সঙ্গত দিয়েছে নিতাইয়ের নিজের হাতে বানানো লুচি - তরকারি। সকাল সকাল পথিকরা মিষ্টি কিনতে এসে একটু নোনতা মুখ করতে পেরে বেজায় খুশি । নিতাই

বেজায় খুশি। বেজায় আনন্দ তার । সে স্বপ্ন দেখে একদিন ভীমনাগ বা নবীন চন্দ্রের মতো যুগান্তকারী কিছু বানাবে। লোকে ধন্য ধন্য করবে। লোকের মুখে মুখে ঘুরবে নিতাই ময়রার নাম।
তবে শুধু ব্যবসা বানিজ্য করেই তো আর জীবন চলে না। বাবা মা নিতাইয়ের জন্য মেয়ে দেখলেন । পাশের গ্রামের বিশ্বনাথ ঘোষালের মেয়ে গায়ত্রী । নিতাইয়ের থেকে সাত-আট বছরের ছোট হবে। শ্যামলা রং, টানা টানা বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, সরল হাসি মাখা মুখ , চঞ্চল তবু দৃপ্ত। গায়ত্রী বাড়িতে পা রাখার পর থেকেই নিতাইয়ের উন্নতি যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। পাড়ার লোকে কানাঘুসো করল স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী পা রেখেছেন নিতাইয়ের বাড়ি। বেশ ভালই চলছিল জীবন । কিন্তু ভাগ্যদেবী সদা চঞ্চলা। নিতাইয়ের কাছেও বেশিদিন থাকতে চাইলেন না।

তখন কৃষ্ণনগরের রাজা ছিলেন রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায় । তাঁর রাজসভায় একদিন আলচনা হচ্ছিল সুস্বাদু খাদ্য নিয়ে। সকলে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন । ভিন গাঁয়ের কোন দোকানে কি খেয়েছিলেন, কোন বিয়ে বাড়িতে মাংসটা খাসা রাঁধা হয়েছিল— আলোচনা তখন

তুঙ্গে। হঠাৎ একজন বলে উঠলেন, “তবে রাজা মশায় আমাদের এখানে নিতাই ময়রার লুচি তরকারি কিন্তু বেশ প্রসিদ্ধ। ওর দোকানে মিষ্টি যত না বিক্রি হয় তার থেকে বেশি বিক্রি হয় ওর হাতের তৈরি গরম গরম লুচি। আহা! সেকি স্বাদ । মুখে দিলে মিলিয়ে যায় ।” রাজা মশাই গোঁফে তা দিয়ে বললেন, “ তাই নাকি। আমার রাজত্বে যে এমন প্রসিদ্ধ ময়রা আছে তা তো জানতাম না। বেশ ডেকে আনা হোক নবীন ময়রাকে।”

রাজার ইচ্ছা বলে কথা । মুখ থেকে কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদা হাজির নিতাইয়ের বাড়ি । নিতাই তখন দুপুরের খাবার খেতে বসেছে । সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। গায়ত্রী একগলা ঘোমটা টেনে দরজা খুলতেই তো থ মেরে গেল । রাজার পেয়াদা! পেয়াদা তার স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য দেখিয়ে গটগট করে ঢুকে পড়ল বাড়িতে। বাড়ির সকলেই তখন ভাতের থালা ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে । পেয়াদা নিতাইয়ের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, “ এই যে নিতাই ময়রা, রাজা মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।” নিতাই থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলে বলল, “আজ্ঞে আমায়? কেন?” পেয়াদা হাত উল্টোল, “ আমি কি করে জানবো বলো? রাজার হুকুম পালন করাই

তো আমার কাজ। চলো চলো। জলদি চলো।” নিতাই দাওয়া থেকে নামার উপক্রম করতেই গৃহলক্ষীর শান্ত স্বভাব ঝেড়ে ফেলে গায়ত্রী গর্জে উঠল, “এই যে শুনুন, আপনি রাজার পেয়াদা হন বা যেই হন , সদ্য খেতে বসা একটা মানুষকে অভুক্ত তুলে নেওয়ার মতো পাপ ভগবান কিন্তু মেনে নেবেন না। আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন, উনি খাবেন তারপর যাবেন ।” গায়ত্রীর ধমক খেয়ে পেয়াদা গেল চমকে । গুটিগুটি পায়ে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিতাই গিন্নির দিকে চেয়ে মুচকি হেসে আবার খেতে বসল । ঠাট্টা করে বলল, “ যাক রাজার পেয়াদাও তবে তোমার ধমক খেল।"গায়ত্রীও খিলখিল করে হেসে উঠল।

পান চিবুতে চিবুতে নিতাই উপস্থিত হল রাজসভায়। রাজা মশাই তখনও বিশ্রাম নিচ্ছেন । নিতাই এই প্রথম রাজসভায় পা রাখল । অবাক চোখে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল চারিদিক । মহারাজের সিংহাসনটি দেখার মতো। ঠিক কোন জায়গাটা যে তার জন্য মানানসই জায়গা বুঝতে পারছে না নিতাই । সব ক'টাআসনই যেন একেকটা সিংহাসন । এমন সময় রাজা এলেন । ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু । সামান্য লালও

হয়েছে বটে। নিতাই একটু খুশি হল। রাজারাও ঘুমায় তবে। রাজা বললেন, " তুমিই নিতাই ময়রা ?"নিতাই করজোড়ে প্রণাম করে বলল, " আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ।"

— তা কি কি মিষ্টি বানাতে পারো?

— আজ্ঞে, মহারাজ মোটামুটি সবই পারি ।এই ধরুন লেডি কেনিংয়ের নামে তৈরি লেডিকেনি , রসগোল্লা, চমচম, ক্ষীরকদম , সন্দেশ, রসপুলি, দই , ল্যাংচা। তারপর...

—ব্যাস, ব্যাস।তোমার হাতের লুচি তরকারি নাকি মিষ্টির থেকেও বেশি সুস্বাদু?

নিতাই সলজ্জভাবে মাথা নিচু করে হাত কচলিয়ে বলল, " তা লোকজন বলে মহারাজ।"

— বেশ। তবে খাওয়াও একদিন তোমার লুচি তরকারি।

—আপনি খাবেন মহারাজ?

— হ্যাঁ আমিই তো খাবো । কেন আমি খেতে পারি না?

— ছি ছি, পারবেন না কেন ? এ আমার পরম সৌভাগ্য মহারাজ। স্বয়ং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আমার হাতের খাবার খেতে চেয়েছেন। এ আমার কত জন্মের পুণ্যের ফল!

মহারাজ তৃপ্তির হাসি হাসলেন । নিতাই ছুটল বাড়ির দিকে। আগামিকাল সকালেই তিনি নিতাইয়ের রান্না দিয়ে জলখাবার সারবেন । অতয়েব ভাল করে ময়াম দিয়েরাখতে হবে ময়দায় । কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সাদা আলুর তরকারি চাই । সাদা মানে ধবধবে সাদা । নিতাইয়ের সাথে হাত লাগলো গায়ত্রী। কাল একটা বিশেষ দিন । হয়তো ভাগ্য বদলের দিন। সকাল হতেই উনুনে আঁচ দিতে শুরু করল নিতাই। গনগনে আঁচেই লুচি ভাল ফোলে । গায়ত্রী আর তার শাশুড়ি কাটতে শুরুকরল আনাজ । কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় সদর দরজায় পড়ল টোকা। দরজা খুলে দিতেই হাতে দুটো বিশাল বড় রেকাবি আর লম্বা লাঠি নিয়ে হাজির হল দুজন সেপাই। তাদের দেখেই নিতাই লুচি ছেড়ে দিল কড়াইয়ের মধ্যে । ফুলকো ফুলকো লুচি আর তরকারিতে রেকাবি ভর্তি কিরে নিতাই পাঠিয়ে দিল রাজবাড়িতে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার সেই টোকা। পেয়াদা দুটি রেকাবি উঠোনে নামিয়ে হুঙ্কার করে উঠল, “ রাজা মশাই বেজায় চটেছেন নিতাই ।” নিতাই সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, “ আজ্ঞে কেন সেপাই মশাই?” পেয়াদা আবার চোখ পাকায়, “ লুচি যে ঠান্ডা

হয়ে গেছে। মিইয়ে পড়েছে।" গায়ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু নিতাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, " বেশ বেশ আমি আরেকবার বানিয়ে দিচ্ছি ।" শুরু হল আবার যজ্ঞ। আবার প্রথম থেকে সব কিছু। দুগ্গা দুগ্গা বলে নিতাই আবার রেকাবি ভর্তি খাবার পাঠাল রাজ বাড়িতে। এবার আরো ভাল করে ঢাকা দিয়ে। এতখানি পথ যেতে যেতেই তো ঠান্ডা হয়ে যাবে খাবার।

বেলা অবধি কোন খবর এলো না । নিতাই নিশ্চিন্ত মনে জলখাবার সেরে দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল ।খদ্দেরদের আগে থেকেই বলা ছিল দোকান খুলতে দেরী হবে । যথাসময়ে দোকান চালু করে ব্যস্ত হয়ে গেল নিতাই । এমন সময় আবার পেয়াদার আগমন। চোখ রাঙিয়ে গর্জে উঠল, " আজ রাজা মশাই সকাল থেকে অভুক্ত রয়েছেন । তোর ওপর দারুণ রেগে আছেন । চল রাজসভায়।" নিতাই কেঁপে উঠল, "আজ্ঞে কেন সেপাই মশাই? " পেয়াদা কিছু বলে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। একদল খদ্দেরকে ফিরিয়ে দিয়ে দোকানের ঝাঁপ ফেলে নিতাই রওনা দিল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। দুরু দুরু বুকে দাঁড়াল মহারাজের সামনে। রাগে, বিরক্তিতে তার চোখ লাল , মুখ গম্ভীর।

বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললেন, “ রাজ খাদ্য পরিবেশনের কিছু নিয়ম থাকে নিতাই। দু'বারেই কিন্তু খাবার ঠান্ডা ছিল । শাস্তি তোকে দেবো । কিন্তু খুব কঠিন নয়। গাঁ ছেড়ে চলে যাবি কালই । সকাল বেলা পেয়াদা গিয়ে যেন তোর মুখ দেখতে না পারে ।” নিতাই ডুকরে উঠল, “ বুড়ো বাবা -মা, বৌ নিয়ে কোথায় যাবো হুজুর? একটু দয়া করুন ।” কিন্তু রাজা অনড়। হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দেন , আরনয়। নিতাই বাড়ি ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়ে । বাড়ির কেউ বুঝতে পারে না কি হয়েছে। কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর যখন নিতাই আসল ঘটনা বলল, বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। শুধু গম্ভীর হয়ে থাকল গায়ত্রী।

ঝিঁঝিঁর শব্দে ঝিম ধরেছে চোখে। বাড়ির সবাই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে । গায়ত্রীর চোখে ঘুম নেই । তার চোখে ভেসে উঠছে ছোটবেলার কিছু স্মৃতি । ওদের বাড়ির পাশেই ছিল রহমত চাচার ঝুপড়ি। চাচার মেয়েকে গায়ত্রী দিদি বলেই ডাকত। তার স্ত্রীকে চাচি। ওদের বাড়ির উঠোনে সারা বিকেল খেলত গায়ত্রী । রাতের বেলা চাচি উনুন জ্বেলে কড়াই চাপাতেন । ওদেরবাড়ির রান্নাগুলো একটু অন্যরকম লাগত। গায়ত্রী

একদিন একটা পদ দেখে জিজ্ঞেস করল, " ওটা কি গো চাচি?" রেহানা হেসে বলেছিল, "তোমরা তো ওসব খাও না মা। তবে আমাদের বেশ ভাল লাগে। মুরগির মাংসের পুর ভরা ভাজা। স্বয়ং দিল্লির রাজারা খেতেন। আমি মুখ্যু মানুষ। বেশি কিছু জানি না তবে যে চাচা আমায় শিখিয়েছিল সে বলেছে যখন মোঘল নবাবরা এদেশে এসেছিল তখন থেকেই এই খাবারের চল ।" গায়ত্রী মন দিয়ে দেখতমায়ের আর চাচির রান্নার পদ্ধতি। বড় হলে সেও এরকম রাঁধবে । নতুন নতুন রান্না। ছোটবেলাগুলো বড় সুন্দর।

ভোরের আলো ফোটার আগেই তৈরি হয়ে নিল নিতাই। বাবা মা'কেও তৈরি হতে বলল। কিন্তু গায়ত্রী কিছুতেই নড়েনা। নিতাই রাগ করে । এই প্রথম ধমকের সুরে বলে, " কি হল শুনতে পাচ্ছ না। এরপর পেয়াদা এলে তো ঘাড় ধরে বের করে দেবে গ্রাম থেকে।" গায়ত্রী ধীরে ধীরে কেটে কেটে বলে , " আসুক। তবু অন্যায় মেনে নেব না ।" নিতাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বউয়ের দিকে । ছোট মেয়েটা বলছে কি! রাজার বিরুদ্ধে কথা বলবে!

পেয়াদা এসে দরজায় টোকা দিল । দরজা খুলল গায়ত্রী। পেয়াদা অবাক হল। বলল, “তোমরা এখনও বাড়ি ছাড়োনি?” গায়ত্রী ঘোমটার আড়াল থেকেই উত্তর দিল, “ আমরা গ্রাম ছাড়ব না পেয়াদা মশাই । রাজা মশাইকে বলুন আমি শেষ চেষ্টা করতে চাই ।” পেয়াদাও হয়তো মহারাজের এহেন বিচারে ক্ষুন্ন হয়েছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে গায়ত্রীর প্রস্তাবনিয়ে পাড়ি দিল রাজবাড়ির দিকে । রাজা মশাই অত্যন্ত অবাক হলেন সামান্য গৃহবধূর দুঃসাহসে । তবু অনুমতি দিলেন। গায়ত্রী পা রাখল রাজবাড়ির হেঁসেলে । বামুন বউয়ের সাহায্যে ময়দা মেখে, তরকারি বানিয়ে রাখল। রাজা মশাই খেতে বসলেই খাবার তৈরি হবে। মহারাজ এসে বসলেন খাবার জায়গায়। হুকুম হল খাবার তৈরি শুরু করার। গায়ত্রী তো এদিকে কোমরে কাপড় গুঁজে বামুন বউয়ের সাথে গল্প গুজবে মত্ত। তার নাম, ধাম, বাপের বাড়ির হাল হকিকত জানা হয়ে গেছে তার । পেয়াদা এসে তাড়া লাগায়, “ এখনো গল্প করছো? রাজা মশাই যে বসে পড়েছেন !” গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, “ খাবার এখুনি হয়ে যাবে । তবে রাজামশাই কে গিয়ে বলো একখানা শর্ত আছে ।যদি উনি খাবারটা গরম গরম না খেতে পারেন তবে আমার

স্বামীর শাস্তি ওনাকে আজ মুকুব করতেই হবে ।” পেয়াদা এবার দেখল নিতাইয়ের বৌ ময়দার তাল থেকে লেচি কেটে , বেলেতার ভিতর ভরল তরকারি । তারপর সেটিকে তিন কোণায় মুড়ে ছেড়ে দিল গরম তেলে। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে এক থালা ভাজা হাতে গায়ত্রী উপস্থিত হল মহারাজের সামনে । এমন অদ্ভূত ত্রিকোণ খাবার দেখে তো মহারাজ যারপরনাই হতবাক। বললেন, “এটা কি? লুচি কই? ” গায়ত্রী ঘোমটার আড়াল থেকেই উত্তর দিল, “আজ্ঞে মহারাজ এতে ময়দার তৈরি লুচিও আছে আবার তরকারিও আছে। আপনি খেয়ে দেখুন। তবে গরম গরমই খেতে হবে কিন্তু।” রাজা নতুন খাদ্যে লাগালেন কামড়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের উত্তাপের চোটে তার মুখ থেকে খাবার পড়ে গেল। উপস্থিত সকলেই তটস্থ। এবার কি হবে? রাজা তো আরো রেগে যাবেন! কিন্তু সভাসদদের অবাক করে রাজা এবার হেসে উঠলেন । গলা থেকে সবচেয়ে বড় মুক্তোর মালাটি গায়ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, “ ধন্য নারী বুদ্ধি। ধন্য তুমি!এ এক অনবদ্য খাদ্য। এর নাম কি রাখলে? ” গায়ত্রী মাথা নেড়ে জানায় সে কোন নাম রাখেনি । রাজা এবার মন দিয়ে খাদ্যটি নিরিক্ষন করে বললেন, “ সমভূজ ত্রিকোণ

যখন, তখন এর নাম হোক সম্ভুজা। কি কেমন নাম?” সকলে সহমত জানাল। মহারাজ সহ সভাসদ সকলে সম্ভুজার স্বাদে।

নিতাইয়ের দোকানের এখন আরো নাম ডাক । সকালে লুচি তরকারির পাশাপাশি সন্ধ্যেবেলায় সম্ভুজাও রমরমিয়ে বিক্রি হয়। গায়ত্রীর কাছে আরো অনেকে এসে শিখে গেছে সম্ভুজা তৈরির পদ্ধতি । ধীরে ধীরে গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল সম্ভুজা । সাধক, রাজা, মধ্যবিত্ত সকলের প্রিয়হয়ে উঠলএই সম্ভুজা । তবে এখন একে সবাই সিঙ্গাড়া বলে ডাকে।

ফাইনাল ম্যাচ

অভিজিৎ চৌধুরী

টানা বৃষ্টি, হয়েই চলেছে। রেইনি ডে। কলেজের মাঠে বৃষ্টিতেও কখনও জল জমত না। কলেজও ছুটি। ফলে মাঠে গেলে প্রিন্সিপাল স্যারের তাড়া খেতে হবে না।

হ্যালো বয়েজ হোয়াই আর ইউ হিয়ার্স!

পাঁচিল টপকালে জলে ঝুপ করে শব্দ হল। ঝুমা দেখতে পেয়ে ফিক করে হেসে দিল। আমি ওকে ইশারায় চুপ করে থাকতে বললাম।

ও ফিসফিস করে বলল,কোথায় যাচ্ছিস!

মাঠে।

এই বৃষ্টিতে ফুটবল হবে!

পরশু স্বাধীনতা দিবস। ফাইনাল ম্যাচ।

ফাইনালে উঠেছিস তোরা!

উঠব। সেমিফাইনালে জিতলে ফাইনাল।

ঝুমা সব খবর রাখত। বলল,সেমিফাইনালে বানটুদারা। সেভেন বুলেটস।পারবি!

সংশয় রয়েছে।তবু বললাম,ইফ দেয়ার ইজ উইল,দেয়ার ইজ ওয়ে।

ঝুমা বলল,বেস্ট অফ লাক।
মাঠে এসেছে কোচ কান্তুদা। শুভায়ুর আমাদের গোলকিপার। আর রাইট আউট স্বপন। ডিফেন্সে প্রদীপও এসেছে। সেভেন সাইড ম্যাচ। বাকীদের পরের দিন হলেও চলবে। কান্তুদা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে রয়েছে। সোমবার ছুটি থাকে।
কান্তুদা বুটের স্টাড দিয়ে মাটিতে চেপে দেখে বলল,ফাইন।
সেভেন স্টারকে ভয় পাবি না। প্রদীপ পায়ে লেগে থাকবি। ছররা। ভালো মাঠের প্লেয়ার সব। এইসব মাঠে অচল।
আমার দিকে তাকিয়ে বলল,বল ধরে ওপরে তাকাবি। মুখ নীচু করলে তোর টিমের খেলা তৈরি হবে কি করে! তুই তো স্কিমার। টিমের মিশেল প্লাতিনি। এইসব হচ্ছে কান্তুদার ভোকাল টনিক।
আর শুভায়ুর, তুই তো ভাস্কর গাঙ্গুলি। পাখির মতোন উড়িস। শুধু গ্যালারি শো কম করিস। বর্ষার মাঠে বল হাত থেকে ফস্কে যেতে পারে।
আর মনে মনে বলবি,আমরা জিতবই। ফাইনালে উঠতেই হবে।

দেখতে দেখতে পনেরই আগস্ট এসে গেল। ঝুমার বাবা বি ডি ও সাহেব ফাইনালের প্রধান অতিথি। ঝুমাও ঠিক আসবে। হেরে গেলে মুচকি মুচকি হাসবে। কিক্ অফ। সেভেন বুলেটস ডাচদের কমলা জার্সি আর আমাদের সাদা জার্সি। কান্তুদা হপ্তার মাইনে থেকে অনেক কষ্টে শেষ মুহূর্তে হাতে তুলে দিয়েছে। ফাইনালে উঠলে পাউরুটি আর চিনি। এখন চুইং গামের বদলে পাতিলেবু মুখে লাগিয়ে নিয়েছি। ঝলমল করছে সেভেন বুলেটস। বি ডি ও সাহেব মাঠে ঢুকতেই আমরা গোল খেলাম। তার আগে শুভায়ুর ৫ টা সেভ করেছে। গোলার মতনই সব শট।

হাফ টাইমে কান্তুদা বলল, এতো ডিফেন্স করছিস কেন! বুবুন ওদের বক্সে থাকবি। অফসাইড নেই,শম্ভু আমাকে বলেছে। শম্ভু মানে শম্ভুদা ম্যাচ রেফারি। সেকেন্ড হাফ। মুখ তুলেই ছুটছি। বিদেশ বসুর মতোন গতি আমার। না,পলাশ আমাদের স্ট্রাইকার পারছে না। প্রদীপকে বললাম,ব্যাক কিক করে বল ওদের পেনাল্টি বক্সে রাখতে।

তাই করল প্রদীপ। বল উড়ে আসছে। মুখ তুললাম।হাওয়ায় ভাসালাম শরীর।হেডে ছোট্ট একটা ফ্লিক। গোল। গো ও ল। সেভেন স্টারের গোল শোধ।

ঝুমা হাততালি দিয়ে উঠেছিল। বি ডি ও সাহেবও জোরেই বললেন,বুবুন সাবাস।
ওরা মাথা গরম করে ফাউল করছে।শম্ভুদা ওদের একজনকে বের করে দিলেন।
আমরা এখন সুবিধেজনক জায়গায় রয়েছি।
পলাশকে বক্সেই ট্রিপ করলেন সুশীল কর্মকার।
বিখ্যাত ফুটবলার। পেনাল্টি।
কান্তুদা ইশারায় বলল, আমায় মারতে।
আর মাথা নীচুকরে নয়।একবার দেখে নিয়েছি। আমার সামনে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ভারত বিখ্যাত গোলকিপার। ৬ ফুট হাইট। গ্রাস কাটিং শট করলাম। গোল। গো ও ল।
ফাইনালে খেলতে তেমন পারলাম না হারলাম তিন একে। রানার্স ট্রফি বি ডি ও সাহেব দিলেন।ঝুমা বলল,দারুণ। বি ডি ও সাহেবও বললেন,তোমার পায়ে খেলা আছে।চ্যাম্পিয়নের ট্রফি সভাপতি দিলেন।
কতো বছর হয়ে গেল সেসব দিন হারিয়ে গেছে।আমার এখন মাসেল পেইন হয়।বয়স ছাপ্পান্ন।বি ডি ও হিসেবে বহু রানার্সআপ ট্রফি দিয়েছি আর বলেছি,ব্রেভো। ওয়েল প্লেইড।ঝুমার বিয়েতে জল দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। কান্তুদা মাছ

দিয়েছিল।এরপর থেকে হালুইকর বিদায় নিল।এলো ক্যাটারিং । সেদিনের চ্যাম্পিয়ন টিমের ক্যাপ্টেন শ্যামল এখন ক্যাটারিং খুলেছে।

মা বাবা গত হওয়ার পর আমিও আর বাড়ি যাই না।

অনেকদিন পর শ্যামলের ফোন এলো,কান্তুদা আর নেই।

আসবি! শ্মশানে যাবি!

উপেক্ষা করা যায় কখনও।

গিয়ে দেখি আমাদের কোচের শেষ যাত্রায় সকলেই আছি।আমি শুভায়ুর প্রদীপ পলাশ আর অপনেন্টের শ্যামল।

শব কাঁধে নিয়ে চলেছি।হঠাৎ কে যেন বলল,বুবুন, ফাইনাল ম্যাচ খেলতে হবে তো!মুখ তোল।

তাকা ভালো করে।

চতুর্দোলা কাঁধে নিয়ে ওপরে তাকালাম।আকাশে নক্ষত্রের মেলা। আর সেই নভোমণ্ডল জুড়ে জ্বলজ্বল করছে আমাদের কোচ।আমরা সেই কিশোরের দল ফাইনাল ম্যাচে নামছি।আমাদের সময় অপরাজেয়। তার মৃত্যু নেই।আমার অভিযাত্রা সবুজ মাঠ আর সেই কিশোরবেলা। প্রতিটি ম্যাচ একেকটা

অভিযান। আমার চির ভাস্বর তেনজিং নোরগে – কান্তদা।

মৃত্যু নেই আমার কোচের। আর তার সেই ডাক,মাথা উঁচু কর বুবুন।ভালো করে তাকা। সবুজ মাঠের গন্ধের আবেশ আমায় জীবনভর তাড়া করে চলেছেই।

Identity

Wribhu Chattopadhyay

Nemai Das and I work in a same office and in the same department. Even we two share a single table. But I am senior to him in terms of my joining date and age. Every day we two have to travel a long distance, and we ride on a single bike from railway station to the office. From the station we plank in different trains. Nemai is very gentle, educated and sober, but he has only one problem, he only replies but doesn't raise any question. Whereas me and other colleagues remain busy in politics, economics and other burning topics there Nemai stays calm and quite. From our officials to union members everyone knows about his queer behavior. I was also very much vexed with this behavior. A man of a same table, can be seen in every moment, does not talk with his own colleagues. At first I took the initiative to melt the ice and asked, 'Brother, look we all gossip, chat, and make a fun to reduce

our work pressure, we have also built a healthy relationship, but only you remain nonchalant. Why, is there any reason behind it?'

Nemai heard my words and stared at me and then replied, 'Yes dada a healthy relationship, again a poor relationship also.'

- You understand everything, then why don't you talk with us.

- God knows.

He after that remained silent for some time and then replied, 'you have your own colleagues to talk and to gossip and more, don't pull me there, please leave me to live my own life.'

I preferred not to squeeze the matter more. I daren't to ask him anything. I mumbled, 'It is better for you to live by your own way.'

Nemai remains in his own cocoon. We all have decided not to disturb him more. Even when we two ride on the same bike I have not asked him anything. Here I have to take an additional burden of interpretation. I communicate with him and he always silently nods his head for

consentient. Nemai does not join in any social ceremonies like marriage, obituary first rice or other gatherings. Some of our colleagues one day have taken a decision not to invite him again. A number of times his name also has been socked out form the envelop. Later it has been considered as improper and so the policies have been postponed. His contribution is also a matter. But I have understood, it is noting for Nemai if he is invited or not. But one thing we all have to admit Nemai is very perfect in mentioning the subscription related matter. He is always first in this queue. And in all the time he unhesitatingly contributes in my hand and switches a formality with a gentle smirk. We have spent a couple of years with him like this. In this period the situation has been improved a little. He is now talking two percent extra with me. One day after our office he says, 'Dada, today I have to go in your direction.'

I am totally surprised to hear so many words from his side. We have been like this for many years. On the first day of

every month he gives me some amount as fuel charge of my bike and says, ‘ Dada, here is my contribution for the fuel.’ and after getting down from the bike he says, ‘ Okay, buy.’

Apart from these two he does not speak anything more. Naturally when I hear him to say those words I have not missed the opportunity to ask, ‘then brother, are you for any negotiation?’

His face turns to steel and he replies, ‘No for other reason.’

I have my monthly train ticket so he has to cut a ticket. This is the source station naturally it remains less crowded and I can take a seat as my own wish. We two have taken two window seats; Nemai offers me a cup of tea. It may take a time of roughly an hour. Nemai asks me about my own home and family. After getting his satisfactory answer he takes a self invitation, ‘Dada, one day I must be at your house.’

I understand Nemai is in very good mode and so I get a momentum to get his revelation. I directly throw a question to

him, ‘Brother, why are living in this secluded life.’
-Secluded! He smirks.
I continue, ‘You don’t chat with us, not even to me.’
He heaves a sigh and pauses for a moment. Train starts to wheel. I take a glance at him and find he is staring out side through the window. After some time Nemai turns at me and says, ‘Dada what to say on your queries, it is better for you to hear a story. Usually it is almost a nightmare to go with me.’
His last words put me in tremble. He starts his story. There is a village and at the edge part of it, there was a Ruidas para. You know dada Ruidas,that is Muchi, shoemaker, schedule cast in our social hierarchy. Subal Das lived there. He worked as a daily labour or ran errands. He had a daughter Rina and a son Bablu. His wife unfortunately died in snake bite. Rina had to leave her school and took the responsibility of her home and also her brother. There was actually an age difference between them. Everything was running smoothly but

Rina reached at her fifteen. The people of his clan started to put pressure on Subal regarding her marriage. From morning to night Subal was getting bored to hear the same story repeatedly. Actually he did not like to mend the marriage, and so he always bypasses the matter by replying, 'Yes I am trying, but it is very difficult to arrange a good groom. Everyone is hankering after for dowry.'

Rina was also working like a perfect home maker. She arranged for lunch when her father returned from work, she worked like her own mother. She raged broil with her own father when he came drunk and she dragged him like an instrument .Only Subal could perceive what the definition of peace and relaxation was. He was also worried to feel the void in absence of Rina.

Some months after Subal had to arrange the marriage of her daughter with Kalu Das, a rickshaw puller by profession, lived in nearby village. Kalu was aged, but that was very common in their area, and no one said anything. Subal offered a little feast that was possible for him. Rina

left after making them two alone. Naturally Subal himself had to arrange the household work. But it was not lasted for a long time. Rina left her husband's home and settled permanently in her father's hut just within a month. No one could actually frame out the reason behind that decision.

Rina's second innings was more potential and firm. She worked like the mistress of the home. None could beat her vigorous attitude. Gradually she offered a 'send off' to her vermillion mark that seemed a dustbin for her. Subal and Rina started to live synonymously. The village people had perceived a metamorphosis in Subal's own attitude. He also reduced her daily drinking habit.'

I have been deeply absorbed in the deluge of Nemai Das's story. Generally on the other day I buy either ground nut or something more, but on that day I have quenched my heart by a cup of tea only and that has been offered by our Nemai. Probably Nemai also has understood the matter and so he never compromised with the speed of the story. In the mean

time I have only taken out my water bottle and drunk. Again I have entered in the world of Subal and Rina, as Nemai has started his story. 'Apart from her own house hold work Rina also started to work as a maid servant.

A rumour spread across like the flowing fire that Rina had also generated an intimacy with a Babu (a Man) where she was working. No one made any direct comment but whispered all around. Everything was going like this, and it had already crossed four months. One day some women perceived a change in Rina's physical gesture. It was not doubt very alarming. One day one of them asked directly, 'We have noticed something queer matter, don't hide anything.'

-Why? What to hide from you all. I have nothing to hide,everything is very clean and transparent. Rina replied but in a fumbling tone.

-You are pregnant. It can be easily noticed from your physical structure.

Initially Rina denied that the fact but under pressure She had to admit

everything. Then other women started to interrogate her, 'Just tell us, who is the father, otherwise we will drag you to our Prodhan, mind it.'

They all have started to share the rumour, what they have heard, and what is fact and fiction. But Rina had not answered their questions and she simply went to the room and shut the door. The area became crowded very soon and everyone came before Subal's house to quiz the matter.

Subal was not at home then. He returned from his work and asked, 'What had happened?'

He heard everything, but made no reply. The crowd fired at him, 'your daughter has ashamed us, her Jamai had kicked her off and now she has come over here and don't know how is she pregnant. We all know she has an intimacy with a babu. Now tell us is she made pregnant by him or someone else?'

After that we cannot negotiate any marriage of our daughters, be very careful.'

Subal couldn't understand what is to be answered. He preferred to remain silent. After some time when everyone started a terrific howl and cried then Subal apologised sand replied, 'I beg your pardon for my daughter, and assure you that we will leave this village by tomorrow morning. Please be calm, and let us stay for this night only.'
The villagers hear everything and say, 'but we have to know who has made her pregnant?'
–Then you can do that you prefer, I can't say more. Subal replied.
Next day at the very dawn Subal and Rina left the village and settled in a town. They rented a slum there. Subal started a new job as a helper in construction work.
Time moves on its own wheel. Subal also contacted with a quack consultant for Rina's abortion. But Rina did not agree with it.After some months she begot a son in the government hospital. A new life begins for Rina and Subal.
I ask Nemai to pause and ask, 'and what about the news of Subal's son?'

–When the crowd had gathered around Subal's house, his son was playing then. But he had not returned from there. Subal and Rina searched for him but could not get any sign. They left the village and next day the dead body of Subal's son was found floating on the river.
I have heard the story from Nemai but it has not quenched my thirst. It is for me a same damp sack story. It is almost like our television serials. But I have not said anything to him. Nemai is very shy. No one can say if I make any negative reply he may stop talking permanently with me. It may be more problematic. My station has come and I need to get down from the train, but when I stare at him I find his eyes are soaked in tear. I become surprised and keep my hand on his shoulder and then I ask, 'what has happened brother? Are you having any problem?'
-Nemai mops his eyes and replies, 'Dada my mind is heavy with stony pressure, let me cry. At least it may reduce my pain.'
Weeping is also very heavy. It is like thunder and cannot melt the ice.

I again ask him, 'Where are you going?'
– My mother lives in an asylum and I am going to consult with the doctor.
– What about your father.
Nemai heaves a sigh and replies, 'better to leave the matter.'
I think not to fire any more question, but guess the story has a link with Nemai. I get down from the train. From the next day office is still going on. We are doing the same thing. But I have not shared his story to anyone. After some months one day I am updating the database of our office employees. At the time of updating Nemai Das I am totally shocked to find Nemai and his data base. It says, 'Nemai Das, mother Rina Das, Father Subal Das. Nominee Rina Das, share hundred percent.
I am totally confused and cannot do anything. A cold line of perspiration runs inside my spine and catechism collapses my brain. But I have not asked anything to Nemai but understand, 'silence is the main source of peace.'

শুভ্র শঙ্খ রবে

সুজিত চট্টোপাধ্যায়

নির্মল স্বচ্ছ বিশাল সরোবর।
চারপাশ ঘন সবুজের মনোলোভা বনানীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রলেখা ।
কাছে দূরে নীলাভ পাহাড়ের দৃষ্টিনন্দন মধুর উপস্থিতি।
কাঠবিড়ালির ব্যস্ততা আর হরেকরকম নাম না জানা পাখিদের কলতান, জায়গাটি কে ক`রে তুলেছিল স্বর্গের স্বপ্নদ্যান।
এমন নির্জনতায় বিহ্বল হয়ে তন্বী নিজেকে ক`রে দিলো প্রকৃতির কাছে নিঃশর্ত সমর্পণ ।আবরণ আভরণের খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ,
কী এক অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতি পেতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, মৃদুমন্দ বাতাসে তিরতির ক`রে প্রথম প্রেমের স্পর্শ পাওয়া কিশোরী হৃদয়ের মতো কেঁপে কেঁপে ওঠা কাঁচস্বচ্ছ শীতল সরোবরের বুকে ।
তন্বীর অনুভবে আশ্চর্য সুন্দর ভাললাগার অবর্ণনীয় আবেশ।

পরিপূর্ণ যুবতীর অদম্য প্রেম, প্রস্ফুটিত ফুলের মতো পাগল করা ঝর্ণা নির্মল হাসি মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল ময়ূর পেখম রঙের পাহাড় গুলোর গায়ে গায়ে।
কাঁচরঙা সরোবরে মখমলি ঢেউ, রমনীয় তন্বী রমনীর মাখন রঙানো শরীরের আনাচে-কানাচে বুলিয়ে দিচ্ছিল তার অনাবিল প্রেমধারা। জন্ম দিচ্ছিলো প্রতিক্ষণে শতসহস্র ঝিনুক ভাঙা মুক্তোমালা।

ঠিক তখনই আচমকা আকাশ ঘনিয়ে এলো দৈত্য কালো মেঘ বিদ্যুৎ এর প্রবল ঝলকানির দাপট ।
চারপাশের চিরবসন্তের মায়াজাল ছিন্নভিন্ন ক`রে ভেসে এলো কোনও অনাহূত আগন্তুকের ঘোড়া ক্ষুরের দাম্ভিক শব্দ।
বেপরোয়া অহংকারী হ্রেষাধ্বনি স্বর্গলোকের সমস্ত মায়াবী সৌন্দর্যের প্রতি চরম তাচ্ছিল্য প্রকাশের মধ্যে দিয়ে নিজের আত্মপ্রকাশের গৌরবময় আগমন বার্তায় আকাশবাতাস মুখরিত করে দিচ্ছিল।

তন্বী সুন্দরীর মন থেকে নিমেষে উধাও হয়ে গেল সমস্ত মায়া আবরণ ।
সেখানে স্থান নিলো এক অজানা উদ্ভ্রান্ত আতঙ্ক ।

কিন্তু তা মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে ।
কী এক আশ্চর্য মায়ার খেলায় , সমগ্র সরোবর নিমেষে ভরে গেল , অজস্র না না রঙের রঙিন ফুলে ফুলে।
সরোবর হয়ে উঠলো ফুলের স্বর্গদ্যান।
খেয়ালী তন্বী হারিয়ে গেল সেই ফুলরাশির অনন্ত রুপের মাঝে। লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে নিশ্চিন্তে ।

ঘোড়সওয়ার যুবক, কুচকুচে কালো তেজিয়ান ঘোড়ার লাগাম বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরে গতিরোধ করলো তার। তারপর, ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে, দৃঢ় পদক্ষেপে নেমে গেল সেই হিমশীতল সরোবরে নির্দ্বিধায় ।
হাত বাড়িয়ে পরম আদরে এবং বিশ্বাসে তুলে নিল একটি শিউলি ফুল।
পুনরায় বীরবিক্রমে এগিয়ে গেল অপেক্ষমাণ অশ্বের দিকে।

তন্বী চোখ মেলে তাকালে।
সামনে নীলাকাশ, সেখানে ভেসে চলছে শ্বেতশুভ্র থোকা থোকা শিমুল মেঘের সাথে সে নিজেও।
আশ্চর্যের সঙ্গে আনন্দ মিলেমিশে সে এক অনন্য অনুভূতি।

ধরণীর সমস্ত রাজহংস তাদের উড়ন্ত পাখায় যেন সমবেত সঙ্গীত গুঞ্জরিছে , মাথায় একগুচ্ছ কাশ ফুলের মুকুট পরা একটি সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়া কে ঘিরে। যে পক্ষীরাজে সওয়ার এক তেজস্বী সুদর্শন রাজকুমার আর অপরুপা তন্বী ।

অত্যন্ত আশ্চর্য আর হতবাক হবারই কথা। এবং তেমনই হতে যাচ্ছিলো তন্বী, কিন্তু হতে পারলোনা । কেননা ঠিক তখনই রাজপুত্র দৈববাণীর মতো কথা কয়ে উঠলো ।

তার আঙুলে ধরে রাখা শিউলি ফুলটি তন্বীর চুলে পরিয়ে দিয়ে বললে,,

“আগমনীর আগমন বার্তা জগতে বয়ে আনুক শরৎ আলোর স্নিগ্ধ রেণু "

এতক্ষণে তন্বী ফিরে তাকালে নিজের দিকে।

মাথায় গলায় হাতে সর্বাঙ্গে শিউলি ফুলের আবরণ , শিউলি ফুলের আভরণ ।

তার অপরুপ সৌন্দর্যে গন্ধে আমোদিত রাশি রাশি প্রজাপতির দল সঙ্গী হয়েছে তার।

তাদের বিমুগ্ধ করা নৃত্যছন্দে , স্বর্গের বিমোহিত আনন্দ উচ্ছ্বাস নেমে এসেছে ধরণীতলে।

আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে,, একটি সুর।
মাতৃরুপেণঃসংস্থিতা,,,,,
"জাগো জাগো, জাগো মা ",,,

আশ্রয়

মানস দেব

প্রতিমার বয়স তখন মাত্র ১২। গরিব পিতা -মাতা এককথায় জোর করে তার বিয়ে দিয়ে দেন। বয়স ১৯ - এর মধ্যে দুই কন্যা সন্তানের মা হয় প্রতিমা। এখানেই শুরু হলো প্রতিমার জীবনের নতুন অধ্যায়। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে স্বামী প্রতিদিন অত্যাচার শুরু করে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য । অতি দরিদ্র ঘরের মেয়ে প্রতিমা কিছুতেই স্বামীর আবদার পূরণ করতে সক্ষম হয়নি ।

একদিন তার স্বামী জোর করে তাকে দুই কন্যা সন্তান সহ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন । কি করবে সে ভেবেই পেল না! রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি আশ্রয় নেয় বাড়ির গোয়াল ঘরে। পরদিন সকালে তাদের দেখতে পেয়ে স্বামী আবার তাড়িয়ে দিলেন। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় এক গাছের নিচে।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দে ওয়া খাবার কুড়িয়ে এনে সন্তানদের খাওয়াতো এবং নিজেও খেত । কিন্তু এভাবে যে জীবন বেশিদিন চলতে পারেনা । তাই একদিন দুই সন্তানকে আচলের সাথে বেঁধে শুয়ে পড়ে রেললাইনে । কিন্তু সেদিন ছিল ধর্মঘট। রেল না আসায় আর মরা হলো না তাদের । বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় রেল লাইনে র ধারে। কয়েকদিন পর আবার মৃত্যুর চেষ্টা করে। যখন রেললাইনে শুয়ে রয়েছে , তখন দূরে দেখতে পেল গাছের একটা ভাঙা ডালে অন্য একটি গাছ আশ্রয় করে আছে এবং তাতে সুন্দর ফুল ফুটেছে। এই দৃশ্য দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে সে উঠে আসে।

এরপর ট্রেনে ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষা করে সন্তানদের খাবার যোগাতে লাগলো । একদিন এক বয়স্ক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে পড়ে যেতে নিলে প্রতিমা তাকে বাঁচায় । ভদ্রলোকটি খুশি হয়ে বলেন - " তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো মা , তুমি আমার কাছে কি চাও ? " প্রতিমা হাতজোড় করে বলে - " বাবু আমার থাকার কোন জায়গা নেই , আপনি যদি আমাদের থাকার একটু জায়গা দেন তাহলে বেঁচে থাকতে পারি

। " ভদ্রলোক তাকে একটি ছোট্ট কুটির বানিয়ে দেন । সন্তানদের নিয়ে সেখানেই আনন্দে থাকতে লাগল প্রতিমা।

ক্রমে মেয়ে দুটি বড় হয়ে উঠলো । মেয়েরা স্টেশনে স্টেশনে হকারি করে সংসার চালাতে লাগলো। প্রতিমার বয়স হলেও মেয়েদের সঙ্গে স্টেশনের যেত হকারি তে সাহায্য করতে। হঠাৎ একদিন দেখল, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি সামান্য খাবারের জন্য সকলের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করছে। প্রতিমা ব্যাগ থেকে টাকা দিতে গিয়ে অবাক হল। কেননা ঐ ব্যক্তি যে তার স্বামী। প্রতিমা দুচোখ জলে ভরে ওঠে ।

স্বামীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে নিজের ছোট্ট কুটিরে । সেবা -যত্ন করে নতুন জীবন দানের চেষ্টা করে স্বামীকে ।

বিভাজন

দীপঙ্কর বেরা

- তোমার মনে এত ঈর্ষা কেন বল তো?
- ঈর্ষা ? ঈর্ষা কাকে বলে জানো? এই দেখো।
বলে হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই বিদ্যুৎ উঠে সানন্দার চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস করে গালে তিন চারটে থাপ্পড় মেরে বসল।
সানন্দা প্রস্তুত ছিল না। তাছাড়া বিদ্যুৎ যে তার গায়ে হাত তুলতে পারে এ তো কল্পনাও করতে পারেনি। একপ্রকার থ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর রাগ ভয় অভিমান সাথে করে উঠে গেল পাশের ঘরে।
যেখানে পাঁচ'শ মত লোকজন তার কথা মত কাজ করে। কি সুন্দর ভালোবাসা দিয়ে কথা বলে। ঢুকতে না ঢুকতে গুডমর্নিং ইয়েস ম্যাডামের বন্যা বয়ে যায় , অর্ডারে অপেক্ষা করে, উপরওয়ালার কাছ থেকেও কত প্রশংসা পেয়ে আসছে সেখানে বিদ্যুতের এত সাহস হল কি করে?
সাহসের শুরুটা অবশ্য প্রথমতঃ স্বা মী। অনেক চেষ্টা করেছে সানন্দা যাতে স্বামী ব্যাপারটা সরিয়ে

ভালোবাসার সহচরের মত থাকতে। বিয়ের আগে দেখা হওয়া সেই সব প্রেম কথা বিয়ের পরেও ছিল।

বিদ্যুৎ বলেছে - তোমাকে আমি ভালোবাসি স্ত্রীর মত। বিয়ে করব বলেই তো ভালোবেসেছি। এখনও ভালোবাসি।

- তা বলে সংসারের সব কাজ আমার?

- তা তো অবশ্যই। ছেলেমেয়ে মানুষ করা রান্না করা বাসন মাজা কাপড় কাচা এবং সবার সাথে স্বামীর সেবা করা।

সানন্দা তাও হাসি রেখে বলার চেষ্টা করে - এসব মেয়েদের কাজ কোথায় লেখা আছে?

রেগে যায় বিদ্যুৎ। বলে - অতসব জানি না। এটাই পরম্পরা।

- মেয়েরা আজকাল কাজে বে রোচ্ছে। তার সুফল তো সংসার পাচ্ছে।

- এই জন্য তোমাদের দেমাক বেড়ে গেছে। তাই না ? এই সুফল যুগ যুগ পুরুষরা দিয়ে এসেছে কই তারা তো তাদের সংসার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে নি।

কথা আর বাড়ায় না। জানে রেগে টং হয়ে আছে। মনে মধ্যে গ্রাম থেকে উঠে আসা মনোভাব পুষে রেখেছে। অফিস থেকে ফিরে এসে কুটিটি নাড়বে না। এই দাও

ওই দাও অর্ডার করে যাবে। রাই জন্মানোর পরে সে কি যন্ত্রণা! কেন প্রথমে ছেলে হল না। তাও রক্তিম জন্মানোর পরে সে যাত্রায় রেহাই পেয়েছে। এবং যত ভালোবাসা রক্তিমের জন্য বুঝতে পেরে চুপ করে যায় সানন্দা।

কিন্তু রাই আর রক্তিমের দেখাশুনা এবং সংসারের সব কাজ সামলে যখন সানন্দার প্রমোশনের চিঠি এল তখন আগুনে ঘি পড়ল।

অথচ চাকরি করা মেয়ে দেখেই দু বছর প্রেম করে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। টুকটাক এ রকম ঠোকাঠুকি চলছিল। কিন্তু মাইনে ও সম্মান দুটো বেশি হতেই পুরুষকার জেগে উঠল।

বিদ্যুৎের প্রিয় বন্ধু সুনীল প্রায়ই বাড়িতে আসে। সে ফিসফিস করে একদিন বলছে - তোর তো আর এগোনোর পথ নেই। তোর চেয়ে অনেক উঁচু পোস্ট। এ রকম পায়ের তলায় কতদিন থাকবি?

- তাই তো রে। বড্ড দেমাক। জীবনটা বৃথাই হয়ে গেল।

বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের এই ফলাফল। রাই আর রক্তিম কি শিখবে ? বার বার ঠেস লাগানো

মানসিক যন্ত্রণা তো ছিলই। তাই আপ্রাণ চেষ্টায় মনের ঈর্ষা দূর করতে গিয়েই উঠল গায়ে হাত।
বিদ্যুৎ মা অন্ত প্রাণ। ওদিকে দাদা প্রায় সব সম্পত্তি ভোগ করছে। তাই দাদার কাছে মা বাবা থাকে। অবশ্য মা বাবা ফ্ল্যাটে এসে থাকতে চায় না। কথা বলার লোক থাকে না। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো যায় না। গাছের তলায় গিয়ে বসা নেই সবুজ মাঠ নেই। লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি নেই মীমাংসা নেই পুকুর নেই। কত কি নেই।
নেই কিন্তু আছে প্রমাণ করে থাকতে হবে বাঁচতে হবে এবং বিদ্যুৎের মত পুরুষদের মনোভাব বদল করতে হবে। তাই বিদ্যুৎ চাইত না , এমনকি আরও অনেক ঝামেলার মাঝে ফ্ল্যাটে শ্বশুর ও শাশুড়িকে নিয়ে এল সানন্দা।
সেদিন অফিস বসে রাইয়ের কাছে শুনল মা অফিস না গিয়ে কোথায় যেন গেছে। রাগে ফুসতে লাগল বিদ্যুৎ। এত বাড় বেড়েছে। এত দেমাক। ধরাকে সরা জ্ঞান করা। আরে যতই উপরে ওঠো তুমি মেয়ে ভুলে যেও না। এসব ভাবতে ভা বতে ভুল ভাল কাজ করে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে বিদ্যুৎ দেখে ঘরের

মধ্যে স্নিগ্ধ আবহাওয়া। রক্তিমের কাছে সব জেনে ছাদের দিকে পা বাড়াল বিদ্যুৎ।

পূজোর আসছে। আকাশে পেঁজা তুলোর মেঘ। হালকা বাতাস বইছে। বাবা মাকে নিয়ে ছাদে বসে গল্পে ব্যস্ত সানন্দা। একটু বেশি জোরে হাসছে। চেষ্টায় আছে যাতে এই হাসি বিদ্যুতের বুকের ঈর্ষা যেন সিগারেটের ধোঁয়ার মত জমাট না বেঁধে উড়ে যায়।

ছেঁড়ে দেঁ মাঁ কেঁদে বাঁচি

প্রদীপ দে

এঁই তোঁ আঁমি এঁইছি ......
মগডালে বসে লম্বা পা ঝোলায় কুঙ্কি কাকিমা। আগে কাকিমা ছিল, কাকা কাকিমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সুইসাইড করে। কাকা ভুত হয়ে যাওয়ার পর পিশাচ হওয়া স্বামী তার স্ত্রীর গলা মুটকে দেয়। এরপর থেকে ও ভুতি আর পিশাচী!

পা দুটি এতই লম্বা যে মগডাল থেকে পা যায় ঝুলে, যা একেবারে মাটিতে গিয়ে ঝাঁট দেয়। রোজ সন্ধ্যায় আসে আর সারারাত ভুতের কেত্তন করেন । অমাবস্যা হলে তো কথাটি নেই একেবারে ছুঁচোর কেত্তন আরম্ভ করে দেয়। প্রথমে খানিক পা দোলাবে আমেজ করবে তারপর নেকী সুরে গান ধরবে। চাইবে গ্রামের সব্বাই যেন তার গান শুনে চলে আসে। কেউ এলে তাকে পায়ে জড়িয়ে তুলে নিয়ে হয় আদর , নয় চুমা খাবে। সে কি চুমার আওয়াজ, কপাৎ কপাৎ করে !

আর আদর! সে আর বলে বোঝানো যাবে না।বড়ই লজ্জার ব্যাপারস্যাপার আর কি।

তবে বলি শুনুন ,
আসলে ছোটদের ধরে চুমু খেয়ে চটকে মটকে তার ছোট্ট 'ইয়ে' টায় খুব আদর করে ছেড়ে দেবে কোন ক্ষতি না করেই।
আর বড় পুরুষ কাউকে পেলেই নিজের বুক দিয়ে তাকে ঘষে ঘষে তাকে খুবই আদর করবে আর ছাড়তে চাইবে না -এই রকমই ভাবখানা যেন - যে তুমি আমার কাছে এলে তোমারই লাভ ! বিনে পয়সায় ফুর্তি পাইয়ে দেওয়া - যাকে বলে এই আরকি!

কিন্তু মহিলাদের উনি একদম পছন্দ করেন না।ওরা নাকি হিংসুটে হয়। মহিলাদের উনি এক্কেবারেই পছন্দ করেন না।

কিন্তু গ্রামের যে সব পুরুষ তার কবলে পড়েছেন তারা আর কেউ দ্বিতীয়বার ওই মাঠে পা বাড়ান না। তাদের সে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা। পিশাচিনির বুকে নাকি

গুয়ের গন্ধ। শরীর তো নয় একেবারেই কংকালের হাড় ক'খানা!
তবে ভয়েই হোক অথবা ভালোবেসেই হোক একবার একটু ওনাকে খুশি করে দিলেই কেল্লা ফতে। উনি তাকে আবার আসবার নিমন্ত্রণ
জানিয়ে ছেড়ে দেবে।

আর যেদি কেউ না আসে তবে সেদিন উনি পুকুর থেকে পা দিয়ে জ্যান্ত মাছ তুলে খচমচ করে চিবিয়ে খাবেন আর গান গাবেন।

পাড়া গ্রামের ডাকাবুকো বাটুল হ্যাবলা ঠিক করলো এই কাকিমাকে জব্দ করতেই হবে। বাটুলের বয়স বিয়াল্লিশ কিন্তু দেখলে একেবারে বারো । হঠাৎ দেখলে একেবারেই বালক বলে ভুল হয়। এক অমাবস্যার রাতে বেশ কিছু আঁসটে মাছ খেয়ে আর পকেটে করে কেরোসিন -মাখানো ভাজা মাছের সাথে একটা গ্যাস লাইটার নিয়ে রওনা দিল মাঠের পথে। গাছের নীচে যেতেই মগডাল থেকে নেমে আসা পায়ে জড়িয়ে গেল সে। তরতর করে উপড়ে উঠে গেল সোজা কা কিমার কোলে।

কাকিমা ছোট ছেলে ভেবে বেশ কিছু চুমু খেয়ে নিল। মুখে মাছের গন্ধে পিশাচী ভাববিভোর হয়ে গেল। হ্যাবলার ' ইয়ে' তে হাত দিতেই হ্যাবলা সেই সুযোগে কাকিমার মুখে কেরোসিন মাখানো মাছ গুঁজে দিয়েই লাইটার জ্বালিয়ে দিল। দাউ দাউ করে পিশাচীর মুখ জ্বলতে শুরু করে মাথার চুলে ধরে নিল। আর সেই সুযোগে হ্যাবলা কাকির হাতে হিসু করে দিল।
ছেঁড়ে দেঁ মাঁ কেঁদে বাঁচি -- বলে চিৎকার করে উঠে পুড়তে থাকা পিশাচী রোদন করতে করতে হ্যাবলাকে ছেড়ে দিল।

হ্যাবলা পিশাচীর পা ধরে ঝুলে পড়ে মাটি ছুঁয়েই একেবারে পোঁ - পোঁ দৌড়!

বিয়ের সানাই

জয়ন্ত কুমার মল্লিক

আজ এই আনন্দের দিনেও সেদিনকার কথা ভুলতে পারেনা মিনু দেবী। আজ তার ছেলের বিয়ে কিন্তু শত চেষ্টা করেও নিজের মেয়েকে আজও খুঁজে পায়নি মিনু দেবী। আজও কমলা নিখোঁজ কিংবা মৃত। মিনু দেবীর স্বামী ভুবনেশ্বর প্রসাদ দু 'বছর হলো গত হয়েছেন। হয়তো বা কন্যার শোকে তিনি অসময়ে চলে গেলেন - এরকমটাই ভাবেন মিনু দেবী। আজ ওদের পুত্র মাহিন্দ্রার বিয়ে। বাড়িতে কত আয়োজন ধুম ধাম। প্যান্ডেল লাইট মাইক ফুল খাওয়া -দাওয়া এসব নিয়ে মেতে উঠেছে এই পরিবারটি। ছেলে মাহিন্দ্রা একটি বেসরকারি ব্যাংকে কাজ করে। সে বি .কম পাস মোটামুটি সুদর্শন বলা যায়।

বিহারের হাজারীবাগের বাসিন্দা ছিলেন ভুবনেশ্বর প্রসাদ ও মিনু দেবী। পাটনার মেয়ে মিনুদেবীর সঙ্গে ভুবনেশ্বরের বিবাহ হয় বছর ২২ আগে। মিনু দেবীর ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে ওরা অর্থাৎ স্বামী ভুবনেশ্বর প্রসাদ মিনু দেবী ও তাদের সাড়ে তিন বছ রের মেয়ে কমলা

সুদূর বিহার রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলায় আসেন। ঐ সময়েই ঘটে এক সাংঘাতিক বিপত্তি। মকর সংক্রান্তির পুন্য লগ্নে স্নান সেরে উঠে মিনু দেবী ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন ছোট্ট কমলাকে। এরপরে ভুবনেশ্বর প্রসাদ পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওকে খুঁজে পান না। কাগজেও ছবিসহ নিরুদ্দেশ সংবাদ দিয়েও কোন ফল হয় না। দুঃখে কাতর এই দম্পতি গঙ্গাসাগরে নিজেদের প্রথম সন্তানকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে ওরা বিহারের হাজারীবাগের ওই বাড়ি বিক্রি করে কলকাতার কাছাকাছি ডায়মন্ড হারবারে র একটি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং প্রতিবছর নিয়ম করে গঙ্গাসাগর যেতে থাকেন কেবলমাত্র নিজেদের মেয়ে ছোট্ট কমলার কথা ভেবে।

গত দু 'বছর আগে ভুবনেশ্বর প্রসাদ কর্মরত অবস্থাতেই হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। শোকে পাথর হয়ে যাওয়া মিনু দেবী আজ বহুদিন বাদে একটু শান্তি স্ব স্তি আনন্দ পাচ্ছেন এই ভেবে যে ছেলের বিয়ে , তার ঘরে নতুন বউ আসবে।

হিন্দুস্থানী পরিবারটির নিয়ম যাই থাক স্বামী না থাকায় বিয়ের দিনেই বৌমাকে আশীর্বাদ করতে মিনু দেবী

বরযাত্রী হিসেবে পাত্রীর বাড়ি যান। বিয়ের আগে তিনি হবু বউমাকে একটিবারও দেখেননি। মাহিন্দ্রা ওর এক দূর সম্পর্কীয় কাকা এবং ওর দুজন বন্ধু মাস দুয়েক আগে পাত্রী দেখতে গিয়েছিল। পাত্রীপক্ষের আদি বাড়ি অর্থাৎ দেশের বাড়ি ভগবান বুদ্ধের বোধ গয়া , যেখানে হিন্দু ধর্মের মানুষেরা মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে জল দিতে পিন্ডদান করতে যান।

পাত্রীপক্ষের বাড়ি গয়া হলেও ওরা এখন ডায়মন্ড হারবার থেকে কলকাতার বড় বাজারে যাবেন। ওইখানেই একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে এই বিয়ের জন্য।

বাসে পথ চলতে চলতে মিনু দেবী নিজ স্বামী ও কন্যাকে স্মরণ করতে থাকেন। ওরা আজ বেঁচে থাকলে সঙ্গে থাকলে কি আনন্দ যে হত কিন্তু মানুষ তো সব সুখ পায় না। রুমাল দিয়ে ভেজা চোখ মোছেন মিনু দেবী।

বিয়ে বাড়িতে পৌঁছে আলোর রোশনাইএ প্যান্ডেলের চাকচিক্যে ফুলের বাহারে চোখ ধাঁধিয়ে যায় মিনু দেবীর। পুত্র মাহিন্দ্রা খুব খুশি। ওর বন্ধুরা ও আত্মীয় - স্বজন এহেন পরিবেশ দেখে যারপরনাই পরিতৃপ্ত।এরপর আশীর্বাদের পালা শুরু হয়। ছেলে

আশীর্বাদের পর মেয়ে আশীর্বাদ করতে এগিয়ে যান মিনু দেবী। সোনারহার দিয়ে তিনি পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করবেন। এই হারটি তিনি শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে তার বিয়েতে পেয়েছিলেন। ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়ে পাত্রীর চোখে চোখ পড়তেই ঘাবড়ে যান মিনু দেবী। ওর থুতনিতে কাটা দাগ ঠিক যেন ক্রস চিহ্নের মত। এ কে ? থমকে যান ভিরমি খান মিনু দেবী। তার নিজের মেয়ে কমলার ছোটবেলায় একটা দুর্ঘটনার পর এই অবস্থা হয়েছিল। তিনি থতমত খেয়ে যান। হতচকিত বিহ্বল কিংকর্তব্যবিমূঢ় মিনু দেবী এবার মাটিতে পড়ে যান।

তখন পাত্রীপ ক্ষের লোকজন তার চোখেমুখে জল ছিটিয়ে দেন। একজন ডাক্তার ডাকা হয়। প্রেসার পালস ও ঠিকই পাওয়া যায়। ছেলে মাহিন্দ্রা মার কাছে এসে বলে- মা আভি ক্যায়সে হো ? মা কেমন আছো এখন? মাহিন্দ্রার মা মিনু দেবী এবার পাত্রী সুনীতার মা বাবাকে ডেকে পাত্রী সম্পর্কে জানতে চান। বিয়ে বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যায়। দু 'পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় , বচসা বেধে যায়। অনেক আমন্ত্রিত ব্যক্তি ওই বিবাহ ছেড়ে চলে যান। কেউ কেউ নেমন্তন্ন খেতে বসে হট্টগোল শুনে উঠে পড়েন।

মিনুদেবী পাত্রী সুনীতার বাবা অযোধ্যা প্রসাদ ও মা গায়ত্রী দেবীকে এই মেয়ের জন্ম বৃত্তান্ত শোনাতে বলেন। তিনি ওদের জিজ্ঞাসা করেন - কোথায় মেয়ের জন্ম হয়েছিল ? ইত্যাদি। সুনীতার বাবা -মা কিছু একটা উত্তর দেন। মিনু দেবী এতে সন্তুষ্ট না হয়ে পাল্টা আরো প্রশ্ন করেন। ছেলে মাহিন্দ্রা মার কথায় অস্বস্তি এবং বিব্রত বোধ করে। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা কি ব্যাপার হচ্ছে। পাত্রীপক্ষের মা -বাবাকে অনেক অনুনয়-বিনয় এবং একই সঙ্গে জোরজবরদস্তি করার পর মিনু দেবী জানতে পারেন সুনীতাই হল ওর হারানো মেয়ে কমলা।

অযোধ্যা প্রসাদ ও গায়ত্রী দেবী ভেঙে পড়লেও তারা জানান যে ওরা সুনিতাকে বহু আগে গঙ্গাসাগর মেলায় পেয়েছেন। এই নিঃসন্তান দম্পতি সন্তানের আশায় গঙ্গাসাগরে গিয়ে কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেওয়ার পরই এই মেয়েটিকে পান। সে প্রায় ১৬ বছর আগের কথা।

এবার প্রশ্ন - ভাই বোনে তো বিয়ে হতে পারে না। বস্তুত সুনীতা মিনু দেবীর মেয়ে হলে তার পুত্র মাহিন্দ্রার সঙ্গে কিভাবে ওর বিয়ে হবে ? অন্যদিকে হারানো মাকে পেয়ে এবং সব জানতে পেরে সুনীতা

আসলে কমলা খুব খুশি হয়। দু - পক্ষের লোকজনই বাড়ি ফিরতে উদ্যত হয়। বিয়ে বাড়ির আলো গুলো আস্তে আস্তে নিভে যেতে থাকে। ঠিক এই সময়েই মাস্টারস্ট্রোক দেন   মিনুদেবী ।তিনি বলেন- এই বিয়ে হবে।

অন্যরা প্রশ্ন করে -কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

সকলের একই মোক্ষম প্রশ্নে মিনু দেবী সাবলীল ভাবে উত্তর দেন - মাহিন্দ্রা ওদের নিজেদের সন্তান নয়। দত্তক নেওয়া সন্তান। বয়সে কমলার থেকে একটু বড়ই হবে। এই কথায় বিয়ের সানাই আবার বেজে ওঠে।

বন জ্যোৎস্নায় হাসনুহানা

চিত্তরঞ্জন গিরি

প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনের টিকিটটা কেটে নিয়ে পাঁশকুড়া গামী ট্রেনে ওঠা অনিন্দ্য। ট্রেনে তেমন ভিড় নেই। আজ বুধবার। পরের দিন বৃহস্পতিবার বিধানসভার ভোট। বাস নেই বললেও চলে। ভোটের কাজে বাস গুলো সব বুকিং হয়ে গেছে। হাওড়া তে কোন বাস না পেয়ে অনিন্দ্য মেচেদা পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে তারপর না হয় মেচেদা থেকে স্টেট বা পাবলিক বাস বা ট্রেকার বা অন্য কিছুর সাহায্যে রামগড় যাওয়া যাবে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রেনে ওঠে। ট্রেনের কামরার উপরের দিকে জিনিসপত্র রাখার র্যা কে একটা বড় ব্যাগ এর পাশে নিজের ছোট্ট অ্যাটাচি রেখে একটা সিট দখল করে বসে। ট্রেনটা পাঁচটা দশে ছাড়ার কথা। ঘড়ির দিকে তাকায় অনিন্দ্য। ঘড়ির কাঁটাও পাঁচটা দশে। ট্রেনটা ঠিক সময়ে ছাড়লে তাড়াতাড়ি মেচেদা পৌঁছতে পারবে। আবার সেখানে বাস পাওয়াও কম ঝামেলার নয়। এবার ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ভালোভাবে জায়গা নিয়ে অনিন্দ্যও বসে অন্যান্য যাত্রীদের মত।

আর জায়গার অভাবও ছিল না। ট্রেনটা ছিল প্রায় ফাঁকা। এক যুবতী , পঁচিশ বয়স বছর বয়স হবে, ঠিক অনিন্দ্যর সামনাসামনি বসে। খেয়াল ছিল না অনিন্দ্যর। মেয়েটির জন্ম না চোখ ই তার উপস্থিতিকে বুঝিয়ে দেয়। সিটে বসতে গিয়ে মেয়েটিকে অনিন্দ্য দেখেছিল। মাথা নিচু করে সানন্দা পত্রিকা পড়ছিল। তখন মেয়েটার মুখটা অনিন্দ্যর সামনে ধরা পড়েনি। আর ধরা পড়েনি তখন মেয়েটার চনমনে চোখ দুটিও। গল্প-উপন্যাস কাব্যে কোন লেখক বা কবির বর্ণনায় কোন নারীকে অভিনন্দন ভালো লাগলেও বাস্তবের কোন নারীকে তেমন ভালো লাগেনি। আবার ভালো লাগেনি বললে ভুল হবে, বন্ধুত্ব করার জন্য তেমন কোন নারী তার কাছে আসেনি সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে। এরই ফাঁকে এক এক স্টেশনের প্লাটফর্ম আসে, আবার তারা চলেও যায়। এমনই এক প্লাটফর্ম থেকে ওঠে এক ফেরিওয়ালা। একগুচ্ছ আমলিকর প্যাকেট নিয়ে। ভদ্র শিক্ষিত মার্জিত পোশাক পরে মুখে ভাষার বিচ্ছুরণে আমলকির গুনাবলী বলে চলে, 'ডা বিধান চন্দ্র রায় সকলকে আমলকি খেতে বলতেন। ক্যান্সার দূর করতে পারে এই আমলকী, আরো অসংখ্য রোগ নির্মূল করতে পারে

এই আমলকী, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে এই ফলে। আপনারা দু' একটা নমুনা এমনি টেস্ট করতে পারেন। এর জন্য পয়সা দিতে হবে না, ভালো লাগলে কিনে নিতে পারেন। প্রতিটি প্যাকেটের মূল্য দশ টাকা।'কথাগুলি বলার ফাঁকে দু-একটা আমলকি ওই কামরায় উপস্থিত প্রত্যেককে দিতে দিতে অনিন্দ্য ও ওই মেয়েটির সামনে আসে। লোকটি আমলকি বার করেছে, এমন সময় অনিন্দ্য আর ওই মেয়েটি দুজনেই হাত বাড়ায় আমলকি নেওয়ার জন্য। পরস্পর পরস্পরের হাতের আলতো ছোঁয়ায় দুজনই লজ্জা হাতটা গুটিয়ে নেয়। আর ওই লোকটি আমলকি দিতে গিয়ে হাতে আমলকি নিয়ে থমকে গিয়ে মজার কৌতূহলে ওদের দুজনের দিকে তাকায়। কিউ আর হাত বাড়ায় না। লোকটি দু'জনকেই হাত বাড়িয়ে আমলকি দিয়ে দেয়। তারা পরস্পর পরস্পরে দিকে লাজুক হাসি ছুঁড়ে দিয়ে যে যার হাত পেতে আমলকি নিয়ে নেয়। আমলকি টি মুখে পুরে অনিন্দ্য দশ টাকা বার করে এক প্যাকেট আমলকি কিনে নেয়। আর সেই প্যাকেটটাকে অ্যাটাচিতে রেখে আবার যথাস্থানে সে বসে যায়।

ট্রেন এগিয়ে চলছে। অনিন্দ্য জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঠেকেছে। আর কিছুক্ষণ পরে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। মধ্যে মধ্যে ছড়িয়ে থাকা খেজুর , ঝাউ,সুপারি ,নারিকেল, কোথাও কোথাও ইউক্যালিপটাস বিষন্নতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সূর্যের দিকে চেয়ে ,বিদায়-সম্ভাষণ দিতে। মধ্যে মধ্যে ট্রেনের কামরার অন্য প্রান্ত থেকে অনিন্দ্যর কানে আসছে ভোটের গরম টুকরো টুকরো বিতর্ক। তার সঙ্গে দক্ষিণের প্রাণ জুড়ানো বাতাস গ্রীষ্মের গরমে শরীরের অস্বস্তি কে মুক্তি দিয়ে যায়।

অনিন্দ্যর গায়ের রং শ্যামলা। মুখের গড়নটা খুব সুন্দর না হলেও খারাপ নয়। পায়ে বাদামী রঙের বুটের সাথে ইস্ত্রি করা সাদা প্যান্ট শার্টে খুবই স্মার্ট লাগছে। ট্রেনে বাসে সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকানো তার অভ্যাস বা পছন্দ নয়। আবার তাকানোকে ও খারাপ ও মনে করে না। তার যুক্তিতে সুন্দরীর দিকে তাকানোর মধ্যে গুণী শিল্পী রাই শিল্পরস অনুভব করতে পারে। যদিও এ ভাবনা প্রথমদিকে আসেনি, বহু সাহিত্য পাঠেই তার মননশীলতায় ধরা পড়েছে। কেউ খারাপ ভেবে বসবে বলে কোন সুন্দর নারী মুখের দিকে তাকাতে অনিন্দ্য দ্বিধাবোধ করে। কিন্তু

ওই দুটি চোখের চঞ্চলতা, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শরমে রাঙানো হাসি সামনেই যেখানে হাজির, তাহলে একটু এক পলক তাকিয়ে দেখতে ক্ষতি কি! এইরকম ভাবতে ভাবতে অনিন্দ্যর চোখের দৃষ্টিটা মেয়েটির দিকে গিয়ে থামে। মেয়েটি তখন অন্যদিকে আনমনায় তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। তার দিকে অনিন্দ্যকে তাকাতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির হাসিবিহীন শুকনোমুখে পাশে থাকা ওই সানন্দা পত্রিকাটি তুলে নিয়ে পড়তে থাকে। অনিন্দ্য মনে মনে ভাবে, আমার এই তাকানোটাই ওর মুখকে শুকনো করে দিল। ওর দিকে তাকানোকেই ও খারাপ মনে করেন। চোখটা অন্য দিকে ফেরালো অনিন্দ্য। এমন সময় অনিন্দ্য দেখতে পায় কামরার গেটের কাছে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের কথাবার্তা শুনে অনিন্দ্য র মনে হলো ওরা কলেজ পড়ুয়া। কোন প্রফেসরের কাছে টিউশন সেরে বাড়ি ফিরছে। তাদের উল্লাস ভরা আলাপন যেন একগুচ্ছ চাঁপা ফুলের সুবাস গোটা কামরায় ভরিয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবে ট্রেনের মধ্যে থাকা অনেকের দৃষ্টি তাদের দিকে স্থির ভাবে আটকে যায়। ব্যাতিক্রম অনিন্দ্য ক্ষেত্রেও নয়। এবার অনিন্দ্যর সামনে বসা মেয়েটি দুটো হাত আগের মত ম্যাগাজিন তাকে ধরে

ঘাড়টাকে বাম দিকে ঘুরিয়ে গেটের কাছে ঐ মেয়েগুলোকে এক পলক দেখে নিয়ে ম্যাগাজিনের এক প্রান্ত বরাবর লুকিয়ে দেখার মতো অনিন্দ্য র দিকে তাকিয়ে ফলো করছে, অনিন্দ্য ওই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে কিনা! আর অনিন্দ্য এটা বুঝতে পেরে ইচ্ছে করেই গেটের কাছে ওই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে মনোযোগে তাদের কথাগুলো শোনার ভান করে। কিছুক্ষণ অনিন্দ্য এভাবে তাকাতে সামনের মেয়েটি এবার ম্যাগাজিন গুটিয়ে পাশে সশব্দে রেখে কটাক্ষ দৃষ্টিতে অনিন্দ্যর দিকে তাকায়। ওই দৃষ্টিতে অনিন্দ্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, তুমি হ্যাংলা ছেলের মত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?অনিন্দিতা অনুভব করে চোখটা আবার অন্য দিকে ফেরায়। মনে মনে অনিন্দ্য ভাবে, এ কেমন ধরনের মেয়ে! অনেক তো উপন্যাস গল্প পড়েছি ,এমন কখনো পেয়েছি কিনা সন্দেহ। আমি তো ওর দিকে তাকাই নি, ওর অত মাথা ব্যথা কেন? আশ্চর্য মেয়ে। এমন সময় এক ফেরিওয়ালা ওই কামরায় আসে বিভিন্ন ধরনের পেন বিক্রি করতে। একটা প্যাকেটে এক ধরনের পেন দুটো আছে। দাম দশ টাকা। অনিন্দ্য ও ওই মেয়েটির দুজনেরই পছন্দ। টাকা বার করে মেয়েটি পেনের

প্যাকেট নিয়ে নিলে অনিন্দ্য ও টাকা বার করে ওই ধরনের পেন কিনতে, কিন্তু ফেরিওয়ালার কাছে ওই ধরনের পেনের প্যাকেট আর নেই। ফেরিওয়ালা তা অনিন্দ্যকে জানায়। আরো জানায়, অন্য ধরনের পেন নিতে পারেন। প্রত্যুত্তরে অনিন্দ্য বলে, বাড়িতে অনেক পেন আছে। ওই পেনের সেটটা পছন্দ হয়েছিল, তাই কিনতে চেয়েছিলাম। এমন সময় মেয়েটি ফেরিওয়ালাকে বলে, আপনি বরং আমার এই পেন সেটটা ওনাকে দিন, আমি নেব না। সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্য বলে, না- না, উনি কিনে নিয়েছেন, আমার দরকার নেই। তখন মেয়েটি বলে, এমনি আমি কিনেছিলাম। আমার যে খুব ভালো লেগেছিল তা নয়। এবার জোর করে ফেরিওয়ালার হাতে পেনের সেটটা গুঁজে দেয়। আর অনিন্দ্য আমতা আমতা করে ফেরিওয়ালাকে দশ টাকা দিয়ে পেনের সেটটা নিয়ে নেয়। ফেরিওয়ালা দশ টাকা মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

সত্যি বিচিত্র ধরনের মেয়ে। পেনের সেটটা কিনেও আবার আমার জন্য ফিরিয়ে দিল, দয়া দেখাল। নিজেকে মহান করার চেষ্টা। রক্তে ভাবতেই জানালা দিয়ে বাইরে অনিন্দ্যর চোখে যেতে দেখে কোলাঘাটের ব্রিজটাকে ট্রেনটা অতিক্রম করছে, কোলাঘাটের পরের

স্টেশন মেচেদা, অনিন্দ্যর মনটা কেমন যেন বিষণ্নতায় ভরে এলো। ট্রেনটি কোলাঘাট পেরিয়ে মেচেদা স্টেশনে পৌঁছলে অনিন্দ্য র্যা ক থেকে তার অ্যাটাচি নিয়ে

ট্রেন থেকে নামে।

দিগন্ত রেখাটির পারে সূর্য অস্ত গেছে। পৃথিবীতে তার আলোর মৃদু আভাটুকু ছড়িয়ে রয়েছে। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে অনিন্দ্য। হাতের ছোট অ্যাটাচি। মধ্যে মধ্যে ট্রেনের ওই মেয়েটি মনের মধ্যে উকি মেরে যায়। মেচেদা স্টেশনটা আরো অনেক দূর হলে ভালো হতো। হয়তো আরো কত কি ঘটতো! যা হয়নি তা ভেবে লাভ কি?

গাড়ি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভগবান, একটা যেন বাস পেয়ে যাই। ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকিয়ে এদিকে ওদিকে না তাকিয়ে অনিন্দ্য ছুটতে থাকে বাসস্টপেজের দিকে। বাস স্টপেজ না বলে বা ডিপো বলা ভালো। এখান থেকে অনেক বাস ছাড়ে। দীঘা-মেচেদা,নন্দীগ্রাম- মেচেদা ,হলদিয়া -মেচেদা আরো কত বাস। কিন্তু একটা দেখা যাচ্ছে নন্দীগ্রাম- মেচেদা। তাহলে কি দীঘা- মেচেদা নেই? এদিক ওদিক তাকাতে অনিন্দ্য

দেখতে পেল অন্য প্রান্তে উত্তর-পূর্ব দিকে একটা স্টেট বাসের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তুই এগিয়ে সিওর হয় স্টেট বাস ই, এখান থেকে স্টেট বাস বলতে হলদিয়া-মেচেদা বা দীঘা -মেচেদা। এটা কি যে কি তা বোঝার জন্য দ্রুত পায়ে ওই বাসটির দিকে এগিয়ে যায় অনিন্দ্য। এমন সময় অনিন্দ্য দেখতে পায় একটি মেয়েকে ওই বাসে উঠতে। গাঢ় নীল শাড়ি পরা, মাথায় খোপা, পিছনটা দেখে অনিন্দ্যর মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, ট্রেনের সেই মেয়েটি ই এই মেয়ে। দৌড়তে দৌড়তে বাসের সামনে গিয়ে নেম প্লেটটায় লেখা দীঘা- মেচেদা দেখে অনিন্দ্যর খুব স্বস্তি বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠে অনিন্দ্য। বাসের ভিতর সব সিটের দিকে চোখ মেলে অনিন্দ্য দেখে কোথাও বসার জায়গা নেই। সাথে সাথে অনিন্দ্য কে দেখতে পায় মেয়েটি পাশে যাত্রীদের সরে যেতে বলে একটা সিট বের করে। দেখতে পায় ওই মেয়েটিকেও, একেবারে পেছনের সিটে বসেছে। জায়গাটা যে আছে চোখের ইশারায় মেয়েটি অনিন্দ্য কে বোঝায়। অনিন্দ্য তা বুঝতে পেরে মেয়েটির পাশে ওই সিটটায় গিয়ে বসে। বাস চলতে শুরু করেছে। দুজন পাশাপাশি বসাতে প্রত্যেকের শরীরের এক এক ছুঁয়ে আছে। মেয়েটির ডান হাতের নরম স্পর্শ অনিন্দ্য

হৃদয়ে যেন নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। তবুও নিজেকে সামলে নিজের শরীরকে একটু পেছনের দিকে কাত করে অনিন্দ্য মেয়েটির শরীরের স্পর্শ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ চলার পর রাস্তা খারাপের জন্য বোধহয় বাসটি বেশ দোল খেতে শুরু করেছে। এর জন্য মেয়েটি নিজেকে সামলে বসতে পারছে না। না পারারই কথা। মোটা কালো রঙের বড় ব্যাগ কোলে রেখে দুটো হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। মধ্যে মধ্যে ঢেউ যেমন কূলে গিয়ে আছড়ে পড়ে, তেমনি বাসের দোলায় মেয়েটির ব্যাগ ও তার সাথে ডান হাতটি পর্যায় বৃত্তি গতিতে অনিন্দ্য ওকে ধাক্কা দিয়ে যায়। মেয়েটির অসুবিধা হচ্ছে দেখে অনিন্দ্য মেয়েটিকে বলে,' ব্যাগটা আমায় দিন, আপনার বসতে অসুবিধা হচ্ছে।'মেয়েটি তখন ঠোঁটের এক কোণে লাজুক হাসি নিয়ে বলে,'না না, আপনার বলার জন্য আমাকে ধন্যবাদ।'এদিকে বাস সো-সো করে চলছে বাসের পেছনের দিকে দোলটা একটু বেশি হয়। তার ওপর বাস টা খুব জোরে ছুটছে।একটু বেশি দোল খাওয়াই স্বাভাবিক। চলতে চলতে বাসটি আবার জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল। মেয়েটি ব্যাগসহ নিজে অনিন্দ্যর গায়ের ওপর প্রায় আছড়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্য ধমক দেওয়া

সুরে বলে, 'ব্যাগটা তখন নিতে চাইলাম, তখন সম্মানে বাধল! দিন-,ব্যাগ টা দিন'বলেই অনিন্দ্য মেয়েটির কাছ থেকে প্রায় জোর করেই ব্যাগটা কেড়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলে,' আমার জন্য আপনি কষ্ট পাবেন?

অনিন্দ্য বলে, তাহলে আপনার কষ্ট দেখে আমি পাশে বসে মজা উপভোগ করি।'এবার মেয়েটি কিছু না বলে চুপ হয়ে যায়। একটু ক্ষণের পর মেয়েটির মুখ খোলে,'মানে আমি বলতে চাইছিলাম আমি তো অনেক দুর যাবো-'

মেয়েটির কথা শেষ করতে না দিয়ে অনিন্দ্য বলে, 'কতদূর যাবেন?'

- 'পিছাবনী।'

_ 'ওইখানে আপনার বাড়ি?'

_ 'হ্যাঁ, ওইখানে। আপনার বাড়ি?'

_ 'আমার বাড়ী রামনগর। রামনগর ঠিক নয়, রামনগর থেকে তিন কিঃমিঃ উত্তরে এগ্রা লাইনে লালুয়া পুল বাস স্টপেজের কাছে। গ্রামটার নাম সাবিত্রীপুর। আপনার বাড়ি কি পিছাবনী বাস স্টপেজের কাছে?'

_ 'বাস স্টপেজের থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথে পূর্ব দিকে। পিছাবনীর দিকে গেছেন কখনো?'

_'না, এমনি পিছাবনী তে যায়নি। কলকাতা যাওয়ার সময় বাসে পিছাবনীর উপর দিয়ে যাওয়া, এই টুকুই মাত্র।'

_ 'আমিও আপনার ওইদিকে কোনদিন যাইনি। আচ্ছা পিছাবনী থেকে আপনাদের বাড়ি কত দূর হবে?'
একটু ভেবে অনিন্দ্য বলে, 'হ্যাঁ, প্রায় কুড়ি কিমি হবে।'
বাস ঠিক আগের মতো সো-সো শব্দ করে চলছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকছে মনকাড়া গ্রীষ্মের দক্ষিণে হাওয়া। খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ চাপ। রাস্তার দু'পাশে ঝাউ, ইউক্যালিপটাস আর বাবলা গাছ গুলি বাসের বিপরীত দিকে দুরন্ত গতিতে ছুটছে। বাসের মধ্যে কয়েকটা সবুজ আলো জ্বলে আছে। পেছনের দিকে আবছা আলোয় মেয়েটির মুখ ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। নাকে ও কানে সোনায় বসানো পাথরের উজ্জ্বল আলোর ঝিলিক মেয়েটির স্মার্টনেস কে যেন বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শরীরের নিটোল গরমটা যেন জলপূর্ণ দিঘির প্রকাশ।- 'কলকাতায় আপনার কি করা হয়?'মেয়েটি অনিন্দ্যকে প্রশ্নটা ছুড়ে দেয়।

_'বেলেঘাটায় সেল ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এ চাকরি করি। আপনি কি করেন?'

-'না, না আমি চাকরি টাকরি কিছু করি না। পড়াশুনা করে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছি।'

-'কত পর্যন্ত পড়েছেন?'
- 'বাংলায় এম.এ.পাশ করে বি.এড . গত বছর করেছি। আর আপনি?'
- 'প্লেন বি. এ. পাশ করেছি। আসল কথা কি জানেন, বাড়ির অবস্থা আমার ভালো ছিল না। টেনে পড়ার সময় বাবা মারা যায়। ঘরে মা ,আর একটা ছোট বোন আছে। কলকাতায় টিউশন পরড়য়ে বি.এ. পর্যন্ত পড়েছি। তারপর পরীক্ষা দিয়ে কোনরকমে এই চাকরিটা জুটিয়েছে।'

--'এখন যা চাকরির অবস্থা, কত এম এ., এম .এস .সি বসে আছে। সে তুলনায় আপনার ভাগ্য ভাল বলতে হয়।'

-'হ্যাঁ তা বলতে পারেন'।

-'কত বছর আপনার চাকরি হয়ে গেল?'

_'পচিশ বছর বয়সে পেয়েছিলাম। এখন আমার বয়স তিরিশ। হ্যাঁ প্রায় পাঁচ ছয় বছর হয়ে গেল।'

এরই ফাঁকে কন্টাকটার প্রত্যেকের কাছে টিকিট দিয়ে ভাড়া নিয়ে যায়। বাসটা তখন হলদি নদী ব্রিজ অতিক্রম করে চন্ডিপুর এর দিকে চলেছে। রাস্তার দুপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আউশ ধানের ক্ষেত। দুজন তাকিয়ে আছে জানালার ফাঁক দিয়ে ফুটে ওঠা জ্যোৎস্নালোকে মাখা প্রকৃতির দিকে। কিছুক্ষনের অনিন্দ্য বলে,'এখন কোথায় থাকেন? কোন মেসে?'
মেয়েটি জানালা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে বলে,
'হ্যাঁ। মেসে থাকি। যাদবপুরে। আপনি কোথায় থাকেন?'
-- 'বাগমারি তে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি।'

হঠাৎ বাসে ইঞ্জিনে কড়্ কড়্ করে বিকট শব্দ। পঁচিশ তিরিশ ফুড এগিয়ে গিয়ে বাস থামে। কী হল বলে বাসের সকলে উৎসুক মুখে কন্টাকটার ড্রাইভার এর

দিকে তাকায়। দশ পনেরো মিনিট ড্রাইভার ইঞ্জিন খুলে কি একটা চেষ্টা করে না পেরে বলে,'একটা পার্টস খারাপ হয়ে গেছে। কোলাঘাট থেকে আনতে হবে। বাস চালু হতে দু তিন ঘন্টা লেগে যাবে।'কথাটা শুনে সকলের মুখে হতাশা দীর্ঘশ্বাস বেরোয়। এদিকে ভোটের জন্য রাস্তায় বাস নেই বললেই চলে। এমনি করে বাসে বসে সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। অনিন্দ্য হাত ঘড়ির দিকে তাকাতে মেয়েটি জানতে চায়,'কটা বেজেছে?'ঘড়ি দেখে অনিন্দ্য বলে,'সাতটা চল্লিশ।'বাস থেকে কিছু যাত্রী বাইরে বেরিয়ে শরীরের হাওয়া লাগিয়ে আরাম বোধ করছে।' আপনার বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে না?'কথাটি বলে মেয়েটি অনিন্দ্যর দিকে তাকায়। অনিন্দ্য উত্তর করে,'না-না, তেমন অসুবিধা হবে না। রামনগরে রিক্সা অনেক থাকে।'কথাটা শেষ হতে না হতেই কয়েকজন যাত্রী বলে 'বাস আসছে ,বাস আসছে।'বলেই তারা যে যার ব্যাগ বের করে বাস থেকে নেমে যেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীঘা গামী বাস। এই বাস থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ওই বাসটায় ও প্যাসেঞ্জার প্রায় ভর্তি। জানলা দিয়ে অনিন্দ্য দেখে মেয়েটিকে বলে,'চলুন, চলুন, ওই বাসটায় আমাদেরও

উঠতে হবে। না হলে আমাদের ভাগ্যে দুর্ভোগ আছে।'সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও উঠে পড়ে। অনিন্দ্য বাসের উপরে র্যা কে অ্যাটাচি বের করে আর মেয়েটির বড় ব্যাগটি তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অনিন্দ্য তখন মেয়েটিকে বলে,'আপনি অ্যাটাচি নিয়ে নামুন, আমি ব্যাগটা নিয়ে নামছি।'বলে ওরা বাস থেকে নামতে থাকে। বাস থেকে নেমে ওরা অন্যান্য যাত্রীর মত ছুটতে আরম্ভ করে। একটুখানি ছুটতেই মেয়েটির ছোট পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। কয়েক পা বেশি এগিয়ে গিয়েও অনিন্দ্যকে থমকে যেতে হয়। মেয়েটির হিল দেওয়া জুতো হোঁচট খাওয়ার সময় তার পা থেকে বেরিয়ে কয়েক হাত দূরে ছিটকে চলে যায়। অনিন্দ্য পিছু হটে মেয়েটির কাছে আসতে সে বাসটা ছেড়ে চলে যায়। বাসায় অনিন্দ্য তাকিয়ে থাকে চলমান ওই বাসটির দিকে। মেয়েটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলে,'আমার জন্য আপনি বাসটায় যেতে পারলেন না, ইস্, আপনাকে অসুবিধায় ফেললাম।'

--'আরে অসুবিধা কি আছে! আপনার কোথায় লাগলো, দেখি দেখি !'

---'তেমন কিছু হয় নি। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটায় পাথরটা লাগাতে একটুখানি ছড়েছে।চতুর্থ খন্ড:--- অনিন্দ্য অবাক চোখে জিজ্ঞেস করে,'রক্ত বেরোচ্ছে? ব্যথায় কাতরানো মুখে মেয়েটি উত্তর করে,'হের রক্ত বেরোচ্ছে।' 'বাসে চলুন কেমন ছড়েছে দেখা যাবে।'ব্যাগ অ্যাটাচি নিয়ে দুজন বাসে ওঠে। বাসের র্যাকে অ্যাটাচি, পেছনের সিটের ওপর ব্যাগ রেখে আলোর কাছে গিয়ে মেয়েটির পায়ের আঙুলে চোখ রাখে অনিন্দ্য। দেখে ফোঁটা কয়েক রক্ত ছড়িয়ে গিয়ে বুড়ো আঙ্গুল সহ পায়ের আঙ্গুল কে লাল করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কন্ডাক্টারকে জিজ্ঞেস করে অনিন্দ্য,'ডেটল বা কাটা ছোড়ার ওষুধ আছে?'কন্ডাক্টার না বলাতে মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসে কোথাও ডাক্তার-খানা বা কোন ঘরে ডেটল পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে। রাস্তার দুই দিক প্রায় ফাঁকা। ঘরবাড়ি খুব কম। প্রায় তিনশ মিটার উত্তর পূর্ব দিকে একটা পাকা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পূর্ণিমা চাঁদের আলো সারা আকাশে মিষ্টি রোশনাই ছড়িয়ে নিজেকে মোহময়ী করে তুলেছে। বাঁকা কয়েকটা রাস্তা পেরিয়ে ওই বাড়ি যায়। বেশ ভালো করে মেয়েটির পায়ে ডেটল লাগিয়ে ওই বাড়ি থেকে কাপড় নিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়। আর ওরা ওই বাড়ি

থেকে জল চেয়েও খায়। সেখানে আধ ঘন্টা কাটানোর পর ফিরে আসার সময় অনিন্দ্য মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে,'এবার ভালো লাগছে তো?'মেয়েটি উত্তর দেয়,'হ্যাঁ ভালো লাগছে। আরো ভালো লাগছে এই জ্যোৎস্নায় আলোয় ফাঁকা পরিবেশে সবুজ ঘাসের উপর হাটতে।'পাশাপাশি দুজন হাঁটছিল। অনিন্দ্য মৃদু হেসে মেয়েটিকে বলে,'কোথায় যেন রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি!'মাথা ঝাকিয়ে মেয়েটি বলে,'আপনার মনে কখনো রোমান্স আসে না?'অনিন্দ্য উত্তর করে,'না বলছি না, আসি অবশ্যই...'কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মেয়েটি বলে,'দেখুন দেখুন পুকুরটার ওপারে দেখুন, কত ফুলের গাছ, সুন্দর করে কাটার বেড়া দিয়ে আটকে রেখেছে। ব্যথার জন্য আসার সময় খেয়াল ছিল না। ও প্রান্ত টা পুরো ফাঁকা, দূরে ঝাউ, ইউক্যালিপটাস, জোৎস্নার আলোয় সব কেমন মিষ্টি লাগছে। চলুন না বাসে না বসে ঘাটের কাছে ফাঁকা মতন ওইখানে বসি। ধুলো লাগবে না, দূর্বা ঘাস তো, ভগবান আমাদের জন্য আসন করে দিয়েছে।'অনিন্দ্য মৃদু হাসলো। দুজন পাশাপাশি বসে ঘাসের ওপর। তখন দু'জনকেই খুব রোমান্টিক লাগছিল। দুজনেই গোগ্রাসে প্রকৃতির অমন সুন্দর রূপ পান করছিল

আনমনা হয়ে। সবুজ প্রকৃতিকে আরো মোহময়ী করে তুলেছে জোনাকির মিটমিট করা আলো। গোটা সবুজ প্রকৃতিকে চাঁদ তার না ওড়নায় ঢেকে রেখেছে আরো রহস্যময়ী করে তোলার জন্য। রূপের মাধুরীতে বিভোর হয়ে অনিন্দ্যর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে,'অপূর্ব!'মেয়েটিও সাথে যোগ করে,'সত্যি অপূর্ব!'

অনিন্দ্যর মুখ থেকে স্পষ্ট উচ্চারণে আবৃতি ঢং-এ বেরিয়ে আসে কবিতা।

ওরে মোহময়ী রাত-
তারার আকাশে জেগে থেকে
জোনাকি আলোয় মেতে
শ্যামলা গায়ে ওড়না পড়ে
আছিস বেশ সুখে,
কেন আমায় টানিস তুই
অমন করে আজ!

মেয়েটি হেসে বলে,'বেশ তো, আপনি ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন। কবিতার চর্চা করেন মনে হয়! আচ্ছা এ কবিতাটি কার লেখা?'

_'এটা একটা কবিতা হলো নাকি! মুখে দু একটা ভাষা এল সাজিয়ে তা বলে দিলাম। তা যদি আপনি কবিতা মনে করেন তাহলে....'বিস্ময়ে মেয়েটি

বলে,'আপনি কবিতা কখনো লিখেছেন?'অনিন্দ্য বলে,'হ্যাঁ, এইরকম অনেক কবিতা লিখেছি। কিন্তু একটাও ছাপাইনি। বা কোন ম্যাগাজিনেও পাঠাইনি।'

মেয়েটির বিস্ময়ে বলে,'কেন আপনি পাঠাননি?'

_'এইরকম কবিতা লিখি অবসরে, শুধু মন কে আনন্দ দেওয়ার জন্য।'

_'না, আপনাকে, বেশি প্রশ্ন করে এমন সুন্দর রাতের সৌন্দর্য উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হব তা আমি চাইনা, বরং আপনার আজকের অনুভূতির কথাই শুনি।'

অনিন্দ্য হাতের ইশারায় মেয়েটিকে বলে,'দেখুন ওই উত্তর-পূর্বদিকে মেঘগুলো কেমন স্তরে স্তরে সেজে রয়েছে যেন মনে হয় কোন এক অচিন দেশ, দেখছেন আপনি, কেমন সুন্দর মেঘের পাহাড়, কেমন সুন্দর মেঘের সমুদ্র, কেমন সুন্দর মেঘের দিঘী, ইস্ আমার যদি দুটো ডানা থাকতো পাখির মত, আমি উড়েই চলে যেতে পারতাম।'

নীল সাগরের ঢেউ দিয়ে যায়
কিনারায় বাজে স্রোত,
অণুতে অণুতে বেজে ওঠে প্রাণ,

তনুতে হিল্লোল।

মেয়েটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে,'বাঃ সুন্দর!' দুষ্টুমিতে অনিন্দ্য বলে, কোনটি, আমার আবৃত্তি না এই মোহময়ী রাত্রি?'

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে,'দুটোই। আজকের এই রাত যেন মাতাল করা এক নেশায় ভরিয়ে রেখেছে।'সাথে সাথে অনিন্দ্য প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করে-

ওরে মাতাল করা রাত্রি
নীল কপালে টিপ পড়ে তুই
হাস্নুহানায় জেগে
জুঁই ডালিয়া গায়ে সেঁটে
সাজিয়ে ছিস নিজেকে,
আমি এখন সন্ধ্যেবেলার যাত্রী
পথের মাঝে আটকে রেখে
আছিস বেশ সুখে-
ওরে ও মাতাল করা রাত্রি।

'আমার যে কি ভালো লাগছে, বলে বোঝাতে পারবো না।'আবেগের ঘন দীর্ঘশ্বাসে কথাটা বলে মেয়েটি অনিন্দ্যর দিকে তাকায়।

অনিন্দ্য শান্ত ভাবে আবেগের মতো করে বলে,'তাই!'মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে,'তাই নয়কি! ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের মাঝে দীঘির জল, অমন সুন্দর চাঁদ, তার ওপর পাশে একজন...,'পুরো কথাটি না বলে থেমে যায় মেয়েটি।পঞ্চম খন্ড:----- অনিন্দ্য কৌতূহলে বলে,'থামলেন কেন? তার ওপর পাশে একজন কি?'

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে বলে,'না। কিছু নয়..... ভালো কথা শুনতে নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার মেয়েটি বলে,'আচ্ছা আমরা আসবো বলেই কি এমন দিঘী, চাঁদ, ফুলের বাগান, দূরে সুপুরি গাছের সারি- এরা প্রত্যেকে হাজির হয়েছে।'

মাথা নেড়ে অনিন্দ্য বলে,'হ্যাঁ, আপনি আমার সাথে এখানে কিছু সময় কাটাবেন বলে রাতকে আমি সাজাতে বলেছিলাম, চাঁদকে তার মিষ্টি রোশনাই নিয়ে নীল আকাশের বুক চিরে অমন সুন্দর ভাবে

ফুটতে বলেছিলাম। জল ভরা দিঘি কে সুন্দর ঘাসে সাজতে বলেছিলাম। ওই যে বাগান দেখছেন, ওখানেই গোলাপ, রজনীগন্ধা, চামেলীদের ফুটতে বলেছিলাম।'

মেয়েটি হেসে বলে,'তাই? অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দুজন- দুজনের দিকে চোখের পলক ফেলে এদিকে ওদিকে তাকানোর ফাঁকে আবেগ ঘন আকর্ষণে এমনি করে কয়েকটা মুহূর্ত ভাষাহীন নীরবতায় কেটে যাওয়ার পর মেয়েটি বলে,'আচ্ছা, এর আগে কাউকে সাথে নিয়ে আজকের মত এমন রাত কাটিয়েছেন?'

অনিন্দ্য মাথা নাড়িয়ে জানায়,'না।'

_'কেন, আপনার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে কোনো চাঁদনী রাতে বসে সময় কাটাননি?'

মাথা নেড়ে অনিন্দ্য উত্তর দেয়,'না।'

উৎকন্ঠায় জানতে চাই মেয়েটি,'কেন?'

হেসে অনিন্দ্য বলে,'বিয়েই করিনি।'

এবার মেয়েটি হেসে বলে,'ও তাই।'

মেয়েটির চোখে মুখে চঞ্চলতার সাথে উৎফুল্লতার ছাপ। বাগানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ইচ্ছে করছে বেড়া টপকে বাগানের ফুলগুলো সাথে আমিও মিশে

যাই। দেখুন দেখুন দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ফুল গুলো কেমন ফুটে রয়েছে।'

মেয়েটির কথা শুনে অনিন্দ্য বাগানের দিকে তাকিয়ে ঠোট নাড়িয়ে আওয়াজ তোলে-

ভোরের মল্লিকা, লুকিয়েছিস কোথায়? দেখ, তুই দেখে যা-

সাঝের চামেলী আলো করে আছে
মুঠো মুঠো জোছনায়।

ফুলের কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মেয়েটি অনিন্দ্যর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে দেখে। মেয়েটির এই রকম অবস্থা দেখে অনিন্দ্য বলে,'কি হলো আপনার?'

_ 'বিভ্রান্তিতে পড়লাম।'

_'কেন?'

_'কার দিকে তাকাই! ফুলের, না আপনার দিকে?'

_'কেন, যে এত সুন্দরের স্রষ্টা, ঐ চাঁদের দিকে...'

মেয়েটি অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

অনিন্দ্য চাঁদের উদ্দেশ্যে বলে

সুন্দরী ওগো চন্দ্রমা
তোমার বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস
প্রেমের সুরভী ছড়িয়ে দিয়ে
রোশনাকে করেছ রাশ

চার দিকে ঝরে মুক্ত আকর
ভরা গাঙ্গে জোছনায়
কপোত কপোতী বসে জেগে রয়
তোমার প্রেমের আঙিনায়।

অনিন্দ্যর কবিতা শুনতে শুনতে মেয়েটি যেন ভাবছে বিভোর হয়ে, বা অন্য কোন জগতে চলে গেছে। টনক নড়ে যখন শুনি অনিন্দ্যর কণ্ঠে,'কি ভাবছেন?'
থতমত খেয়ে মেয়েটি বলে,'না, তেমন কিছু নয়।'ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অনিন্দ্য বলে,'অনেক সময় কেটে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিলে ব্যাগ আর অ্যাটাচি দুটো খাওয়াতে হবে আমাদের।'অনিন্দ্য উঠে দাঁড়াতে মেয়েটিও উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটি এমন ভাবে ওঠে যেন তার উঠতে ইচ্ছে ছিল না।

দুজন গুটি গুটি পায়ে চলতে থাকে। দু'জনের মুখের কোনো ভাষা নেই। মাঝে মাঝে তাদের কানে আসে বাসে ইঞ্জিন সারানোর বিদঘুটে আওয়াজ। গাছের কাছে পৌঁছে অনিন্দ্য কন্ডাক্টারের কাছে জানতে পারে বাস পা্ঁচ দশ মিনিটের মধ্যে ছাড়বে। বাসের মধ্যে অনেকে চলে যাওয়াতে ওরা দুজন বাসের মাঝ বরাবর বসে, ব্যাগ, অ্যাটাচি ও সাথে রাখে।

_'আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখছি।'কথাটি অনিন্দ্য বলে মেয়েটির দিকে তাকায়। তার সাথে চোখে মুখে কৌতূহলের ভঙ্গিতে বলে,'ব্যাপার কি, কি হলো?'

অনিন্দ্যর দিকে করুন দৃষ্টিতে একটুখানি তাকিয়ে বলে,'না-তেমন কিছু নয়।'বলেই মেয়েটি মুখটা নিচু করে। সাথে সাথে তার যেন একটা বড় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মেয়েটির মুখে কথা ফোটার জন্য অনিন্দ্য বলে,'আপনার নামটা তো জানালেন না?'

মেয়েটি বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে,'আপনি তো জানতে চাননি!'

অনিন্দ্য বলে,'এইতো এখন জানতে চাইলাম।'

লাজুক চোখে মেয়েটি বলে,'অনিমা গিরি। আপনার নাম?'

অনিন্দ্য বলে,'অনিন্দ্য মাইতি।'এর ফাঁকে কখন যে বাস চলতে শুরু করেছে অনিন্দ্যর খেয়াল ছিল না। জানালার পাশে বসে অনিন্দ্য। জানালার বাইরে চোখ যেতে যেতে তখনই অনিন্দ্য বুঝতে পারে বাইরে আলোর সমুদ্র। মতে মতে দক্ষিনের বাতাস দু'জনকেই আনমনা করে তোলে। অনিন্দ্যর মুখে জড়ো হওয়া ভাষা কবিতা রূপে বেরিয়ে যায়।

শ্যাম সবুজে জোছনায় ভরা
গাঢ় রাত্রির কোরক
নীলিমায় যত সন্ধ্যাতারা
এই পৃথিবী তার ধারক
নেচে নেচে আসে দখিনা বাতাস
নেভায় গায়ের জ্বলন
বসে অনুভবে স্বাদ পাই ঠিক
কার রাঙানো ঠোঁট চুম্বন!

'কোন নারীর রাঙানো ঠোঁটের চুম্বনের স্বাদ তাহলে পাওয়া হয়ে গেছে!'বক্রোক্তিটি অনিন্দ্যর দিকে ছুঁড়ে দেয় মেয়েটি।

'আরে না- না, তেমন সৌভাগ্য হয়নি। কল্পনার ও একটা অনুভব আছে। এই অনুভবের স্বাদ কবিতায় ঢুকিয়েছি মাত্র।'কথাটি বলে থামে। মেয়েটির দিকে কৌতুহল চোখে আবার অনিন্দ্য বলে,'একটা কথা বলব?'

_'বলুন।'

_'আপনি কখনো কাউকে ভালবাসেননি, মানে যাকে প্রেম বলে, ওই প্রেম-টেম করেননি?'

_'মাথা খারাপ!'

_'কেন, প্রেম টেম পছন্দ করেন না বুঝি?'

_'না না, তা নয়। বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়েছি। প্রেমকে তো আগে পছন্দ করব। কিন্তু আমার বাবার জন্যই তো এই সব থেকে দূরে, বাবাকে খুব ভয় করি। আমার মা নরম প্রকৃতির। আমরা দুই বোন, ভাই নেই। বাবা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। তার সাথে রাজনীতি ও করেন। জেলা পরিষদে দাঁড়িয়ে জিতেছেনও। আমার ওপরে পাঁচ বছরে বড় দিদি, সে একজনকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। প্রথম তিন বছর তো তার সাথে বাবা কোন সম্পর্কই রাখেননি। পরের দিকে মায়ের পীড়াপীড়িতে দিদির সাথে এখন সম্পর্ক ভালো। এদিকে বাবা আমাদের খুবই ভালবাসেন, বাবা যাতে কষ্ট না পান তাই এসবে কোনো মন দিই নি। তাছাড়া আগে তেমন কেউ আসেনি, যাকে মনে প্রাণে ভালোবাসা যায়। আমার কথা তো শুনলেন, এবার আপনার কথা বলুন না?'

_'আমার কথা!'

,_'হ্যাঁ, আপনার কথা। আপনার জীবনে কোন নারীর কথা। মানে আপনার প্রেমের কথা।'
অনিন্দ্য একটু চুপ করে ভাবতে ভাবতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়।

_'কি, বলছেন না কেন?'তাড়া দেয় মেয়েটি।
দুষ্টুমির চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে,'খুঁজছি।'
অবাক চোখে মেয়েটি বলে,'খুঁজছি মানে?'
অনিন্দ্য বলতে আরম্ভ করে---

'কত বার খুজেছি আমি তারে
পর্বত সমতলভূমি পেরিয়ে
কত নদীর তীরে-
কাজল কালো আঁখিতে গড়া
মোর শত জনমের একমাত্র প্রিয়ারে!'

কৌতূহলে মেয়েটি বলে,'খুঁজে কি পেয়েছেন?'
অনিন্দ্য বলে চলে-

'পাকা ধানের খেতের পারে
উদাসি দুটি চোখে
আনমনা হয়ে দেখেছিল
শুধুই সে আমাকে।'

আবেগ মথিত ভারী গলায় মেয়েটি বলে,'তারপর?'

_'তারপর,

হঠাৎ যেন দমকা হাওয়া
উড়িয়ে নিল তাকে,
আধার ঘরে হাতরে বেড়াই
সেই প্রাণ-প্রিয়াকে!'

এমন সময় বাসটি কন্টাইতে স্টপেজ দেয়। ওদের সেদিকে খেয়ালই নেই। দুজনেই চাতক চাতকীর মত ফাগুনের গল্পে মেতে। অনিন্দ্য কবিতা শেষ করে ভীরু চোখে তাকায়। মেয়েটির সমানভাবে আবেগ মথিত গলায় ভীরু চোখের কাঁপুনিতে বলে,'আপনার প্রিয়াকে খুঁজে পেয়েছেন?'অনিন্দ্যর কাঁপুনি গলায় ধীরভাবে বেরোয়,'পেয়েছি আবার পাইনিও।'প্রত্যুত্তরে মেয়েটিও কিছু বলতে আরম্ভ করবে, এমন সময় সদ্য বাসে ওঠা কাঁচা পাকা চুলের একজন বয়স্ক লোক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে,'অনিমা, এত দেরী হল যে, আয় এখানে সিট খালি আছে। এখানে ভোটের মিটিং-এ এসেছিলাম।'

কাঁচা পাকা চুলের লোকটির কথায় অনিমা মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে অনিন্দ্যকে শোনায়,'আমার বাবা!'

মিটি উঠে ব্যাগ নিয়ে, সামনের দিকে গেটের কাছে, বাবার পাশে বসে।
পিছনে বসা অনিন্দ্য মেয়েটির দিকে বারবার তাকানোর চেষ্টা করে। লক্ষ্য করে মেয়েটি তার দিকে তাকাচ্ছে কিনা। কিন্তু না, একবারও তাকায়নি।
কিছুক্ষণ পর আসে পিছাবনী বাস স্টপেজ। ব্যাগ হাতে বাবা এগোন, পেছনে মেয়ে।

গেটের কাছে সবুজ আলো, বাবা নামার সময় মেয়েটি একবার তাকায় অনিন্দ্যর দিকে। তার করুণ চোখের দৃষ্টিতে এক আর্তি ফুটে ওঠে, সে আর্তিতে যেন অনিন্দ্যকে বুঝিয়ে দেয়,'তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার ছিল।'

অভিমান

আর্য্য ভট্টাচার্য্য

সেদিনই আমি পেয়েছিলাম ভালোবাসার গন্ধ যেদিন তোর ঠোঁটের আলতো স্পর্শ আমাকে পাগল করেছিল। কত খুনসুটি হতো আমাদের মাঝে, মান অভিমান চলত আবার ভাঙতো। বেলা গড়াতে না গড়াতেই সব ঠিক হয়ে যেত। আমার মনে পড়ে সেই কবেকার দুর্গাপুজোয় তোর হাত ধরে হেঁটেছিলাম অষ্টমীর সন্ধ্যায়, রাস্তায় ফুচকাওয়ালা দেখলেই তুই আমার কাছে ফুচকা খাওয়ার জেদ ধরতিস। দুর্গা পুজো মানেই তুই নীল শাড়ি আর আমি নীল পাঞ্জাবী পড়ে সাজুগুজু করে অষ্টমীর সন্ধ্যায় ঠাকুর দেখতে বেরতাম। আমরা একে অপরকে কথা দিয়েছিলাম যে বড় হয়ে আমরা একে অপরের জীবন সঙ্গী হয়ে উঠব। কিন্তু আজ আমার খুব কষ্ট হয় রে। তুই কেন চলে গেলি আমাকে ছেড়ে চিরকালের জন্য ? কি হয়েছিল তোর আমি আজও জানতে পারলাম না। তুই কি আমাকে অভিমান করে দূরে ঠেলে দিলি..!

কে আপন কে পর

অসিত কুমার পাল

স্বামীহারা বছর পঁয়ত্রিশের বিনীতা সিং সোনারপুরে এক আধা বস্তিতে থাকেন । কয়েকটি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে নিজের খরচটুকু চালিয়ে নেন। একমাত্র ছেলে বছর দুই আগে কাজের খোঁজে আমেদাবাদে গিয়েছিল, দু একবার টাকাও পাঠিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে টাকাও পাঠায়নি , বাড়িতেও আসেনি । বেঁচে আছে কিনা তাও জানা যায়নি ।

ইতিমধ্যে মারনব্যাধি করোনার জীবাণু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে । তার ধাক্কায় খেটে খাওয়া মানুষের জীবন জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । লকডাউনের জন্য গত বছর মার্চের শেষদিকে ট্রেন বাস বন্ধ হওয়ায় গৃহ পরিচারিকার কাজটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল , সেই সঙ্গে রোজগারও । বাধ্য হয়ে শেষ সম্বল একটা সোনার আংটি ও চারগাছা চুড়ি বিক্রি করতে হয়েছিল ।

পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হওয়ায় আগেই বিনীতা জানতে পারলেন তার শরীরে দুরারোগ্য স্তন ক্যানসার

বাসা বেঁধেছে । বুকের একপাশে যন্ত্রনার অনুভব হওয়ায় প্রথমদিকে তিনি পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে যন্ত্রণার ওষুধ কিনে খেতেন। কিন্তু একসময়ে হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করাতেই আসল রোগটা ধরা পড়েছিল । এদিকে লকডাউনে জেরে হাসপাতালে গিয়ে নিয়মিত চিকিৎসা করানো অসুবিধে আবার চিকিৎসার খরচও অনেক ।

অন্যদিকে করোনার ভয়ে কাছের বা দূরের আত্মীয় কুটুমরা কেউই সাহায্যের হাত বাড়ালো না । ফলে অথৈ জলে পড়ে অসহায় ভাবে বিনীতার দিন কাটতে লাগল । তিনি দাঁতে দাঁত চেপে অসহ্য যন্ত্রনা ও খিদে সহ্য করে নিজের ঘরেই পড়ে থাকলেন ।

বেশ কয়েকদিন ঘরের বাইরে না বের হতে দেখে প্রতিবেশী সুবালা বিনীতার সঙ্গে দেখা করতে এল । বিনীতার মুখে তার দুর্দশার কাহিনী জানতে পেরে সুবালা খবরটা পাড়ার অন্য কয়েকজনকে জানাল । তারাই চেষ্টাচারিত্র করে বিনীতাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করল ।

বিনীতার প্রতিবেশীদের কারোরই আর্থিক অবস্থা ভাল নয় । তবু তারা চাঁদা তুলে হাসপাতালের চিকিৎসার খরচ, ওষুধপত্র এমনকি কেমো থেরাপির খরচ বহন করল । দুবেলা তাকে দেখতেও গেল ।

হাসপাতাল থেকে জানানো হল অবিলম্বে বিনীতা দেবীর অপারেশন করা দরকার । তার জন্য বেশ কিছু খরচ আছে । প্রতিবেশীরা চাঁদা তুলে সেই খরচও বহন করল ।

প্রতিবেশীরা বিনীতাকে এমন আশ্বাসও দিল অপরেশনের পরে বাড়ি ফিরলে তারাই তার দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে । হাসপাতালের বেডে শুয়ে বিনীতা ভাবতে লাগলেন যখন নিজের ছেলে তার খবর নেয় না , সে দুর্দশায় পড়েছে জেনেও তার আত্মীয় কুটুমরা করোনার দোহাই দিয়ে দূরে থেকেছে তখন অনাত্মীয় গরীব প্রতিবেশীরা সবরকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে । বিনীতা অনুভব করতে পারল মানুষ বিপদে না পড়লে বুঝতেই পারে না কে সত্যিকারের আপন আর কে পর ।

আর্টিস্ট

সুবীর মজুমদার

জানলার ধারে বসে আছে ছোট্ট ছেলেটা। নাম তার বাদল। সে যেন কী একটা কঠিন অসুখে ভুগছে। তাই ডাক্তারের পরামর্শে তার বাইরে যাওয়া বারণ। খেলাধূলা তো দূর, হাঁটতে গেলেও তাকে কারও সাহায্য নিতে হয়। তাই দিনের বেশীর ভাগ সময়টা তার খাটের উপরে-ই কেটে যায়। খাটের পাশেই রয়েছে এই জানলাটা। বাদল এটার গরাদ আঁকড়ে বসে সারাদিন ধরে কতকিছু প্রত্যক্ষ করে।

তাদের বাড়ির বাইরে একটা যাতায়াতের রাস্তা। সেখান দিয়ে কত রকমের মানুষ চলাচল করে। তাদের কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ কালো, কেউ ফরসা। তাদের পোশাকেও পার্থক্য আছে। পুরুষেরা কেউ শার্ট-প্যান্ট করে, কেউ সাদা ফতুয়া-পাজামা পরে, আবার কেউ পরে পাঞ্জাবি। কারও মাথায় কিছু থাকে না, কারও মাথায় সাদা টুপি, আবার কারও মাথায় পাগড়ি। তেমনি মহিলারা কেউ পরে শাড়ি, কেউ শালোয়ার, আবার কেউ বোরখায়

সারা অঙ্গ ঢেকে রাখে। বাদল এসব দেখে আর অবাক হয়ে ভাবে, একজন মানুষ অন্যজনের থেকে এত আলাদা কেন?! সে তার বাবাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তার বাবা তাকে বোঝান, "দেখ, পশু-পাখির মধ্যেও তো কত পার্থক্য রয়েছে। বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার। আবার ময়না, টিয়া, কাক, হাঁস, আরও কত কী। তাই না? মাছও তো কত রকম, ইলিশ, রুই, কাতলা।"

ছোট্ট বাদল তার বাবার কথা মেনে নেয়। সত্যিই তো, সব প্রাণীর মধ্যেই ভেদাভেদ আছে!

ওর জানলার বাইরে একটা পেয়ারা গাছ আছে। সেখানে কত রকমের পাখির আনাগোনা হয়। কাক, শালিক, ফিঙে, টুনটুনি, চড়াই, আরও কত কী। কাকগুলো খুব কর্কশ শব্দে ডাকে। শালিক আর চড়াই খুব চেঁচামেচি করে। বসন্তকালে কোকিল গাছের ডালে বসে কুহু-কুহু করে ডাকে। খুব মিস্টি লাগে ডাকটা। অন্য সময়েও ডাকে, তবে তখন স্বরটা তত মধুর হয় না। সে শুনেছে, কোকিল অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার সময়ে সে অন্য পাখিটার একটা ডিম ফেলে দেয়, যাতে সে সন্দেহ না করে। আবার

যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়, তখন কোকিল তার ছানাকে নিয়ে পালিয়ে আসে। খুব বদমাশ হয় কোকিলরা!

জানলার ধারে শুয়ে-বসে বাদল আকাশটাকেও পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, আকাশটা যেন প্রকৃতির নিজস্ব একটা ক্যানভাস! সেখানে প্রকৃতি নিজের খেয়ালে রঙ-তুলি দিয়ে আঁকিবুকি কাটে। আকাশে কত রকমের মেঘের আনাগোনা দেখা যায়। কোনটা মোটা, কোনটা সরু, কোনটা লম্বা, কোনটা বেঁটে। সময়ের সাথে-সাথে তাদের আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। তাদের রঙেও তফাৎ আছে। একেকটা খুব কালো, একেকটা ধুসর, আবার একেকটা পেঁজা তুলোর মতই ধবধবে সাদা। আকাশের রঙটাও সবসময় একরকম থাকে না। দিনেরবেলায় ফেকাসে নীল দেখা যায়, সন্ধের সময়ে খুব নীলচে দেখায়। সে মায়ের মুখে শুনেছে, ভোরবেলাতেও নাকি আকাশ খুব নীল থাকে। তবে সে কখনও দেখতে পায় নি, কারণ ভোরবেলায় তার ঘুম ভাঙে না। বৃষ্টির দিনে সে খেয়াল করে দেখেছে, আকাশটা কেমন ধুসর হয়ে যায়! সে-ই সময়ে তার

নিজের মনটাও দুঃখে ভরে ওঠে। দিনে সূর্যমামার দিকে চাওয়া যায় না। আবার সন্ধ্যাকালে সে সুন্দর লাল গোলার আকার ধারণ করে। তখন তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় সে। ভোরেও নাকি ওইরকম দেখা যায়। চাঁদমামা বরাবরই সাদা। তবে তার আকৃতিটা একেক সময়ে একেক রকম। পূর্ণিমায় সে পুরো গোল। অন্য সময়ে চ্যাপ্টা অথবা বাংলা পাঁচের মত। আবার অমাবস্যায় তাকে দেখা-ই যায় না। অবশ্য মেঘে আকাশ ঢেকে গেলে সূর্য বা চাঁদ কাউকেই দেখা যায় না।

শুয়ে-বসে থাকতে-থাকতে তার মন একেক সময়ে খারাপ হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে বাবা-মা পাশে এসে বসেন। পাড়ার বন্ধুরা এসেও কিছুটা সময় তার সঙ্গে কাটায়। কিন্তু রাতে ঘুমের জন্য আট ঘন্টা বাদ দিলেও বাকী সোলো ঘন্টা এভাবে কাটানো সোজা ব্যাপার নয়। পড়াশোনা করে সময় কাটাবে, তারও জো নেই! ডাক্তারের পরামর্শে মানসিক পরিশ্রম করাও বারণ। তাই বাদল ভেবে ঠিক করেছে, সে ছবি আঁকবে। সারাদিন ধরে সে যা-যা দেখে কাগজের উপর তার-ই প্রতিকৃতি গড়ে তুলবে।

যেমন ভাবনা, তেমনই কাজ। বাবা-মায়ের কাছে নিজের ইচ্ছের কথা বলে সে ছবি আঁকার জন্য কাগজ, পেনসিল, রাবার, রঙ, তুলি সব আনিয়ে নিল। তারপর শুরু হ'ল তার আঁকিবুকি কাটা। প্রথম-প্রথম সে ছবি ভালো হ'ল না। রঙ থেবড়ে গেল। কিন্তু সে হাল ছাড়ল না। এক সময়ে আঁকার প্রতি অনুরাগ দেখে তার বাবা চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নিলেন। চিকিৎসক সম্মতি জানালে তিনি বাড়িতে একজন অঙ্কন টিচার রেখে নিলেন। টিচারকে সাবধান করে দেওয়া হ'ল যাতে তিনি তাকে মানসিকভাবে কোনরকম প্রেসার না দেন। টিচারের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে বাদল ধীরে-ধীরে একজন ভালো আঁকিয়ে হয়ে উঠল। তার আঁকা ছবি দেখে সবাই প্রশংসা করল।

এদিকে সে নিজেও অনেকটা রোগমুক্তির পথে। চিকিৎসকও ভেবে অবাক হলেন, আগে যে ছেলের রোগমুক্তির সম্ভাবনা অনেক কম ছিল, সে এখন প্রায় সুস্থ! এখন মস্তিষ্কের পরিশ্রম করতেও তার খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। সে একটু-একটু করে পড়াশোনা

করতেও শুরু করেছে। এখন সে বাড়ির বাইরেও একা চলাফেরা করছে।

এর কয়েক মাস বাদে বাদল পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল। এখন আঁকিয়ে হিসেবে তার অল্প-স্বল্প নামও হয়েছে। জেলার ভিতর ও বাইরের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তার অঙ্কন প্রদর্শিত হয়েছে। তার ছবিগুলো খুব সিম্পল হয়। তাতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, প্রকৃতি, পশু-পাখি বেশী গুরুত্ব পায়। ছবিগুলি দেখে সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি অঙ্কনবোদ্ধারাও প্রশংসা করে বলেন, "এ ছেলের হবে।" ছবির প্রতি ওর এত অনুরাগ দেখে মা মাঝেমধ্যে খুঁতখুঁত করলেও ওর বাবার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তাই তিনি নিজের স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেন, "দেখে নিও, এ ছেলে-ই একদিন পাবলো পিকাসো, ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ বা যামিনী রায়, গনেশ পাইনের মত বিখ্যাত আর্টিস্ট হয়ে উঠবে।"

অপয়া

সমাজ বসু

--- যাবার আগে আর একবার ভাল করে ভেবে নে। আমার মনে হয়, তোর সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

--- তুমি কি বলছ মা? এইসময় তাঁর পাশে দাঁড়ানোর খুব প্রয়োজন। পরশু তাঁর অসুখটা ধরা পড়েছে। কাল বিকেলে সমবায় সমিতিতে খবরটা পেলাম। সেই থেকে আমি ঠিক থাকতে পারছি না। আমাকে একবার সেখানে যেতেই হবে। সুলেখা নিজের অভিমত প্রকাশ করল।

--- এখনতো সেই বাড়িতে যাওয়ার তোর কোন অধিকার নেই। তবু যাবি? মায়ের জর্জরিত প্রশ্ন ।

--- হ্যা, একবার যেতেই হবে। এই পরিস্থিতিতে আমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না। এতটা অমানবিক হতে বোল না। কথাগুলো বলতে বলতে কিছু টাকা পার্সে ভরে নিল সুলেখা।

--- জানি না, সেখানে তোকে আরো কত অপমান সইতে হবে। তাছাড়া তোরও যদি কিছু হয়? মেয়ের জন্য একরাশ চিন্তা ঝরে পড়ে বিভা দেবীর।

--- এখন থাক্ না ওসব কথা। আমি আসছি। সাবধানে থেকো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সুলেখা।

--- ছমাস পর আবার এই বাড়িতে পা রাখল সুলেখা। মানুষটা চলে যাবার পর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এই বাড়ির মানুষজন। অনেক অপমান। অনেক অবহেলা। মনে পড়তে না পড়তেই দরজা খুলে গেল।

--- একি তুমি? ভীষণ অসুস্থ বিধ্বস্ত সত্তর বছরের বৃদ্ধার প্রশ্ন।

--- কালই খবরটা পেলাম। আর থাকতে পারলাম না। তাই সব নিষেধাজ্ঞা ভেঙে চলে এলাম। তাছাড়া এই পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে মানুষকেই থাকতে হবে।

--- তবু, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেন এলে? পরশু থেকে পাড়া প্রতিবেশী কেউ উঁকি পর্যন্ত মারছে না। এমনকি নিজের ছেলে মেয়েরাও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার পাপের শাস্তি আমাকে পেতে দাও।

অপয়া তুমি নও।আমিই এক অপয়া অভাগী মা। তা নাহলে ছেলের মৃত্যুর পর তোমার মত এক দেবীকে তাড়িয়ে দি। আমায় তুমি ক্ষমা করো,বৌমা। বৃদ্ধার দুচোখ ভর্তি জল।

--- একি বলছ মা। অসুস্থ থাকাকালীন তোমার ছেলে বলেছিল, আমি না থাকলে মাকে দেখো। তোমাকে এখন দেখতেই হবে। এ আমার দায়িত্ব। দেখছ না,ফটোয় তোমার ছেলের মুখে কেমন শান্তির ছায়া।

চোখের জলে স্বামীর ছবিটা আবছা লাগে। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নেয় সুলেখা।

লুকোচুরি

শম্পা রায়

“দাদা তোমার নাম কী?”---প্রশ্ন শুনে তিনবছরের খোকা ঘন পলকের নিষ্পাপ চোখ মেলে বৃদ্ধার নিদন্ত মুখের দিকে তাকায়। তিনি ওর কপালে চুমু দেন, “বল, আমার নাম সূর্য।” সূর্য চুপ। উলটে, তুলোর মতো ফুলো ফুলো নরম হাত দিয়ে বৃদ্ধার গলা জড়িয়ে হাসতে শুরু করে---কেউ যেন কাতুকুতু দিয়েছে। হঠাৎ বড় বড় চোখদুটো গোলগোল করে আধো উচ্চারণে বলে, “তোমার নাম কী?” শিশুর কৌতূহলে বৃদ্ধা একটু থতিয়ে যান। নিজের নাম মনে করতে গিয়ে কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেল। “বল, আমার নাম বম--মা।” প্রশ্নকর্তাই উত্তর যুগিয়ে দেয়।

দুপুরবেলা। ঘুমন্ত সূর্যকে কোলে নিয়ে বৃদ্ধা ভাবেন, প্রায় বিরানব্বই হল তার। বেশিরভাগ জিনিসই এখন ভুলে যান। তা বলে নিজের নামটাও? না,না, এ তো সাংঘাতিক ভুলোপনা! মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ছেলে ডাকে মা, বউমা তেমন কিছু বলে না, নাতি-

নাতবউদের ঠাম্মা। আর সূর্য? তার একটাই বুলি। যখনই দেখ, বম্মা। বাবা-মাকেও তেমন আঁকড়ায় না ও। স্বামী? নাহ্, তিনিও কখনো নাম ধরে ডাকেননি। অবশ্য তার সঙ্গে ক' দিনই বা থাকা হল? "আচ্ছা, আমার নাম ধরে ডাকো না কেন?" একবার স্বামীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। "দামী আর প্রিয় জিনিস খুব যত্নে সাবধানে আগলাতে হয়।" হাসি চেপে গম্ভীর লালচে মুখে স্বামীর মন্তব্য।

বৃদ্ধা ক্রমশ গভীর স্বপ্নে ডুবে যাচ্ছেন। কী নাম ছিল তার? সুন্দর, বেশ অন্যরকম ...। সূর্য তার নাতির ছেলে··· মানে চতুর্থ প্রজন্ম। তিনি প্রথমে মেয়ে, তারপর স্ত্রী···মা···ঠাকুমা···দিদিশাশুড়ি···বম্মা। সাদা ভ্রূ-অক্ষিপল্লব সাজানো চোখে, মাকড়সার জালের মতো বলিরেখা ভরা, ঝুলঝুলে চামড়ায় মোড়া শরীরটা দেখে ভাবেন, শুকনো কাঠের মতো হাড় ক' খানা এবার আগুনে দিলেই হয়। কিন্তু নিজের হাতে কি সবটা থাকে? এই দীর্ঘ আয়ু সারা জীবন কতভাবে যে তাকে ছলনা করেছে। চোখ বন্ধ করে আবার খোলেন, মনের মধ্যে হাতড়াচ্ছেন···নিজের নাম··· পরিচয়---কখনো ছিল কি আদৌ?

এই তো, গেল বছরের কথা। বড়নাতি কানাডা থেকে এসেছে। বাড়িতে তাই সত্যনারায়ণ পুজো। দুপুরের খাওয়াদাওয়া চুকতে চুকতে প্রায় বিকেল। এক নাতবউ পা টিপে দিচ্ছে; আরামে ঢুলতে ঢুলতে অস্ফুটে প্রাণভরে তাকে আশীর্বাদ করছেন। হঠাৎ ছোটনাতি হেসে জিজ্ঞাসা করে,

"ও ঠাম্মা, কে পা টিপে দিচ্ছে জান?"

"তোর বউ।"

"না ঠাম্মা…বউদি।"

"বাজে বকিস না" তিনি বিরক্ত হয়ে মৃদু ধমক দেন, "আমার জন্য সে বউয়ের সময় কোথায়?"

তখন স্বরাজ ---তার ছেলেও সায় দেয়, "হ্যাঁ মা, ও তোমার বড় নাতবউ।"

অনেকগুলো দিন···মাস···বছর পৃথিবীতে কেটে গেল। শৈশব-কৈশোরের সেই আলোমাখা সময়টুকু ছাড়া বাকি জীবন যেন দীর্ঘ একটা সুড়ঙ্গ---আলো-বাতাসহীন, দম আটকানো। ছেলে-বউ, ছোটনাতি-নাতবউ আর একফোঁটা সূর্যকে নিয়ে তার ঘরোয়া জগতে ছেলেবেলা মানে এখন টুকরোটাকরা সাদা-কালো স্মৃতি। বড়নাতি কানাডায় বিরাট চাকরি করে। দুবছর অন্তর দুর্গাপুজোয় সপরিবারে বাড়ি আসে। এবারও এসেছিল। তার জন্য নরম তুলতুলে চমৎকার শাড়িও এনেছে, যদিও সেটা তিনি কালেভদ্রে পরেন --- মাথা থেকে শুধু খসে খসে যায়। মাথায় হাত বোলালেন একবার। ভুট্টার রেশমের মতো গুছিকয়েক চুল। ছোটবেলায় আমরা এই রেশম জমাতাম··· তিনি ভাবেন। অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে বাপের বাড়িটা দেখতে পেলেন। টালির চাল, সুরকির দেওয়ালের একতলা বাড়ি, উঠোন নেই, পেছনে বেশ গাছগাছালি। বাবা ছিলেন দেশভক্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যে কতভাবে সাহায্য করেছেন! আর ভালোবাসতেন লেখাপড়া। মেয়েকে পড়ানোর জন্য তাই বাড়িতে মাস্টারমশাই রেখেছিলেন। সে যুগে এমনটা? কল্পনা করা যায় না। কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন, বইপত্র

তো তার কাছে বিষ। তাই পড়ার সময়টায় বাড়ির গাছগুলোর আড়ালে লুকানো, কখনো বা ভুট্টার রেশম দিয়ে মাথা ঢেকে বুড়ি সাজা; অবাক হয়ে ভাবতেন--- সত্যি সত্যিই একদিন এমন চেহারা হবে? সময় আজ জবাব দিচ্ছে --- তিনকাল কাটিয়ে থুরথুরে হয়ে নিজের বাচ্চাবেলাকে তন্নতন্ন করে সন্ধান করছেন তিনি… …।

"খুকি…খুকি…" মা ডাকছে, "আশু এসেছে। কোথায় গেলি?" আগেও দুদিন ফিরে গেছে আশুদা। বিরক্ত মা গজগজ করে, "চায় না যখন, তখন জবরদস্তি পড়ানোর কি দরকার… ছাড়ান দাও… ছেলে তো নয়, যে রোজগার করে পরিবারকে খাওয়াতে পরাতে হবে। মেয়েমানুষ… গাদা পড়াশোনা শিখে কি করবে, একটু বই পড়তে পারে, নাম লিখতে জানে, ব্যস মিটে গেল… বরং সেলাই, রান্না,পুজো করা এসব শিখুক…তা না। 'নিজের নাম' --- হ্যাঁ, ঠাকুরকেও নয়; এই মুহূর্তে এটাই তার একমাত্র চাওয়া। কিন্তু কোথায় যে হারিয়ে গেল!

দেশের সবার মনে, মুখে নামটা চিরস্থায়ী করে তোলার প্রেরণা দিত আশুদা---আশুতোষ মৈত্র। "জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমার সোনার ভারত শেষ করে দিল ইংরেজরা আর আমরা কিচ্ছু করতে পারছি না। পরাধীন দেশে গোলামের জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভালো।" রক্ত-ফোটানো কথা বলত সেই মানুষটা, "মাতৃভূমির কাছে আমরা ঋণী, শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তা শোধ করতে হবে। এই যে তুমি, পড়ার সময়ে পালিয়ে যাও, কী ভেবেছ মেয়ে বলে দেশের প্রতি কর্তব্য থেকে মুক্তি পাবে?" সে ফ্যালফেলিয়ে দেখত,

---"আমি? আমি কী করতে পারি?"

---"কী পার না?" বুঝিয়ে দিত আশুদা, "বিশাল ভারী কিছু না হলেও আমাদের চিঠিপত্র আনা-নেওয়ার কাজটা অন্তত…। কিন্তু তুমি ভীষণ ভিতু, তায় লেখাপড়া কর না…না, পারবে না।"

আজও বৃদ্ধা বিহ্বল হয়ে গেলেন। জীবনের প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য আশুদার কাছেই শিখেছিলেন। কতবার তার কাগজপত্র, এটা সেটা ওটা এদিক-ওদিক পৌঁছে

দিয়েছেন। ডানহাতের খবর বাঁহাত টের পায়নি। একবার কৃপাময়ী কালীবাড়ির পেছন দিয়ে বেরোবার সময় কাদায় পিছলে গিয়ে চিলচিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে দুই গোরাপুলিশ ছুটে এল, "কোথায় যাচ্ছ? নাম কী?" একমুহূর্তের জন্য ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল তার, পরক্ষণেই দেহাতিদের মতো হাঁ করে কান্না, "আমার নাম কেয়া।"

---"কেয়া? But ? নাম···নাম ... জলদি বল, নাহলে অ্যারেস্ট।"

---"কেয়া···আমার নাম। কেয়া জান না? একটা ফুল।" বলতে বলতে মন্দিরের পেছনের ঝাড়ালো শিউলিগাছের দিকে ইশারা করেন।

---"Oh, you want flower? " পুলিশরা হেসে, ডাল ঝাঁকিয়ে প্রচুর ফুল পেড়ে দিয়েছিল তাকে···টাটকা সাদা-কমলা শিউলির বড়সড় একটা পোঁটলা আঁচলে বেঁধে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন।

ঘটনাটা মনে পড়ে এখনও হাসি পেল। ইংরেজদের 'বাট' মানে 'কেয়া' …ভাগ্যিস শোনা ছিল! তা কেয়া নামটা খারাপ কি? সব জেনে চিরগম্ভীর আশুদা একটু হাসে, "দেখ, এসবে ভীষণ বিপদ, জীবনও যেতে পারে।" ---"জানি। যজ্ঞে প্রাণের আহূতি দিতেই হয়। আমি প্রস্তুত… আপনি কাজ বলুন।" এরকম কত সুযোগ এসেছে। প্রতিবার বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ভালো করে সবাইকে একবার তাই দেখে নিত সেই কিশোরী, যদি আর…। কালীবাড়ির ব্যাপারটার পর থেকেই তার জগত অতি দ্রুত বদলে যায়--- আশুদার দল এবং সব ক' টা অভিযানের এক অপরিহার্য অংশ তখন 'কেয়া' । একবার, শুধু একবারই অন্যরা তাকে কাজে নিতে চায়নি। "কেন, কেন" জিজ্ঞাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল সে। "না, খুব ঝুঁকির কাজ এ। তাছাড়া খবর পেয়েছি, শূওরের বাচ্চাগুলো তোমাকে দেখার অপেক্ষায় আছে।" ইংরেজদের জন্য এই খারাপ শব্দটা লেগেই থাকত আশুদার ঠোঁটে।---"সত্যি তাই? নাকি আমার যোগ্যতা নিয়েই সন্দেহ? আমাকে যেতে দাও, বিশ্বাস কর, কাজ শেষ না করে আমি মরব না।" সেদিন শেষপর্যন্ত মেয়েটি দায়িত্ব

পেয়েছিল। তার কর্মনিষ্ঠা, চোয়ালচাপা জেদ দেখে আশুদা সন্তুষ্ট, “ভালো, খুব ভালো অপূর্ণা।”

হ্যাঁ, অপূর্ণা! একমাত্র আশুদাই তাকে এ নামে ডাকত। দিদিমা-দাদামশাইয়ের আদরের ‘পূর্ণাকে’ লেখাপড়ায় অরুচির জন্য আশুদা বলতেন ‘অপূর্ণা’। তার জীবনের পরিণতির ইঙ্গিত ছিল নামটায়। কিন্তু কে যে গোপনে টিকটিকির কাজটা করেছিল…আচমকা আশুদার ঘরে হানা দিয়ে পুলিশ এক গুলিতেই তাকে…। কাজ সম্পূর্ণ করে এসে মনে হল, চির অপূর্ণা রয়ে গেল সে…জীবনের ধ্রুবতারা নিভে গেছে।

সময় গড়িয়েছে। দলের সঙ্গী-সাথীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। কয়েকজন অন্য দলে যোগ দেয়। প্রফুল্লদা---আশুদার ডানহাত, নীরাদিকে নিয়ে সংসারী হল। বাবা তাকেও নিশানাথের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। বিয়ের বিরোধিতা করার মতো সাহস তার আর ছিল না---মনটাই যে মরেছে। দেশের জন্য কিছু করতে না পারার ক্ষত বুকে চেপে ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল মেয়েটি।

কাক ডাকার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিশুতি রাতে নিশানাথ ফিরত। রোজই। "শোনো, আমি বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি, হপ্তাখানেক পরে ফিরব, তোমার ভয় লাগবে না তো?" মাত্র ছ' মাসের স্ত্রীকে এক রাতে কথাটা বলতেই, "আমি কাউকে, কিছুকে ভয় পাই না।" নিষ্কম্প স্বর অপূর্ণার। সেবার ফিরে আসার পর স্বামীর চঞ্চল হাবভাব দেখে উদ্‌বিগ্ন অষ্টাদশী বধূকে প্রশমিত করতে গুপ্ত মনোবাসনাটি জানিয়েছিল নিশানাথ, "জান, আমার জীবনের একটা মিশন আছে, একটা লক্ষ্য---নিজের দেশ…নিজের শাসন…কারোর গোলামী নয়…স্বাধীনতা… স্বরাজ।"

বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য-বিধেয় আবার খুঁজে পেল অপূর্ণা। উগ্রপন্থী দলের সক্রিয় সদস্য স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী ---বিপদ তখন প্রতি পদক্ষেপে তাদের নিত্য সহচর। স্বাধীন ভারতবর্ষ---শয়নে-স্বপনে-জাগরণে নিশানাথের বীজমন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার অপরাধে পুলিশ একদিন ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিল---বরানগরের ইংরেজ কালেকটরকে বোমায় উড়িয়ে দিয়েছে সে। এর সাতমাস পর পনেরোই আগস্ট…স্বাধীন ভারতবর্ষ…স্বাধীন ভারতবাসী…মিশন

সম্পূর্ণ···আশুদার···নিশানাথের। অপূর্ণারও। ---"ও দিদি, তোমার ছেলে হয়েছে··· কী নাম দেবে?" "---স্বরাজ।" মাতৃত্বের আনন্দে, সদ্য স্বামীহারানোর বেদনায় অপূর্ণা চোখের জলে ভেসে যায়।

এখনও চোখের কোটর ভিজে গেল বৃদ্ধার। এ জনমে তার আর পূর্ণা হওয়া হল না। কী চমৎকার গানের গলা ছিল! কিন্তু বাবার চাপে···। দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল আশুদা, কিন্তু তাকে ভালোবাসা-শূন্য জীবন দিয়ে গেল। নিশানাথের সঙ্গিনী হলেন··· সে-ই বা ক' দিন সঙ্গ দিল? নীরাদিকে বেশ ভালো লাগত। লালপাড় তাঁতের শাড়ি, হাতে শাঁখা-পলা, সিঁথিভরা সিঁদুর, কপালে বড় লাল সিঁদুরটিপ। এরকম রূপে তাকেও সংসার-ছেলেমেয়ে সামলাতে হবে; ভেবে লজ্জা হত। কিন্তু সে তো অপূর্ণা···। একমাত্র সন্তান স্বরাজ বরাবর ধীরস্থির, গম্ভীর, বুঝদার। তার জন্য মা হয়ে কখনো কোনো বেগ পেতে হয়নি। আর বউমাও মন্দ কিসে?

আসলে জীবন মানে বোধহয় মেনে চলা আর মানিয়ে চলা। এককালে বাবা, আশুদা, স্বামীকে মেনে চলতেন।

এখন পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে দিন চলে যাচ্ছে। তাই, চাকরি নিয়ে বড়নাতির বিদেশে চলে যাওয়ায় খুব কষ্ট পেলেও নির্বাক থেকেছেন। লেখাপড়া করলি এখানে, মানুষ হলি এদেশের ভাতে-জলে আর সেবা করতে যাচ্ছিস অন্য দেশের? ছেলের বোঝানো-পড়ানোয় ব্যাপারটা মানতে হয়েছিল তখন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাসপোর্ট অফিসের লোক বাড়ি এলে, তাকে ঘুষ দেওয়া---স্বরাজ সমর্থন করলেও তিনি পারেননি···ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। এই দিনটার জন্যই কি প্রাণ হাতে করে ঘুরেছি...এমন উত্তরসূরিদের জন্যই আশুদা, নিশানাথ নিজেদের জীবন দিল? যে স্বরাজের মা বলে এত···এত বছর ধরে ঘরে-বাইরে লোকে চেনে-জানে, এই কি সেই ছেলে?

সূর্যবাবুর ঘুম শেষ। উঠেই একগাল ঝলমলে হাসি দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে---বম্মা। ছোট্ট একটুখানি ডাক বৃদ্ধার মনের সমস্ত মলিনতা ব্লটিংপেপারের মতো শুষে নিল। নাহ্, এই আনন্দটুকুই বা কজন পায়! বুঝলেন, লুকোচুরি খেলতে খেলতে জীবন তাকেই জিজ্ঞাসা করছে, কে গো তুমি···পূর্ণা···নাকি অপূর্ণা···।

অন্নপূর্না

পূর্বা ঘোষ

অন্নপূর্না, তোকে আজ আর কাজ করতে হবে না। মাজা বাসন গুলো কলতলাতেই রেখে দে। আমি পরে জলে ডেটল গুলে ওগুলো ধুয়ে নেব। আর শোন, এখন কাজে আসার দরকার নেই । ঐ করোনা টরোনা সব মিটুক তারপর আমি তোকে ফোন করব তুই চলে আসবি, ঠিক আছে? আর হ্যাঁ, মাস শেষ হলে মাইনেটা নিতে আসিস। ঐদিন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকবি আমি বাইরে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসব। তুই কিন্তু গেট ছুঁবি না। লোহাতে অনেকক্ষণ করোনা বেঁচে থাকে ।” অন্নপূর্না বলতে চেষ্টা করল ” আমার তো করোনা হয়নি কাকীমা তাহলে…….”। অমিয়াদেবী অন্নপূর্না কে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বললেন ”দেখ আমরা দুই বুড়োবুড়িতে এখানে থাকি। ছেলেমেয়েরা কেউ এখানে নেই। আমাদের যদি ঐ সব অসুখবিসুক হয় আমরা কি বাঁচব? তুই-ই বল? টিভিতে দেখছিস তো যত মরছে সব বুড়োবুড়ির দল।”

রাগে শরীরটা জ্বলে গেল বুড়ির কথা শুনে। ওর যেন বুড়োবুড়ির গায়ে করোনা ছড়ানোই একমাত্র কাজ। মরুগগে যাক ভালোই হল আরামে থাকা যাবে তবে এখন তো বলছে কাজ না করেও মাইনে দেবে। বিশ্বাস তো হয় না, দু একটা বচন দিয়ে কাজটা ছেড়ে দেবে নাকি? অন্নপূর্নার বচনের ধার তো জানোই বাপু। এ পাড়ার সবার ঐ কুন্ডুলির খবর অন্নপূর্নার জানা। হেঁশেলের খবরই বলো আর গোপন গল্পই বলো কিছুই জানতে বাকি নেই এই ভদ্দরনোকেদের। ঐ অমিয়াবুড়ি এমন ভাব দেখায় যেন ছেলে মেয়েরা এসে পাকে পাকে দেখে যায়, এদিকে তো ছয়বছর অন্নপূর্না ওদের বাড়ী কাজ করছে কোনদিন তো ছেলেমেয়েদের টিকিটিও দেখল না। থাক্, আজ চুপ করেই থাকি। দিন তো পড়েই রইল শোনানোর জন্য। এমনিতেই ওদের মহল্লার লোকজন বলে 'দেখতে মা অন্নপূর্নার মতোই হলে কি হবে মুখ তো নয় যেন করাৎ, যেতেও কাটে আসতেও কাটে' । বারবার তাই বিয়ে ঠিক হয়েও বিয়ে হয় না, ভাংচি পরে, পাড়ার লোকজন ওর ধারালো মুখের কথা বলেই ভাংচিটা দেয়। বিয়ে হচ্ছে না বলে মা তো রোজ যাতা বলে। বলে "মুখটা একটু বন্ধ রাখতে পারিস না আন্না? এই মুখের কথার জন্য

কত নিন্দা করে লোকে, বিয়ে ভেঙে দেয়। বিয়ের বয়স পেরিয়ে সতেরোবছর হতে চলল, সব শুধু তোর এই মুখের জন্য" । মন ভালো থাকলে মায়ের কথা ও চুপচাপ শুনে যায় আর না থাকলে একেবারে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। কাউকেই থামানো যাবে না।

ঐদিন আন্নার মার মুখ ফসকে বেড়িয়ে গেছে "নিজে যে একটা ছেলে জুটিয়ে বিয়ে করবে সে মুরোদও তো নেই, ছেলেরা তো তোকে দেখলে দশ হাত দূর দিয়ে যায়, কেনরে কেন? ভগবান রূপ তো কিছু কম দেয়নি।" সেদিন রাগের চোটে বাক্স প্যাঁটরা ভেঁঙে, চালডাল ছড়িয়ে আরও যা যা কান্ড ঘটিয়েছিল অন্নপূর্না যে তারপর থেকে মা আর বেশী বিয়ের কথা বলে টলে ওকে আর ঘাঁটায় না।

তবে ওর মায়ের কথাটা একদম হক্ সত্যি। দু বছর আগে পাশের পাড়ার নন্দকিশোর, সবাই ঐ নন্দু বলে ডাকে আরকি। ওর পিছন পিছন খুব ঘুরছে দেখে অন্নপূর্না ওকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করল যে "কেস টা কি?"

তা ব্যাটা বলে কিনা “তোর মতো এত সুন্দর মেয়ে কুনদিন দ্যাকি নি, রাতের সপ্নোতেই শুধু তুর মতো সুন্দর মেয়েকে দ্যাকা যায়। চল্ একদিন কুথাও থেক্কে ঘুরে আসি আর দুখান মনের কথা বলে আসি।” অন্নপূর্না ভাবল শুনেই দেখিনা মনের কথাটা কিরকম।

“ঠিক আছে কালই শোনব খনে তোমার কথা, কখন নে যাবে আগে থেকে বলো আমাকে আবার আমার কাজের বাড়ীর সব কাজ সেরে রেখে যেতে হবে তো।”

পরদিন নন্দুর সাথে অন্নপূর্না চলল নন্দুর মনের কথা শোনার জন্য। তা দ্যাখে নন্দু নিয়ে গেছে এক হলে। বই চলছে কিনা “ধূম টু” । খুব খুশী হল অন্নপূর্না। হিন্দী সিনেমা দেখতে ওর খুব ভালো লাগে। মনে মনে ভাবল ‘ছোঁড়াটা মন্দ নয়।’ নন্দুর সাথে হলে ঢুকে হাতরে হাতরে গিয়ে বসল ঐ উপরের দিকে কোনের এক চেয়ারে। সিনেমা শুরু হয়ে গেছে। হৃতিক রোশন বইটার নায়ক। আর অন্নপূর্নারও নায়ক। সিনেমা একদম জমে গেছে, উঃ একদম ফাটাফাটি বই। তখন

নায়কের সাথে ঝারপিটের চরম সময়, উত্তেজনায় দাঁতে নোখ কাটছে অন্নপূর্না, এমন সময় যেন একটা হাত ওর কাঁধের ওপর মনে হচ্ছে। নন্দুর হাত, মারামারি দেখে ভয় পাচ্ছে নাকি! পুরুষ মানুষের আবার ভয়! ছ্যাঃ। অন্নপূর্না হাতটা সরিয়ে দেয়। কিন্তু বারবার হাতটা ওর কাঁধে উঠে আসতে থাকলে ও খুব বিরক্ত হয়ে বলে "এতই যখন ভয়, বলি তখন এই ঝারপিটের সিনেমা দেখতে আসা কেন, হ্যাঁ?" "

"আচ্ছা আমি কি ভয় পাচ্ছি বলে তোর গলা জরিয়ে ধরছি? বোকা, আমি তো আদর করে ধরছি রে…. তাও বুঝিস না!"

"আমার ভালো লাগছে না। তুমি কি বলবে বলেছিলে তাই বল।"

"দাঁড়া না এত তাড়া কিসের? সিনেমাটা দেখ তারপরে বলবোখন।" বলে নন্দু ওর গলা জরিয়ে ধরে টেনে বসালো।

“আমার গলা ছাড়” বলে অন্নপূর্না সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। “চুপ কর , চুপ কর” বলে নন্দু ওর হাত চেপে ধরে। ব্যাস কোথায় যাবে অন্নপূর্না চিৎকার করে বলতে থাকে “এই ছেলেটা সিনেমা হলে নিয়ে এসে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে, আমার গলা জড়িয়ে ধরছে.........” । হলে আলো জ্বলে ওঠে লোকজন নন্দুকে এই মারে তো সেই মারে। কোনমতে নন্দু এ যাত্রায় পালিয়ে বাঁচে।

এই খবর মহল্লায় ছড়িয়ে যাবার পর থেকে এই মহল্লা তো বটেই আশেপাশের মহল্লার ছেলেরাও ওর দিকে তাকাতে ভয় পায়।

অন্নপূর্নাকে ওর মহল্লার লোকরাই হোক বা কাজের বাড়ীর লোকজন কেউই বেশী ঘাঁটায় না, তবে ওর কাজ ওর মুখের মতো পরিষ্কার আর কাজের ব্যাপারে কিছু বলতে হয় না আর কামাই একদমই করে না তাই বাড়ির কাজের লোক হিসাবে ওর হেবি ডিম্যান্ড।

এই সব কিছুই ভাবতে ভাবতে অন্নপূর্না হন্ হন্ করে পরের কাজের বাড়ীর দিকে হাঁটতে থাকে।

বৃষ্টিদিদি খুব মনখোলা দরাজ মানুষ। সবসময় ঝরঝর ঝমঝম রিমঝিম করে বৃষ্টির মতোই হাসা আর কথা বলা চলছে। বৃষ্টিদিদির তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে নদী ভীষণ দুষ্টু। ওরা অন্নপূর্ণাকে ভালো কিছু খাবারদাবার বাড়ীতে আসলে বা রান্না হলে না দিয়ে খায় না। দাদাবাবু মানে বৃষ্টি দিদির বর কি সব সাপ্লাই এর কাজ করে। কাঁচা পয়সা। প্রতিদিনই বাড়ীতে অঢেল খাওয়া দাওয়া চলে। অন্নপূর্ণাকে বেশ ভালোবাসে। কিন্তু এখন? এই অবস্থায়? ওরাও কি বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না?

দ্বিধা নিয়ে অন্নপূর্ণা বৃষ্টিদিদির বাড়ীর সামনের দরজায় গিয়ে দাড়াঁয়। ইতস্তত করতে করতে ডেকে ফেলে বৃষ্টিদিদিকে,বাড়ীর মধ্যে ঢুকবে কিনা জানার জন্য বৃষ্টিদিদি ঘর থেকে বেড়িয়ে আসল " আরে অন্নপূর্ণা তুই এসে গেছিস? শোন বাইরের কলতলায় সাবান, মাস্ক আর আমার একটা পুরোনো নাইটি রাখা আছে ভালো করে হাত ধুয়ে , জামাকাপড় ছেড়ে মুখে মাস্ক পড়ে ঘরে আয় তারপর কাজে লেগে পর আমি

রান্নাঘরে গেলাম" । দিদির কথামতো জামাটামা ছেড়ে ঘরে এসে ও কাজকর্ম করতে শুরু করল।

"লকডাউন শুরু হয়ে গেল, তুই কোথায় কি করবি দুপুরে আমার এখানেই খেয়ে নিস।

"ঠিক আছে দিদি।" অন্নপূর্ণা খুব খুশী হল। কেউ তো অন্তত তাকে মানুষ মনে করে সন্মান করেছে। অন্য বাড়ীতে তো ওকে এমনভাবে অচ্ছুত মনে করছে যেন ও একটা কুকুর যাকে যখন ইচ্ছা দুরছাই করে তারিয়ে দেওয়া যায় আর দরকার পড়লেই ডাকা যাবে অথবা ও যেন করোনা বয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের বাড়ীতে দিয়ে আসছে। নিজেকে এত ছোট মনে হয় এদের কাছে যে তা বলবার নয়।

বৃষ্টিদিদির বাড়ী কাজ সেরে খেয়েদেয়ে অন্নপূর্ণা সেনকাকুর বাড়ী গেল। সেনকাকুর আবার কি মত হয় দেখা যাক।

"শোন অন্নপূর্ণা এই মাসটা না তোকে আসতে হবে না আমাদের বাড়ী, এই গলির ভিতরেই ঢুকবি না তুই।

পাঁচ বাড়ী কাজ করে বেড়াস কোথা থেকে কি হয় কে বলতে পারে। তোর জন্য কিছু হলে তখন পাড়ার লোক তো আমাদেরই পাড়া ছাড়া করবে।" সেন কাকু এতগুলো কথা একসাথে বলে নিঃশ্বাস ছাড়লেন। "আমি নাহয় ঢুকব না এই পাড়াতে কিন্তু তুমি যেরম লোক তোমার করোনা হবেই হবে দেখে নিও।বেশী বেশী ভদ্দরনোকদের সাথে মেশো যে। ঐ সব ভদ্দরনোক বড়নোকদেরই তো করোনা হচ্ছে।আমাদের মতো ছোটনোকদের তো আর হচ্ছে না।" দুটো কথা শুনিয়ে এবার একটু শান্তি এল মনে।

এখন ভালোই হয়েছে অন্নপূর্ণার, শুধু বৃষ্টিদিদির বাড়ীতে কাজ করে, খায়দায় আর বৃষ্টিদিদির কাছে নাম সই করা প্র্যাকটিস করে। তারপর বাড়ীতে এসে একদম আরাম।

লকডাউনের এই সময়ে ওদের মহল্লায় চারিদিক থেকে সাহায্য আসছে। কত মানুষ, কত দল, কত গোষ্ঠী থেকে চাল, ডাল, রান্নার তেল, আলু , হাতধোয়া সাবান, মাস্ক, ইত্যাদি দিয়ে যাচ্ছে। ওদের মহল্লায় সবাই খুব গরীব, দিন আনে দিন খায়, বাড়ীর পুরুষরা

ভ্যানরিক্সা চালায়, মোট বয়ে, তারপর ফুচকা, চা এইসব বিক্রি করে রোজগার করে আর মেয়েরা লোকের বাড়ী বাড়ী ঠিকে ঝি এর কাজ করে।

অন্নপূর্নাদের সংসারে মা আর মেয়ে। দুজনেই লোকেদের বাড়ী বাড়ী ঠিকে ঝি এর কাজ করে। এখন মায়ের ও সব বাড়ী কাজ বন্ধ। মা এখন শুধু খোঁজ নিয়ে নিয়ে বেড়ায় কোথায় কোথায় দুঃস্থদের জন্য চাল ডাল বিলি করা হচ্ছে। খোঁজ পেলেই সেখানে চলে যাচ্ছে আর চালডাল নিয়ে চলে আসছে। রেশন থেকেও চাল আটা ডাল সব কিছু দেওয়া হচ্ছে। মা সেখান থেকেও লাইন দিয়ে সবকিছু নিয়ে আসছে। অন্নপূর্নার মা তো খুব খুশী লকডাউন হবার পর। প্রথম প্রথম বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন তো বেশ আরাম সুখ বলেই মনে হচ্ছে। বাড়ী বাড়ী কাজ করতে হচ্ছে না, কাজ ঠিক না হলে কারোর মুখঝামটা শুনতে হচ্ছে না। এদিকে খাবার দাবার তো বেশ কয়েক মাসের জন্য মজুত হয়ে গেছে। এক বছর এরকম চললেও কোন ক্ষতি নেই মনে হচ্ছে। অন্নপূর্না আবার এই বাজারে একবেলা খাবারের ব্যবস্থাও করে

ফেলেছে, উহু মেয়েকে যতটা বোকা ভাবে কালীদাসী এখন দেখা যাচ্ছে ততটা বোকা ঐ মেয়ে নয়।

মাসখানেক হয়ে গেল লকডাউন শুরু হয়েছে। এই মাসখানেকের মধ্যেই অন্নপূর্নার চেহারায় আরও বেশ চেকনাই এসেছে। মানে সকলেই তাই বলছে আরকি! কিন্তু আজকাল বৃষ্টিদিদির চেহারাটা কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগে। নদীও একটু যেন রোগা হয়ে গেছে। বৃষ্টিদিদিকে বললে বলে “আরে করোনার জন্য খুব ভয় পাই রে। বাড়ীতে ছোট্ট বাচ্ছা, তোর দাদাবাবুকে মাঝে মধ্যে বেড়তেই হচ্ছে, অনেক জায়গা থেকেই টাকাপয়সা পাওনা আছে সেগুলো তুলতে যেতে হচ্ছে। যাওয়াই সার কাজ কিছুই হচ্ছে না। আর কি করেই বা দেবে, কার হাতেই বা এই সময় টাকা আছে! কিন্তু দেখ আমরাও তো টাকা পাই আমাদেরও তো দরকার, তাই ওকে যেতেই হচ্ছে।”   “কিন্তু এই যে তোর দাদাবাবু বাইরে যাচ্ছে, কত লোকের কাছাকাছি আসছে , কি করে জানবে বল কার কি অসুখ আছে? তাই আমি খুব ভয় পাই রে, ঐ ভয়ে ভয়েই চেহারাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর নদী দেখ সারাদিন বাড়ীর মধ্যে, কোথাও বেড়োতে পারছে না, খেলতে যেতে

পারছে না, ওর মনের ওপর একটা চাপ পড়ছে না বল?”

অন্নপূর্ণা ভাবল দিদিতো ঠিকই বলেছে, এই যে ও নিজে বাইরে বেড়তে পারছে বলে মনটা বেশ ভালোই আছে। আজ যদি ওকে ঘরের মধ্যেই আটকে থাকতে হত তাহলে কি যে খারাপ ব্যপার হতো তা আর বলবার নয়, ওও ঐ রকম মনখারাপ করে থেকে রোগাপটকা হয়ে যেত।

আরও কিছুদিন যেতে যেতে অন্নপূর্ণা লক্ষ্য করল বৃষ্টিদিদিদের বাড়ীতে দুপুরের খাবার আর আগের মতো নয়। আগে মাছ মাংস ছাড়া রান্নাই হতো না। নিরামিষ কচ্চিৎ কদাচিৎ। আর পোলাও তো দুইতিন দিন পর পরই দিদি রান্না করত। বৃষ্টিদিদি তো পোলাওটা দারুণ রান্না করে। এখন প্রতিদিনই প্রায় নিরামিষ। আর তরকারিও ঐ একপদই। আবার কোনদিন শুধু ডাল আর আলুভাতে। নদীতো খেতেই চায় না। অনেকরকম গল্পটল্প করে দিদি ওকে খাওয়ায়।

সেদিন কাজ করতে করতে শুনতে পেল বৃষ্টিদিদি দাদাবাবুকে বলছে “চালও তো শেষ হয়ে আসছে এবার কি করে চলবে গো? দেখছো তো নদীর চেহারাটা কি হয়েছে! তোমার চেহারার হালটাও দেখেছো? কেউতো তোমাকে সহজে চিনতেই পারবে না গো” ।

“আমি তো ভেবে ভেবে কিছুই কূলকিনারা করতে পারছি না। কত টাকা খরিদ্দারদের কাছে পড়ে আছে, নতুন করে কোন সাপ্লাই এর অর্ডারও এখন নেই। জমানো সবকিছু দিয়ে বাড়ীটা তখন মনের মতো করে করেছিলাম। এখন তো দেখছি না খেতে পেয়ে মরতে হবে।”

বৃষ্টিদিদি বলতে লাগল “এখন রেশনে সবাইকেই চালগম দিচ্ছে, শুধু কাউন্সিলরের কাছ থেকে একটা স্লিপ লিখে আনতে পাললেই হল। তুমি কি যাবে একবার একটা স্লিপ লিখে আনবে।”

দাদাবাবু চুপ করে রইল। বৃষ্টিদিদিও চুপ করে রইল কথাটা বলে। অন্নপূর্না বুঝতে পারল দুজনেরই খুব মানে লাগছে কিন্তু ওরা কোন উপায়ও খুঁজে পাচ্ছে না।

এদিকে সেনকাকুর তো বটেই ঐ পাড়ার আরো দুজনের কিভাবে যেন করোনা হয়ে গেছে। সে কি অবস্থা ঐ পাড়ায়! সেনকাকুকে আর ঐ দুজনকে তো বাড়ীতে অ্যাম্বুলেন্স এসে তুলে নিয়ে গেল। পুলিশ ঐ পাড়া সব ঘিরে রেখে দিয়েছে। অন্নপূর্না মনে মনে বলল ‘এখন কি হল কাকু? আমাকে তো খুব বলেছিলে আমিই নাকি করোনা নিয়ে যাবো তোমার বাড়ীতে। আমি তো যাইনি তা তোমার কোথা থেকে করোনা হল? আমাকে কুকুরের মতো দূরদূর করে তারিয়ে দিয়েছিলে, এখন কেন পুলিশের পাহারায় আছে তোমার পাড়ার লোক? যাক্ গে বেশী কিছু বলব না ভালো হয়ে বাড়ীতে ফিরে এসো তাহলেই হল।’

সেদিন অন্নপূর্না বৃষ্টিদিদিকে বলেগেল পরেরদিন ও কাজে আসতে পারছে না।বৃষ্টিদিদি যেন একটু চালিয়ে নেয়।

পরদিন অন্নপূর্না চলে গেল কাউন্সিলের বাড়ী। ওর মা ওনার বাড়ী কাজ করে অনেকদিন থেকে। যখন ছোট

ছিল মায়ের সাথে ও যেত ওনার বাড়ীতে। উনি বেশ স্নেহ করেন ওকে, অন্নপূর্না দাদু বলে ডাকে ওনাকে। আর উনি মানুষের সুবিধা অসুবিধায় সবসময়ই তাদের পাশে থাকেন বলে এলাকার মানুষজনও ওনাকে খুব ভালোবাসে। বৃষ্টিদিদিদের সবকথা শুনে উনি স্লিপ লিখে দিলেন আর কথা দিলেন কাউকে এসব কথা জানাবেন না।

কাউন্সিলের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে অন্নপূর্না সোজা চলে গেল রেশনের দোকানে, ও টাকা নিয়েই বেড়িয়ে ছিল। ও এই জেদ নিয়েই কাউন্সিলর দাদুর বাড়ী গিয়েছিল যে যেভাবেই হোক সে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্লিপ নিয়েই ছাড়বে। রেশনের দোকান থেকে আনা চাল গম নিয়ে পরদিন সকালবেলা ও বৃষ্টিদিদিদের বাড়ীতে চলে এল আর বলল ও মায়ের মাইনা নিতে কাউন্সিলের বাড়ী গিয়েছিল, দাদাবাবুর বাড়ীতে ও কাজ করে জেনে উনি বললেন যে তোর দাদাবাবুর স্লিপটা আমার টেবিলে পরেই আছে, ওরা নিতেও আসেনা,তুই নিয়ে যা, ওদের দে, এবার ওরা যা ভালো বুঝবে তাই করবে।” আমার কাছে টাকা ছিল আমি একদম রেশন দোকান থেকে চালগম নিয়ে চলে এলাম। তুমি

আমাকে টাকাটা দিয়ে দিও পরে, আর শোনো রেশনটা তোমাদের আমিই এনে দেব, যখন আমাদেরটা আনতে যাবো তখন।"

সবকিছু দেখেশুনে বৃষ্টিদিদি কিছুই বলল না, কিন্তু বৃষ্টিদিদির চোখটা ছলছল করছিল, সমস্ত চালগম খুব যত্ন করে বৃষ্টিদিদি ঘরে তুলে রাখল।

এরমধ্যেই অমিয়াদেবী ফোন করলেন অন্নপূর্নাকে। কাকাবাবুর সব ওষুধ ফুরিয়ে গেছে।উনি এতটাই এখন অসুস্থ যে বাইরে যাওয়া ওনার পক্ষে সম্ভবই নয়। অন্নপূর্না যদি ওষুধটা এনে দিতে পারত তাহলে খুব ভালো হত। যাকে বলে ছুট্টে গিয়ে দৌড়ে আসা ঠিক তাই করেই ও সব ওষুধ পত্র এনে দিল কাকাবাবুর। কাকীমা যদিও ওকে গেটের বাইরে রেখেই সব ওষুধপত্র নিলেন তবে ওকে আশীর্বাদও করলেন খুব আর এও বললেন যে ও নাকি অমিয়াদেবীর সন্তানের মতো কাজ করেছে। এতটা আদর এতটা মর্যাদা পেয়ে অন্নপূর্না খুব খুব খুব খুশী হল।

সেদিন অন্নপূর্না কাজে আসছে তো দেখে যে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র থেকে চাল ডাল আলু দেওয়া হচ্ছে বাড়ীতে বাড়ীতে। ও দিদিমনিকে গিয়ে নদীর কথা বলে জানতে গেল যে নদীও চাল-ডাল পাবে কিনা? কারন নদীতো অঙ্গনওয়ারীতে যায়না,ও তো একটা প্রাইভেট ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। “নিশ্চয়ই পাবে, ওরা নিলেই হল।” অন্নপূর্না দিদিমনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে আসতে বুঝাতে থাকে “দিদিমনি, ওরা যদি নেবনা বলে তাহলে আপনি যেন বলবেন ‘যে আমার দেবার নিয়ম আমি দিয়ে গেলাম এবার ফেলে দেবেন না দান করে দেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার ‘। অঙ্গনওয়ারী দিদিমনিদের বিভিন্ন মানুষজন কে নিয়ে চলতে হয়, উনি বুঝতে পারেন বৃষ্টিদের মতো মানুষরা না খেতে পাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে আসলেও মুখ ফুটে কোথাও থেকেও কিচ্ছুটি চাইবেনা। তাই ওদের আত্মসম্মান বোধে যাতে আঘাত না লাগে সেই ভাবে খুব সন্তর্পনে কথা বলে চাল-ভাল আলু দিয়ে আসে আর পরের মাসেও দিয়ে যাবে একথা বলে রাখে।

এখন অমিয়াদেবীর বাড়ীর প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র অন্নপূর্নাই এনে দেয়, তবে ও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে

কাকিমাকে ডাকলে উনি এসে সব কিছু নিয়ে যান। এখন উনি অন্নপূর্ণাকে ভিতরে ডাকেন। কিন্তু ও যায় না, না রাগ করে নয়, ও বুজেছে সত্যি সত্যিই তো ওর থেকে রোগ তো ছড়াতেই পারে, পাঁচ জায়গায় ঘুড়ে বেড়ায় ও। আর একবার ঐ বিষ রোগ হলে ওদের তো বাঁচানোই যাবে না।

বৃষ্টিদিদির মুখটা এখন আর ততটা শুখনো দেখায় না। ওদের বাড়ীতে থাকার সময় কাজের অবসরে অন্নপূর্ণা নদীর সাথে খেলা করে, নদীও ওকে খুব ভালোবাসে। নিজেদের রেশন থেকে পাওয়া মুগডাল এনে দিয়ে অন্নপূর্ণা বলেছে নদীর জন্য আনলাম দিদি,তুমি না কোরোনা।নদীর প্রতি অন্নপূর্ণার ভালোবাসা দেখে বৃষ্টি অন্নপূর্ণাকে না করতে পারে না।

আজকাল অন্নপূর্ণার কাজ অনেক বেড়ে গেছে। লকডাউন কবে শেষ হবে কেজানে। সেই অমিয়া দেবীকে ওষুধপত্র কিনে দিয়ে আসার পরের দিন কাকিমা আবার ফোন করে ডাকলেন। অন্নপূর্ণা তো তারাতারি দৌড়লো কি জানি কি বিপদ হয়েছে ভেবে। গিয়ে শোনে কাকিমাদের পাশের যে বাড়ীতে ঠাকুমা

আর দশ বছরের নাতনি একলা আছে, ওর বাবামা লকডাউনের আগে কোথায় যেন গিয়েছিল এখনও ফিরতে পারেনি সেই বাড়ীর মুদীখানার জিনিসপত্র যদি এনে দিত অন্নপূর্না তবে ওদের খুব উপকার হত। আহা রে কত কষ্টে আছে ভেবে অন্নপূর্না সব এনেদিল। কয়েকদিন পর দেখা গেল ঐ পাড়ার যত অসহায় বুড়োবুড়ি, অসুস্থ, একলা থাকা মানুষ সবারই যার যখন যা কিছুই প্রয়োজন সব কিছুতেই অন্নপূর্না হাজির আর দশ হাতে সবার সব প্রয়োজনের জিনিস তাদের কাজে পৌঁছে দিয়ে সে সত্যিই ঐ পাড়ার অন্নপূর্না হয়ে উঠল।

বিবাহবার্ষিকী

মানসী গাঙ্গুলী

ছেলের সঙ্গে বউয়ের বনিবনা হচ্ছে না মোটে। ডিভোর্স অবশ্যম্ভাবী, শুধু সময়ের অপেক্ষা। রুবির খুব মনখারাপ। অথচ একদিন এই বউকে মেনে নিতে অসুবিধা হয়েছিল রুবি ও তার স্বামী প্রদীপের খুবই সঙ্গত কারণে। ছেলে তার সাহেবের মতো দেখতে, টকটকে গায়ের রঙ, ছ'ফুট লম্বা, সুন্দর নাক-চোখ, কিন্তু কেমন করে যে সে বেঁটে, মোটা, কালো নিতার প্রেমে পড়ল কে জানে। অবশ্য রূপ দেখে ছেলের বউ নির্বাচন করা খুবই নিম্ন রুচির পরিচয় তা জানে ওরা। তবু মনটা খুঁতখুঁত করে। একমাত্র ছেলে, বাবা-মায়ের কত স্বপ্ন তাকে নিয়ে, আর নিজেরাও তারা সুন্দর। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন তারা, "একটা ফুটফুটে মেয়ে ঘুরে বেড়াবে বেশ বাড়িতে" কিন্তু তা আর হল না। মনখারাপ নিয়েই বাবা-মা মেনে নিলেন ছেলের পছন্দকে। ছেলের সুখই তাদের সুখ আর কীই-বা তাদের চাইবার আছে এ বয়সে। আর

তাছাড়া রূপ দিয়ে কিবা আসে যায়? শিক্ষিত মেয়ে, স্বভাব ভাল হলেই তাকে ভালোবাসা যায়।

ছেলে বউ থাকে দূরে, ব্যাঙ্গালোরে, বছরে দু'বার আসে। বাবা-মা একবার গিয়ে মাসখানেক থাকে তাদের কাছে। এভাবেই ক্রমে হৃদ্যতা, পরে ভালোবাসা জন্মায় সেই পরের বাড়ির মেয়েটির ওপর। নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসত নিতাকে ওরা স্বামী-স্ত্রী। কাছে এসে থাকলে যা যা ভালবাসে তাই রান্না করে ওকে খাওয়াতো। সারাবছর চাকরির জন্য ওরা পরিশ্রম করে বলে বিছানাটুকু পর্যন্ত মা করে দিত। আহা থাক একটু বিশ্রাম করুক। নিতাও ওদের নিজের বাবা-মার মতই দেখত।

কত কথা খুবই মনে পড়ছে আজ। শ্বশুরবাড়িতে সবার সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে নিজের পছন্দ, ইচ্ছে সব জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল তাকে একদিন। মনের সব আশাগুলো একটু একটু করে শুকিয়ে গেল আর তাইতো নিতা এলে চাইত ও যেন খুশি থাকে। নিতাও চেষ্টা করত তার শাশুড়িকে খুশি করার। সাধারণত ওরা আসত আগস্টে। ওদের বিয়ের তারিখটা এখানেই কাটাত সবার সঙ্গে আর

আসত ডিসেম্বরে। আর রুবি ও প্রদীপ যেত এপ্রিলে, দু'মাস থাকত সেখানে। খুব আনন্দ হতো তখন। প্রতি উইকএন্ডে হয় ঘুরতে যাওয়া, নয়তো বাইরে খাওয়া-দাওয়া কিংবা শপিং। ছেলের সঙ্গেই ঘোরাঘুরি যা হতো তখন, নিজেরা দুজন আর বিশেষ বের হতো না ওরা। তো সেবারে ছেলেবউ এল হঠাৎ ফেব্রুয়ারির শেষে। সারপ্রাইজ ভিজিট। স্বভাবতঃই আনন্দটা একটু বেশিই হল রুবি ও প্রদীপের। ড্রয়িংরুমে বসে খানিক গল্পগুজবের মধ্যে ওরা জানাল শনি-রবি মিলিয়ে এক সপ্তাহের ছুটি ম্যানেজ করতে পেরেছে তাই চলে এল। এরপর চলল রান্না-বাজারের তোড়জোড়। নিতা হাঁসের ডিম খুব ভালোবাসে। প্রদীপবাবু বাজার যাবার সময় নিতা গোল গোল করে দেখালো হাত দিয়ে, মানে ওর জন্য হাঁসের ডিম আনতে হবে। সবাই হাসল, রুবি বলে, "ও তোর চিন্তা নেই, পাপু জানে তো"। এরপর পরোটা, সাদা আলুচচ্চড়ি দিয়ে জলখাবার খাওয়া হলে রুবি ওদের একটু গড়িয়ে নিতে বলে, কত ভোরবেলা উঠেছে।

ক'দিন বেশ আনন্দেই চলছে, নিতা আর সানি রোজ বিকালে ঘুরতে যায়। রুবি খুব খুশি হয়, "আহা অফিসের কাজের চাপে বেচারারা একটু ঘুরে

বেড়াতেও পারে না।" নিজের দামি দামি শাড়ি বার করে দেয় পরার জন্য। বলে, "এসব কি হবে, আলমারিতেই তো পড়ে থাকে। ওখানে ড্রেস পরিস, এখানে আমার শাড়িগুলো পর।" রুবি আবার নিজে সাজতে বা কাউকে সাজাতে খুব ভালোবাসে। নিতাকে পরিপাটি করে শাড়ি পরিয়ে দেয়, নিতা খুব খুশি হয়। আহ্লাদ করে বলে, "মামনি তুমি এত সুন্দর করে পরিয়ে দাও, আমার সামলাতে একটুও অসুবিধা হয় না।"

ফাস্ট মার্চ বাড়ির ছাদে ম্যারাফ বাঁধা শুরু হলে রুবি-প্রদীপ তে অবাক। কি হবে, তারা যে কিছুই জানে না। সানি বলে, ওরা ভালো চাকরি নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবার সময় বন্ধুরা ট্রিট দিতে বলে কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি, তাই পরদিন সেকেন্ড মার্চ রবিবার বন্ধুদের ডাকবে বলে। বাবা-মাকে বলা হয়নি বলে সরিও বলে তখন। রবিবার সকালে ইলেকট্রিশিয়ান এসে আলো দিয়ে বাড়ি সাজাল। সব মিলিয়ে ৭০-৮০ জন হবে, তাই বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা করেনি ওরা। ক্যাটারার রান্না খাবার দিয়ে যাবে সন্ধ্যাবেলায়। চেয়ার, টেবিল সব এসে গেল সকালবেলাতেই। সানি খুব ব্যস্ত দু'দিন ধরে, নিতাও

বাড়ির ভেতরে যতটা পারছে সাজাচ্ছে। ঘরে ঘরে ফুলদানি, কোথাও রজনীগন্ধা, কোথাও গোলাপ দিয়েছে। বাড়ি ফুলের গন্ধে ম ম করছে। অনেকদিন পর বাড়িতে বেশ খুশির আমেজ। রুবি-প্রদীপ দর্শক কেবল, যা করার ওরাই করছে। সব আনন্দের মাঝেও রুবির বুকের ভেতর একটু খোঁচা লাগছে, বারবার সে প্রদীপের দিকে তাকাচ্ছে। চোখে চোখে তাদের মনের কথা হয়ে যাচ্ছে। ৩৫ বছর একসঙ্গে ঘর করতে করতে দু'জনে দু'জনের চোখের ভাষা ভালোই পড়তে পারে।

দুপুরে একটু বিশ্রাম নেবার পর নিতা হৈ হৈ লাগিয়ে দেয়, "মামনি রেডি হও, পাপু রেডি হও" বলে। দু'টো প্যাকেট এনে দু'জনের হাতে ধরিয়ে দেয়। ওরা হতভম্ব। নিতা বলে, "আজ আমাদের বন্ধুদের ট্রিট দিচ্ছি, আর তোমাদের কিছু দেব না তাই হয়? এই শাড়ি জামাকাপড়গুলো তোমরা আজ পরবে। যাও, যাও, চটপট রেডি হয়ে নাও। নিতা নিজেও একটা শাড়ি কিনেছে নতুন, রুবিকে ধরেছে পরিয়ে দিতে। সাজগোজ কমপ্লিট হলে নিজের চুলে রজনীগন্ধার মালা লাগিয়েছে রুবির চুলেও লাগিয়ে দিয়েছে। ওদের ছেলেমানুষি রুবি-প্রদীপ খুব উপভোগ করছে তবু

বুকের ভেতর একটা কাঁটা ওদের খচখচ করেই চলেছে।

এ পর্যন্ত ওরা ছাদে ওঠেনি, একেবারে রেডি হলে নিতা ওদের ছাদেই থাকতে বলে আর নিজেরা ওরা দুজন ওপর-নিচ করছে প্রয়োজন মত। আস্তে আস্তে এক এক করে অতিথিরা আসলে নিতা ওদের ছাদে পাঠিয়ে দিচ্ছে। রুবি-প্রদীপ হতভম্ব। বন্ধু কোথায়, এত সব আত্মীয়-স্বজন? তাদের কাছে নিজেদের বিস্ময় চেপে রাখে ওরা সন্তর্পণে। কেবল নিজেরা চোখাচোখি করে, মানে কী ব্যাপার? নিচ থেকে শাঁখের আওয়াজে ওরা আরোই হতভম্ব। রুবির ভাইবউ রমা হাসতে হাসতে শাঁখ বাজাতে বাজাতে ছাদে উঠল। পিছনে কাজের লোকেরা সব ট্রে হাতে। রুবির বাপেরবাড়ি থেকে একেবারে বিয়ের তত্ত্ব এল। কাজের লোকেরা সেসব তত্ত্ব নিয়ে উপরে এল। কী নেই তাতে? শাড়ি, পাজামা-পাঞ্জাবি, প্রসাধনসামগ্রী, টোপর, মুকুট, ফুলের সাজ, মিষ্টির দোকানে অর্ডার দিয়ে একেবারে বিবাহবার্ষিকী লেখা সন্দেশ। এছাড়া আরও পাঁচরকম মিষ্টি, নোনতা, সব সব। এরই সঙ্গে নিতার বাপেরবাড়ি থেকেও একেবারে বিয়ের তত্ত্বের মত সবকিছু, মিষ্টি, জামাকাপড়, প্রসাধনী নিয়ে হাজির ওর

বাবা-মা। সবাই মিলে সমস্বরে "হ্যাপি অ্যানিভার্সারি" বলে ওদের শুভেচ্ছা জানায়। এতক্ষণ সবাই চুপচাপ ছিল। এটা নিতা আর সানির প্ল্যান, সবাইকে তেমনই বলে রেখেছিল ওরা সেকেন্ড মার্চ রুবি-প্রদীপের বিবাহবার্ষিকী। এবছর ওদের ৩৫ বছর পূর্ণ হল। ভোরবেলা ওরা দু'জনে ঘুম ভেঙেই দু'জনকে উইশ করেছিল আর ঠিক করেছিল ছেলে-বউকে কিছু জানাবে না। প্রদীপ রুবিকে বলেছিল, "ওরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দ করতে চাইছে করুক, ওদের আর কিছু বলার দরকার নেই। ওরা ফিরে গেলে আমি তোমার বিবাহবার্ষিকীর উপহার কিনে দেবো।" প্রতিবছর বিবাহবার্ষিকীর দিনে ওরা সন্ধ্যেয় বেরিয়ে মন্দিরে পুজো দেয়, প্রদীপ রুবিকে তার পছন্দমত শাড়ি কিনে দেয়, তারপর দু'জনে বাইরে খেয়ে বাড়ি আসে। আজ আর সেসব হবে না। মনে একটু দুঃখ ওদের হচ্ছিল ছেলের মনে পড়ল না বলে। একবারও ভাবেনি ছেলেবউ ওদের খুশি করতে এইসব ব্যবস্থা করছে। আসলে রুবি একবার নিতার কাছে দুঃখ করেছিল কোনদিন তাদের বিবাহবার্ষিকী পালন করা হয়নি বলে। নিতা সেটা মনে রেখেছিল আর তাই মামণি-পাপুর ছবি দিয়ে কার্ড ছাপিয়ে আত্মীয়দের ও বাবার বন্ধুদের বাড়ি

বাড়ি গিয়ে এক'দিন নিমন্ত্রণ সারতে বেরোছিল। ওরা টেরটিও পায়নি। লজ্জা পেল খুব, ওদের ভুল বোঝার জন্য। নিজের ছেলেকে এতদিনেও চিনলো না তারা? দূরে থাকলেও রোজ ফোন করে হাজার কাজের মাঝেও তাদের ভালো রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে।

আজ আবেগে দু'জন বিহ্বল। বুড়ো বয়সে টোপর পরে, মুকুট পরে, ফুলের সাজে সেজে মালাবদল হল ওদের আত্মীয়, বন্ধু সবার উপস্থিতিতে। কী লজ্জা, কী লজ্জা। এরপর খুব মজায়, হাসি, মশকরা, রসিকতায় কাটল একটা সন্ধ্যে। ভাল ক্যাটারার দিয়ে নৈশভোজের ব্যবস্থা, সবই হলো নিতার জন্য। সবাই খুব প্রশংসা করল ছেলে-বউয়ের। গর্বে, আনন্দে রুবির প্রাণ ভরে উঠল। মেয়ে নেই বলে দুঃখ ছিল খুব। বড্ড মেয়ে ভালবাসত। তা এ মেয়েতো বউ নয়, এ যে মেয়েই। মেয়ে ছাড়া মায়ের জন্য কেউ এভাবে ভাবতে পারে? নিতার ওপর রুবির খুব মায়া পড়ে গেছে। কিন্তু ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক তার আর মোটেই ভাল নেই, তাই তারা আলাদা হয়ে যাওয়াই স্থির করেছে। ওদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হলেও মন থেকে রুবি নিতাকে ত্যাগ করতে পারছে না কিছুতে,

যদিও নিতাকে ফোন করলে সে আজকাল ফোন ধরে না বা পরেও করে না। সেই মেয়েটা, যাকে সে নিজের মেয়ে করে নিয়েছিল আর তাদের মেয়ে হয়ে থাকবে না! রুবি খুব কষ্ট পায়, সারাদিনে কত যে চোখের জল পড়ে ওর, আর অবসরে স্বামীর কাছে প্রলাপ বকে। আর কার কাছেই বা বলবে! আর বলে ওর ভাইবউ রমার কাছে। বয়সে অনেকটা ছোট হলেও রুবি ও রমার মধ্যে বেশ সখ্যতা আছে। রুবি একটু নরম মনের মানুষ কিন্তু রমা রমা মানসিকভাবে বেশ কঠিন। পরিস্থিতি অনুযায়ী চলতে পারে ও। রুবিকে বোঝায়, "নিতাকে পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও সবাই আমরা মেনে নিয়েছিলাম সানির পছন্দ বলে। ওরা যদি দুজনে ভালো থাকে, তাই থাক। এখন সানির সঙ্গে যখন নিতার বনাবনি হচ্ছে না, দুজনে স্থির করেছে ডিভোর্সের, তখন আমরা মেনে নেওয়া ছাড়া কী-ই বা করতে পারি? বিশেষত নিতা ফোনও ধরে না যে ওকে বোঝাবে, ছেলের কাছে তো বলারই উপায় নেই। এ নিয়ে কথা বললেই ফোন কেটে দেয়। কাজেই নিজেদের সেইভাবেই মানিয়ে নিতে হবে।" "ওরা যত সহজে একটা মানুষকে নিজেদের জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে, আমরা যে তা পারি না", রুবি

কেঁদে ফেলে রমার কাছে। রমার কাছে বলা সহজ, কারণ সে তো আর ঘর করেনি ওদের সঙ্গে। রুবি-প্রদীপ বাবা-মা হয়ে রমার মতো কঠিন হতে পারে না। অবশ্য ওরা এতদিনে এটা বুঝেছে যে নিতার খুব ইগো প্রবলেম আছে। আর এই ইগোর ঠোকাঠুকিতে ওদের সম্পর্কটা আজ ভাঙতে বসেছে। একটু মেনে নিয়ে, একটু মানিয়ে নিয়ে চলতে হয় সংসারে। সে আর কাকে বোঝাবে? স্মৃতিরা সব ভিড় করে আসে, চোখ দিয়ে জল পড়ে অনর্গল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার নিতার বাবা-মাও ওদের বোঝাবার চেষ্টা করেন না! কিংবা হয়ত রুবির মতই অপারগ ওনারাও ওদের বোঝাতে।

ভাবে রুবি, "আমরা কত বুঝে চলেছি, মেনে নিয়েছি, আর এই একটা জেনারেশন পরেই এদের মানসিকতার কত পরিবর্তন। যে যার নিজের মত চলবে, কারও মতের তোয়াক্কা না করে।" তাই ডিভোর্স অবশ্যম্ভাবী। মিউচুয়াল ডিভোর্সের সমস্ত ফর্মালিটিস মেনে ওদের অবশেষে ডিভোর্স হল সেকেন্ড মার্চ, রুবি-প্রদীপের বিয়ের তারিখে।

যখন ঝড় আসে

বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দিন ও রাত যেন দুই অতিকায় অজগর - একে অন্যকে গিলে খেতে তারা পারঙ্গম ও বদ্ধপরিকর। গ্রীষ্মের গোধুলিবেলায় দিনের ম্রিয়মাণ আত্মসমর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করি যে শেষ আলোটুকুকে নাগপাশে বন্দী করে গিলে ফেলছে খাদক সন্ধ্যাকাশ। দূরে ঝিলের ধারে যেখানে বাসা বেঁধেছে গাছের পাখিদের আর্তনাদ, সেখানে নিঃশব্দে মারণরোগের মতো ছড়িয়ে পড়ছে অনপনেয় অন্ধকার। আকাশের গায়েও শেষ সন্ধের মুখে কালচে ক্ষতের মতো দেখা দিয়েছে মিশকালো মেঘ। ঝোড়ো হাওয়া জমাট বাঁধছে ধূসর কালো শত্রুসেনার মতো। বিধুর যাপনের বুকে তার আছড়ে পড়ার বেশি দেরি নেই।

ঝরা পাতাগুলি যেন স্বরবৃত্ত ছন্দে ভেসে ভেসে বাতাসের পংক্তি থেকে পংক্তিতে নাচছে। ধুলোদের মনে নতুন জমির বেহিসেবী দখলদারির লালসা।

তাদের এখন রণোন্মত্তভাবে ওড়বার সময়। জানলাগুলো যেন জীর্ণ সিমেন্টের জীবাশ্ম ভেঙে আছড়ে পড়তে চাইছে মুক্তির সন্ধানে। আমার গায়ে ঝাপটা মারছে এমিলি ডিকিনসনের ক'টা লাইনঃ

The Leaves unhooked themselves from Trees –
And started all abroad
The Dust did scoop itself like Hands
And threw away the Road.

চমক ভাঙল বাজ পড়ার শব্দে। এ তো শব্দ নয়, এ তো আর্তনাদ! এক কসাই যেন সভ্যতার সাজানো গোছানো সংসারকে শাণিত ছুরি দিয়ে কেটে তছনছ করে দিচ্ছে। কারুর ছাদে শুকোতে দেওয়া ওড়না উড়ে গেল ব্যর্থ প্রেমের গল্পের মতো। কোথাও টিনের চাল খসে পড়ল তাসের ঘরের মতো। কোথাও জানলার কাচ ভেঙে পড়ল দুর্বল সম্পর্কের মতো। কোথাও কেবল চ্যানেলের তার ছিঁড়ে গেল আকস্মিক গুপ্তহত্যার মতো। এমন ধ্বংসলীলা! তবু এতেই ঝড়ের আনন্দ।

ঝড়ের ক্ষতির শেষ নেই। ঝড় যখন থামবে তখন উপড়ে পড়া বৃক্ষ-শহীদের মাঝে প্রকৃতি হাহাকার করে উঠবে। আর কাল সকালে আমি, বলা ভালো, আমরা চূড়ান্ত উন্নাসিকতা দেখিয়ে শবদেহ ডিঙিয়ে অফিসের স্বার্থপর গলিতে ঢুকে যাব। সামান্য ঝড়-বৃষ্টির কাদার দাগ প্যান্টে লেগে থাকবে। সেটুকু তো থাকতেই হবে। সবকিছুর নির্মলীকরণ আমাদের পছন্দ নয়। আমরা দাগ ভালোবাসি।

আগামীকালের কথা ছেড়ে বর্তমানে ফিরে আসা যাক। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে ঝড়ের এই ঝোড়ো সাক্ষাৎকার শেষ হল। ঝড়ের প্রকোপ মন্দীভূত হতেই আকাশের সেতার বেজে উঠল। ঝমঝম ঝমঝম। যেন ঝড়াসুরের তাণ্ডবের পরে পবিত্রতা রক্ষার্থে শান্তিজল। আমরা ধ্বংসের পরে এইভাবে বৃষ্টিস্নাত হয়ে উল্লাস করে থাকি।

সাধারণত, ঝড়-বৃষ্টি হলে লোডশেডিঙে ডুবে যায় আমার বাড়িটা। এবারেও ব্যতিক্রম হয়নি। মনের ভেতরেও বুঝি বাতি নিভিয়ে যায় কেউ। একা একা শোবার ঘরে এসে ঢুকি। এই সময় কি মনে পড়ে

কারুর কথা? বৃষ্টির জমা জলে কাগজের নৌকোর মতো পুরনো স্মৃতিরাও কি ভাসতে থাকে? হয়তো তাই। আমার স্মৃতিকণারা নীরস, নিষ্করুণ ও নিরুপিত। পুরনো স্মৃতি চাবুকের মতো আঘাত করে। আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যাই ছেঁড়া বালিশের গদ্যে।

যে আমায় ছেড়ে গেছিল একদিন, যার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম নক্ষত্রলোকের সাগরতীরে, সেও বুঝি আজ আমার মতো ঝড়-জলের রাতে স্মৃতিকে আলিঙ্গন করে ফিরে আসে কাছে? সে কি জানে বৃষ্টির অসমীকরণের রাতে তার জন্য অপেক্ষায় আমি? সে কি জানে মাটির সোঁদা গন্ধে ভর করে পাঠিয়েছি মনখারাপের প্রেসক্রিপশান? সে কি জানে সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার জন্য ঝড় নয়, ভালোবাসাই যথেষ্ট? সে জানে এবং না জানার ভান করে। বলা ভালো, লুকিয়ে রাখে কষ্টের অপদ্রব।

এই বৃষ্টির রাত কেটে যাক। একদিন সে ফিরে আসুক স্মৃতিকথার ডানায় ভর করে নয়, বরং সশরীরে। তখন নাহয় অনন্ত রোদের পথে একসাথে হাঁটা যাবে। তার আগে পর্যন্ত... চোখে ঝাপটা দিক বালিঝড়।

মুখোমুখি

অদিতি ঘটক

ঋতম এক দৃষ্টে পরীটাকে দেখে যাচ্ছে। ভিক্টররিয়ার নরম সবুজ ঘাসের উপর গা এলিয়ে দিয়ে যেন কিশোরী কোলের ওম মাখতে মাখতে কত দিন পর একটা বিকেলকে তার পূর্ণ রূপ মেলে চোখের সামনে সন্ধ্যার আবছায়ায় ঢলতে দেখছে। পরীটা আস্তে আস্তে কালো রঙে মিশে যাচ্ছে। যদিও তার আগেই সমস্ত লাইট জ্বলে উঠে চারিদিক অতি আলোকিত করে সেই সান্দ্র আবেশটাকে নষ্ট করে দিল। যেমন এখানে ফিরে আসার ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে গেল। ঋতম তো জীবনটাকে এভাবে সাজাতে চায়নি ! কত মেপেজুপে হিসেব করে পা ফেলেছে। ছোটো বেলা থেকে কোনো দিনই আহামরি রেজাল্ট ওর দ্বারা হয়নি। সেই মেধা কোনো দিনই ছিল না। মেজেঘষে নিজেকে টেনে টেনে ওপরে তোলা। এভাবেই বি.কম, এম .কম।

আর মাধ্যমিক পাশ করেই বাড়ি, বাড়ি গিয়ে টিউশনি পড়ানো। পাড়ার মুদি দোকানি বাবার পক্ষে ক্যানসার আক্রান্ত মা, তিন বোনের বিয়ের খরচ জুগিয়ে ঋতমকে

উচ্চশিক্ষিত করা যে সম্ভব নয় তা 'ও' ওই বয়সেই বুঝে গিয়েছিল। পরীর দাদাকে পড়াতে গিয়ে পরীকে দেখেছিল ঋতম। কোনো কোনো সময় পড়ানোর সময় আসত। কোনো পড়া বুঝে নিয়ে চলে যেত। আসত যেমন নিঃশব্দে চলেও যেত সে ভাবেই। ডাগর চোখ গুলোয় যেন একটা ত্রস্ততা লুকিয়ে থাকত।

উত্তর বঙ্গের অনামি জায়গার আরও অনামি ছেলে ঋতম। বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি কিছু ভাবত না। ও জানত ওর পড়ার খরচ, শখ, আহ্লাদ ওকেই মেটাতে হবে। বাবা দু বেলা খেতে দিতে, স্কুলের জামা, প্যান্ট, টিফিন, মাইনে দিতে পারবে কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু পারবে না। সেই বাবাই একদিন সুদূর ময়নাগুড়ি থেকে চার ভাইবোনকে কলকাতা ঘোরাতে নিয়ে এল। একটা হোটেল ভাড়া করে বেশ কিছু দিন থাকা হল। মা খুব খুশি হয়েছিল। যদিও আসা হয়েছিল মায়ের চিকিৎসার জন্য। ঋতম এত কিছু ওই বয়সে বুঝত না। ওর চকচকে ঝকঝকে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর দেখে খুব আনন্দ লাগত। কোথায় ওদের টালির কি টিনের চালের খুপরি ঘর। কাদা প্যাচপেচে উঠোন। কতদূর গিয়ে তবে লঝঝরে বাস ট্রেন সে তো এই

প্রথম কলকাতা আসার জন্য। সবতেই অবাক চোখে গোলগোল ভাব। যেন গল্পে শোনা কোনো রূপকথার দেশ। সেই সময় রোজ বিকেলে ভিক্টররিয়ায় আসত। বিড়লা প্লানেটোরিয়াম, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা। মেট্রো রেল কত উজ্জ্বল স্মৃতি। মায়ের অসুখও যেন ভ্যানিশ হয়ে গেছিল। এখন সেই সব রাস্তার গায়ে, আশেপাশে কত পরত চেপেছে। কত কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই পুরনো সাবেক বড়, বড় বাড়ি গুলো, গলি রাস্তা সব যেন মিলিয়ে গেছে। এই শহরও অন্যদের দেখাদেখি এক ছাঁদের সুন্দরী হতে চাচ্ছে। পরীও কি তাই চেয়েছিল ?

পরীর আসল নামটা যেন কি ? 'পরী' তো ঋতমের দেওয়া ভালোবাসার নাম। আসল নামটা কিছুতেই মনে আসছে না। অল্প স্বল্প মুখ চালাতে ইচ্ছে করছে। বাবার সঙ্গে যখন আসত, বা পরীকে নিয়ে একবার যখন এল তখন তো বাদাম, ঝালমুড়ি বিক্রি হত। ফেরিওয়ালারা পসরা নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। ফ্যামিলি বা জুটি দেখলে বেশি করে সেখানেই ঘোরাঘুরি করত। কি বিজনেস স্ট্র্যাটেজি ! জানত এরা কিনতে বাধ্য হবে। এখন কি আর আসে না ! সেই উঠে গিয়ে খেতে হবে ! আর

একটু জিরিয়ে নিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে। গেট বন্ধ হয়ে যাবে। কত স্মৃতি ভিড় করে আসছে। সমস্ত হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছে। কার জন্য কেন এই বৃথা পন্ডশ্রম। বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা এক নিমেষেই কেমন তেতো হয়ে গেল।

পরীর আসল নামটা কিছুতেই মনে আসছে না। আচ্ছা আসল নামটা কি জরুরি ? সেই নাম ধরেই কি ঋতম ওকে যা নয় তাই বলবে ? এই ভাবে ঠকানো ? ছি ! ছি ! কতখানি তলিয়ে গেছে। একবারও কি ফোন করতে পারত না ? নিদেন পক্ষে এস.এম.এস. ! জীবনটা তাহলে এই ভাবে শেষ করতে হত না ! একবার পরীর জন্মদিনে একটা ডানাওয়ালা পুতুল গিফ্ট করেছিল ঋতম। বলেছিল, "ভাগ্যিস তোর ডানা নেই নাহলে তুই কবেই আমার কাছ থেকে উড়ে যেতিস।" ডাগর চোখগুলো আরও ডাগর করে শুনেছিল পরী। সেই পরী কবে সস্তার ফেয়ারী কুইনের ডানাটা লাগিয়ে নিল ! ঋতম টেরও পেল না !

ঋতম কি ওর মুখোমুখি হবে ? না, না করে দেবে ? পরী যে মামাবাড়িতে থাকে। মা, মারা যাবার পর বাবা আর একটা বিয়ে করেছে। এক বছর পরীর মামার ছেলেকে পড়িয়েও ঋতম জানতে পারেনি। একদিন পরী'ই ছুটতে ছুটতে ওর সাইকেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোনো ভনিতা ছাড়াই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমাকে পড়াবেন ? কোনো টাকা পয়সা দিতে পারব না। এই বাড়িতেও পড়ব না।" তারপর থেকে কম আগান, বাগান, নির্জন স্থান, পুকুর ঘাট, নদীর পাড় ঘোরা হয়নি। পড়াও হয়েছে। প্রেমও হয়েছে। সবাই অবাক হয়ে যেত মেয়েটা এত ভালো রেজাল্ট করে কি করে ! বাড়ির লোকেরা পড়াতে না চাইলেও একপ্রকার স্কুলের চাপে আর ওর স্কলারশিপের কারনে পড়াতে বাধ্য হত। কবে কোথায় ওদের চোখে প্রথম প্রেম ভেসে উঠেছে, কবে প্রথম হাত ধরেছে, কোন দিন প্রথম দুজনের ঠোঁট এক হয়েছে, কোন দিন প্রথম একে অন্যের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে উষ্ণ সময় কাটিয়ে দিয়েছে, এত কিছু মনে পড়ছে। নাহ, পরীর আসল নাম মনে পড়ছে না।

ঋতম তখন একটা কম্পিউটার সেন্টারে চাকরি করে। আর কোচিং স্কুলের আয়। বাবার টিমটিমে মুদির দোকান। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে পরীর মামারা সুন্দরী ভাগ্নির বিয়ে দিতে রাজি হয়নি। অথচ চাকরির পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য ঋতমের সাথে কলকাতায় দু দিনের জন্য ছাড়তে একপায়ে রাজি হয়ে গিয়েছিল। ওরা কি ভেবেছিল এই ভাবে কুৎসা রটিয়ে নিখরচায় ভাগ্নিকে পার করবে ? কই ঋতমের মনে ছিনতাইবাজ হওয়ার বাসনা তো জন্মায়নি। পরীকে পূর্ন মর্যাদায় ঘরে নিয়ে আসার স্বপ্নই তো লালন করে গেছে। এর পর ধীরে, ধীরে তিস্তার জলের স্রোত কমে এল আর ঋতম চড়চড় করে উন্নতি করল।

এখন সে একটা বহু জাতিক কোম্পানির ইস্টার্ন রিজিয়নের হেড। পরীর স্বপ্ন সেই রাতের স্বপ্নের মতোই রয়ে গেল। সে আর পূর্ণ হয়নি। তার বদলে ঋতম কলকাতায় এলেই হোটেলে উঠলে তার 'নিশি পরী'র প্রয়োজন হয়। পরীকে মনে মনে বিস্তর খুঁজেছিল ঋতম। বন্ধু, বান্ধব চেনা পরিচিত মারফত খোঁজও নিয়ে ছিল বিস্তর কিন্তু পায়নি। কর্পূরের মত উবে গিয়েছিল। মামাবাড়ির লোকেরা বাড়ি বয়ে পরীর বাবার ঠিক করা ভালো বিয়ে, ধনী বরের খবর ঘটা

করে দিয়ে গিয়েছিল। বাবা, দিদিরা বাড়িতে সবাই পরীর কথা জানত। পরীকে খুঁজে না পাওয়ার পর প্রথম প্রথম বাবা, পরের দিকে দিদিরা অনেক জোর করেছিল। মেজদি তো ওর ননদের, জায়ের, বোনের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করে ফেলে একেবারে। কিন্তু 'পরী' কে যে ভালোবেসেছে সে কি আর কাউকে মনে জায়গা দিতে পারবে ! ঋতম হাত তুলে দিয়েছিল।প্রথম প্রথম দিদিরা অনেক ওজর আপত্তি করত। কালের নিয়মে সবই আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল।

কাল রাতে হোটেলে চেক ইন করার সময় মনে হল পাশ দিয়ে কে যেন গেল। গড়ন, গঠন খুব জানা। মনে হল বহু দিনের চেনা।

মুখটা ঋতম খেয়াল করেনি। আসলে দেখবার জন্য তো দেখেনি। হঠাৎই পাশ দিয়ে চলে যাওয়া। পোড় খাওয়া ঋতমের শরীরী ভাষা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কোম্পানি এই জন্য তাকে মোটা মাইনে দিয়ে রেখেছে। কার নার্ভ কি বলছে, কে, কি ভাবছে এক লহমায় ধরে ফেলে সেই অনুযায়ী চাল চালাই ঋতমের বিশেষত্ব। এই মেয়ে কি জন্য এখানে এসছে তা ধরা ওর বাঁ হাতে খেলা দেখানোর মতই সোজা। কিন্তু ধাক্কাটা

লাগছে অন্যখানে। এও কি সম্ভব ? পৃথিবীতে একই রকম দেখতে সাতটা মানুষ থাকে। এটা কি সেই রকম কোনো কাকতলীয় ঘটনা ! তাহলে মহিলা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যে টান অনুভব করল তা কি ? সে কি একই মুখের অধিকারীর জন্য হবে ? ঋতম জানে তা হওয়ার চান্স একশ ভাগের পয়েন্ট একভাগ। আর এই খানেই দ্বন্দ---

আজ মিটিংটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। পার্টি যে এত সহজে শর্ত গুলো মেনে নেবে ঋতম আশা করেনি। যে ডিসকাউন্টে ওরা রাজি হল তাতে ওদের প্রফিট প্রায় থাকবে না। তবে এরিয়া বিরাট। লার্জ স্কেলে সেল করতে পারবে। কোম্পানি সেলস প্রমোশনে সাহায্য করবে। গ্রোথ ভালো হলে লুক্রেটিভ ইনসেনটিভ দেবে। এখন হোটেলে ফিরে কি হবে। শহরের নাম করা পাঁচতারা হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে সোজা 'ভিক্টরিয়া'।

ঋতম যখন কলকাতায় আসে এই হোটেলেই ওঠে। এখানে একটা পরিচিতি হয়ে গেছে। ঋতমকে ওরা ভালো বোঝে। হোটেলের ছেলেটা আজ ব্রেকফাস্ট এর

সময় বলেছিল, "দাদা মনের মত জিনিস পাবেন। আসেন যখন ঠিক আপনার মনের মত দিতে পারি না। বুঝতে পারি দাদা। এইবার দেখবেন ! আপনাকে মোবাইলে ছবি পাঠিয়ে দেব।"

হ্যাঁ ছেলেটা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। কলকাতাকে আজ খুব ঘেন্না লাগছে। মনটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল। এতদিন সযত্নে মনের গহীন নিভৃত কোণে যে পরীমহল ছিল তা আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ঋতম কি সেই ভাঙা টুকরো গুলোয় ওর আর পরীর মুখ দেখবে ? না .....

বর্ষায় ভরসায়

রাণা চ্যাটার্জী

"আরে নহি নহি,ছতরি হমে নাহি চাহিয়ে ,আপ সমাল কে বৈঠিয়ে ম্যাডামজি"-না গো তাতে কি,কাল থেকে কি বৃষ্টিটাই না হচ্ছে বলোতো! "আমি আরাম করে বসবো আর তুমি ভিজবে তা কি হয় "-মনে মনে এই ভাবনা থেকেই ভিজে ছাতাটা খুলে বয়স্ক রিক্সা জ্যেঠুর মাথার উপর ধরেছে তিস্তা।

এই প্রান্তিক অভাবী মানুষগুলো এমনই ,শত কষ্ট সহ্য করে মেনে নিতে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় । ভাগ্যিস এনাকে পাওয়া গেল, নইলে আজ অফিস যাবার দফারফা! ততক্ষনে ঝড়ো দমকা হাওয়ায় খানা খন্দ পার করে এগিয়ে চলেছে রিকশা।তিস্তার হাতটা ব্যথা হবার উপক্রম এতক্ষন এগিয়ে ধরে আছে ছাতাটা তবু এই সব কাজের মধ্যে মনে একটা আলাদা প্রশান্তি আসে।কাল সন্ধ্যায় ফেরার পথে সে যা ঝমঝম বৃষ্টি ,একটা না আছে রিক্সা না টোটো । একদম জনশূন্য রাস্তায় থম থম করা লাইট পোস্টের সাক্ষী হয়ে ছলাৎ

ছলাৎ করে জল পেরিয়ে বাড়ি ফিরেছে । আর এই যা বৃষ্টি আটকায় নাকি ছাতায়, তাই ফিরে থেকে নাক টেনে হেঁচে অস্থির মেয়ে।

এদিকে দুদিন পরই কালীপুজো,অফিসে বেশ কিছু কাজ পেন্ডিং,সদ্য দুর্গাপুজোর এত গুলো ছুটির পর সবে অফিস খুলেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রেনকোট পড়ে সকালে বেরিয়ে আরেক কাণ্ড! ইস গলির মুখটা কি যাচ্ছেতাই গা ঘিনঘিনে অবস্থা হয়েছে । ড্রেনের জল বৃষ্টির জল উপচে মিলে মিশে যা তা ! বৃষ্টিটা যদিবা সকালে একটু থামল আবার সুর চড়িয়েছে।আজ কপালে দুঃখ আছে বেশ বোঝাই যাচ্ছে আটটা বিয়াল্লিশের স্টেট বাস টা পেলে হয়,না আছে দাঁড়িয়ে কোনো রিকশা,টোটো !খানিক তফাতে ওপারে থাকা চায়ের দোকানের জটলা থেকে কেউ একজন কটাক্ষে চাপা আওয়াজ তুললো ।চোখ তুলে তাকাতেই সব ঝেড়েমেরে চুপ,ভদ্র মানুষ হয়ে মাটির ভাঁড়ে গরম চা'য়ে ফুঁ।

সামনে যদি কিছু পায়,অগত্যা দু কদম এগুতেই চাল গদির বারান্দায় জড়োসড়ো আড়মোড়া ভাঙ্গা বিহারী

রিক্সাওয়ালা রাস্তার দিকে তাকিয়ে, হয়তো যাত্রী আসবে অপেক্ষায়।" ও জ্যেঠু যাবে নাকি"-বলে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা তিস্তার। যা বৃষ্টি হচ্ছে,কাউকে যাবে কিনা প্রশ্ন,অনুরোধ করতেও খারাপ লাগে তবু দেখি না হলে বাড়ি ফিরব এমন স্থির করার মাঝেই ঝেড়েমেরে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিলো রিক্সাওলা। "কি হলো তোমার শরীর ঠিক তো জ্যেঠু,তাহলে নাহয় ছেড়ে দাও, বসো"-হালকা করে কানে এলো কি বললো যেন,"নাতনি বিটিয়াকা ভুখার হ্যায় পাঁচ দিন সে কাম নাহি কিয়া,খানাপিনা রেশন কা খরচা ভি উঠানা হ্যায়- নাহি তো ভারী বারিস মে কৌন নিকালতা হ্যায়!,আপ আইয়ে ম্যাম "!

দাঁড়াও ভিজো না বলে তিস্তা ভিজে ছাতা বের করে মাথার উপর ধরল। এই মানুষগুলো আমাদের জন্য এত করে,একটু যদি সহমর্মী আমরা না হই তাহলে কিসের মনুষ্যত্ব ! খুব কম যাত্রী নিয়ে স্টেট বাস ছাড়ার অপেক্ষায় আর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। একটু জোড় করেই কুড়ি টাকার বদলে পঞ্চাশ টাকার নোটটা হাতে গুঁজে আসছি বলে দৌড়ে বাসটায়

চাপলো তিস্তা। পৌঢ় রিকশা ওলা তখনও হাঁ করে তাকিয়ে বাসের দিকে টাকাটা মাথায় ছুঁয়ে।

পৌরাণিক থ্রিলার

মেডুসা

ঝিলিক মুখার্জী গোস্বামী

থ্রিলার জিনিসের প্রতি টানটা অনুভব করেছিলাম সেই ছোট্ট থেকেই। একটা সময় ছিল, থ্রিলারের বইগুলো রাতজেগে গলাধঃকরণ করেছি। বই এর পড়ার তাকে গোয়েন্দা থেকে থ্রিলার, সব বই গুলো জায়গা দখল করে থাকত সর্বদা। তখন থেকেই ভবিষ্যত জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিলাম প্রায়। পরিবারের সঙ্গে একপ্রকার যুদ্ধ করেই নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে পেরেছি। সেই থ্রিলারের টানেই ক্রাইম ব্রাঞ্চের মুখ্য আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি অনেকদিন আগেই। পেশা এবং নেশার টানে ক্রাইম ব্রাঞ্চকে নিজের ধ্যান জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছি একপ্রকার। দিনের বেশিরভাগ সময় নিজের অফিসেই অতিবাহিত করি। আর বাকি সময়টুকু, আগাথা ক্রিস্টি, শার্লক হোমস থেকে শুরু করে ব্যোমকেশ এবং ফেলুদাকে নিয়ে সময় অতিবাহিত করি। নিজের বাড়ির সাথে অফিসের অন্দরেও একটা ছোট্ট পাঠাগার বানিয়ে নিয়েছি।

একটা কেসের জট, কিছুদিন যাবৎ কিছতেই খুলতে পারছি না। এই কেসের জট খুলতে গিয়ে নিজের মাথার তারগুলো প্রায় জট পাকানোর মত অবস্থায়। যখনই কিছু জটিল কেস নিয়ে প্রায় অথৈ জলে পড়েছি, প্রতিবার ছুটে এসেছি আমার ফ্রেন্ড ফিলোজফার এন্ড গাইড তথা আমার জ্যাঠামশাই এর কাছে। যিনি এক সময় ছিলেন, ক্রাইম ব্রাঞ্চের জাঁদরেল পুলিশ অফিসার । আমারও এই চাকরি জীবনে আসা! জ্যাঠামশাইকে দেখেই। যখন কৈশোরী থেকে যুবতী হয়েছি, জ্যাঠামশাই এর কাছে একটার পর একটা গল্প শুনেছি আর অজান্তেই নিজের স্নায়ুর উত্তেজনা অনুভব করেছি। মনে মনে তখন থেকেই নিজেকে কল্পনা করতাম, জ্যাঠামশাই এর জায়গায়। জ্যাঠামশাই এর বলা গল্প শুনে আসার পর ভাবতাম, আমি এই কেস লিড করলে ঠিক কী কী পদক্ষেপ নিতাম। জ্যাঠামশাই এর সঙ্গে থাকতে থাকতে এবং প্রায় প্রতিটা কেসের গল্প শুনতে শুনতে, জ্যাঠামশাই এর দেওয়া পাজল গুলো সল্ভ করাতে ধীরে ধীরে সিদ্ধহস্ত হতে শুরু করেছি।

ঠিক এরকমই একটা দিনের কথা বেশ মনে পড়ে। একটা কেসের কথা জ্যাঠামশাই বর্ণনা করে আমাকে সলভ করতে বলে। যখন আমি সেটা করাতে সাফল্যশ পাই, জ্যাঠামশাই এর মুখে একটা চওড়া হাসি ফুটে ওঠে। ঠিক তখনই কোনো এক অজানা টানে, জ্যাঠামশাইকে বলেই ফেলি আমি ভবিষ্যতে ঠিক কী হতে চাই। আমার এই চাকরিতে আসার পেছনে জ্যাঠামশাই এর অবদানও অনস্বীকার্য। কারণ বাড়ির সবাই যখন আমার বিপক্ষে চলে গিয়েছিল, একমাত্র জ্যাঠামশাই এর বদান্যতায় হোক বা জ্যাঠামশাই এর আমার পাশে শক্ত খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে থাকার কারণেই হোক। অবশেষে আমি আমার লড়াইয়ে জয়ী হই। আজও চলেছি সেই জ্যাঠামশাই এর কাছে। যার কাছে প্রতিবার ছুটে গেছি, জটিল কেসের সমস্যা সমাধানের জন্যি।

সন্ধ্যার আকশে তখন লেগেছে সূর্যের শেষ আলোর রক্তিম বর্ণ। পাখিরা মুখে করে খাবার নিয়ে ফিরছে নিজেদের বাসস্থানের দিকে। কর্মব্যস্ত দিনের অস্ত যাওয়ার পালা। জ্যাঠামশাই এর বাড়ির এদিকটা বেশ

নির্জন। রিটায়ার করার পর বারুইপুরের দিকে একটা কটেজ কিনে সেখানেই স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলেছেন। শহরের যানজটের ভিড় থেকে এখানে এলেই মনটা কেমন যেন প্রশান্ত হয়ে যায়। ইচ্ছে করে ছুটির দিন গুলোতে এখানে এসে সময় অতিবাহিত করতে। যখন গাড়ি থেকে নামলাম, তখন প্রায়ান্ধকার হয়ে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমে ছোট্ট পুকুরের পাড় ধরে জ্যাঠামশাই এর কটেজের দিকে হনহন করে এগিয়ে চলিছে। পুকুরের জলে ঝপাৎ করে একটা আওয়াজ হল। বোধহয় মাছরাঙা পাখি তার শক্ত ধারালো চঞ্চু দিয়ে তার খাদ্যগুবস্তুকে সংগ্রহ করে উড়ে গেল। যেমন করে শহরের মধ্যেঞ্চলছে, হিংস্র ভাবে প্রাণ সংগ্রহের কাজ। জ্যাঠামশাই এর কটেজের দিকে এগিয়ে গেলাম। কটেজ হলেও এটাকে ঘর বলে অভিহিত করাই শ্রেয়। জ্যাঠামশাই এর সাজানো গোছানোর ফলে, কটেজটি একটি ঘরেই রূপান্তরিত হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই জ্যাঠামশাই এর দিকে নজর করলাম। সান্ধ্যকালীন চা জলখাবার সহযোগে একটি বই এর মধ্যে গভীরভাবে নিমগ্ন। আমার পায়ের আওয়াজ শুনে, বই এর পাতা থেকে মুখ তুলে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মৃদু অথচ হাসি মাখা কণ্ঠে বলে উঠলেন,

" নতুন কেসে আটকে গেছিস, তিথি! " আমি একটু এগিয়ে গিয়ে, সোফার ওপর ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে বিস্তারিত বলতে শুরু করলাম।

শহর জুড়ে কী চলছে তা জানোই তো। খবরের কাগজ থেকে মিডিয়ায় চ্যানেল। প্রতিটা জায়গায় শহরের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে দোষারোপ করা হচ্ছে। ওরা তো আর জানে না! ওপর মহল থেকে আমাদের ওপর কিরূপ ভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। রাত দিন এক করে, দক্ষ টিম নিয়ে এই কেসের অপরাধীদের পেছনে পড়ে আছি। যখনই মনে হচ্ছে কেসের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি ঠিক তখনই আবারও একটা প্রাণ নাশের খবর শুনতে পাচ্ছি। অনেক খোঁজ খবর করার পর, আমাদের ইনফর্মার মারফত লিড একটা পেয়েছি। প্রমাণও পেয়েছি কিন্তু ঠিক.... আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই জ্যাঠামশাই, চায়ের পেয়ালার ওপর শেষ চুমুক দিয়ে বলে ওঠেন, " প্রমাণ মানে তো ওই সব সাপের খোলস। তো তাতে ঠিক কী প্রমাণ হয়!" এতটুকু বলে ক্ষণিক থেমে জ্যাঠামশাই পুনরায় শুরু করলেন, " আমার একটা কেসের কথা বলি তবে শোন। আমি যখন দিল্লিতে পোস্টেড ছিলাম তখনকার

কথা। একটা পুরো বিল্ডিং জুড়ে কয়েকটি ফ্ল্যাটবাড়িতে শুধুমাত্র সুদর্শন পুরুষের মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। আমাদের কাছে যখন এই ব্যাপারে রিপোর্ট করা হয় এবং আমরা তৎক্ষণাৎ তল্লাশি করা শুরু করি। বিশ্বাস করবি না হয়তো। কিছুই হাতের নাগালে পাইনি। অপরাধী কোনো রকম প্রমাণ ফেলে যায়নি। প্রতিটা খুন করা হয়েছে নিখুঁত ভাবে এবং সুপটু হস্তে। এমনকি প্রতিটা মৃত্যুকে স্বাভাবিক দেখানো হয়েছে এমনভাবে যে পোস্টমর্টাম রিপোর্টেও কিছুই ধরা পড়েনি।"

জ্যাঠামশাই একটু থেমে আমার দিকে একটা চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে নিজের জন্য আরও এক পেয়ালা চা বানিয়ে নিয়ে পুনরায় শুরু করলেন, " এরপর আরও কিছুদিন তল্লাশি চালালাম। কিছুদিন তল্লাশি চালিয়ে আমাদের সমুখে যেটা প্রকাশিত হল! তার সাথে বাস্তবের মিল খুঁজতে চাওয়া, স্রেফ বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের মতো কর্মদক্ষ টিমের কাছে এই কেস ছিল সবথেকে আশ্চর্যজনক। এমনকি আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ আশ্চর্যজনক কেস ছিল এই কেস। এই কেসের কথা কোনো দিন ভুলব না। ভুলতে

চাইলেও না। আমি একশত ভাগ নিশ্চিত তোর কেসের সাথে আমার কেসের মিল আছে। সেটা পুরোটা শুনলেই বুঝবি।"

জ্যাঠামশাই এর শেষের কথাটায় কেমন যেন ধাক্কা খেলাম। জ্যাঠামশাই একটু থামতেই বলে উঠলাম, তুমি পুরোটা বলো। আমি শুনতে চাই।

" আমার কেসটা বলার আগে তোকে একটা প্রশ্ন করব।"

জ্যাঠামশাই এর কথায় বলে উঠলাম, বেশ তো বলো।

" গ্রীক পুরাণে মেডুসা বলে একজন ভয়ংকর দানবীর কথা বলা হয়েছে। যার মুখমন্ডল নারীর মতো হলেও মস্তকে কেশের পরিবর্তে ছিল জীবন্ত সর্প। "

জ্যাঠামশাই এর কথার রেশ টেনে বলে উঠি, মেডুসা আসলে ছিল ভীষণ রূপবতী। তাঁর রূপের কারণে দেবতারা তাঁকে কামনা করতেন। কিন্তু মেডুসা নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন দেবী এথেনার

সেবাকর্মে। তাই তাঁর পক্ষে.... এসবের মাঝেও সাগরের দেবতা পসাইডন, মেডুসার রূপে আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সঙ্গে এথেনার পবিত্র মন্দিরে মিলিত হওয়ার কারণে দেবী এথেনা দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে নিজের রূপ বিসর্জন দিয়ে বীভৎস রূপ নিয়ে এথেনার মন্দির ত্যাগ করে চলে যান। যাবার সময় সঙ্গী করে নিয়ে যান একরাশ ক্রোধকে। তবে পাশাপাশি এটাও ঠিক, মেডুসার রূপকে একপ্রকার হিংসে করত দেবী এথেনা। তিনি কখনও চাননি, মেডুসা দেবতাদের কামনার পাত্রী হোক। আর তার থেকেও মূল কথা, পসাইডন অন্যায়ী করেও বেঁচে যান। আর অভিশপ্ত হতে হয় মেডুসাকে। কথিত আছে দেবতারা, দেবতাদের অভিশাপ দিতে চাইতেন না কখনওই। এখানেও তার ব্যেতিক্রম হয়নি। পসাইডন দিব্যি বেঁচে যান অভিশাপ থেকে, মেডুসা একরাশ ক্রোধের সাথে এথেনার অভিশাপ নিয়ে এথেনার মন্দির পরিত্য্াগ করে চলে যান।

আমার জ্ঞানের পরিধি দেখে জ্যাঠামশাই এর মুখের হাসি চওড়া হল। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারলাম না এই কেসের সঙ্গে মেডুসার ঠিক কী সম্পর্ক!

" ক্রোধকে সঙ্গে করে মেডুসা গমন করেন বর্তমান আফ্রিকার উদ্দেশ্যে এবং যাওয়ার সময় কিছু সর্প তাঁর মস্তক থেকে খসে পড়ে। কথিত আছে এই কারণে আফ্রিকায় সাপের সংখ্যা সর্বাধিক। গর্গন প্রজাতির মেডুসা পরবর্তীকালে হত্যা হয়, জিউস পুত্র তথা ডেমিডগ পার্সিয়াসের কাছে। অভিশপ্ত মেডুসা এরকমও অভিশাপ পেয়েছিল, ওঁর নজর যার উপর পড়বে সে তৎক্ষণাৎ প্রস্তরবৎ পরিণত হবে। তাই পার্সিয়াস যখন মেডুসার অনুসন্ধানে পাড়ি দিয়েছিলেন, অনেক জায়গায় প্রস্তরের পশু থেকে শুরু করে গাছপালার নিদর্শন পেয়ে থাকেন। কারণ তাঁর মা তাঁকে পূর্বেই অবগত করেছিলেন মেডুসা সম্পর্কে। এও সাবধান করে দেন ভুলেও যেন ভুল করে মেডুসার নজরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ে উদ্যন্ত না হয়। সে অনেক গল্প। এখন আসি, তোর এবং আমার কেসের কথায়। আমরা যখন তল্লাশি শেষ করলাম, তখনএকজন সুন্দরী নারীর খোঁজ মিলল। যার রূপের ছটা মেডুসাকেও হার মানাতে পারে, এমনি ছিল তার রূপের আধিক্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য ভাবে তার মাথার চুল গুলো ছিল একেবারে সর্পের মতো। প্রথম দর্শনে যে কেউ তাকে মেডুসার

অবিকল রূপ বলে ধরে নিলে অবিশ্বাস্য হওয়ার কিছুই ছিল না। অবশ্য তার যদি গ্রীক পুরাণে জ্ঞান থাকে তো। সেই মেয়েটির বাড়ি থেকে এমন কিছু জিনিস যেমন, পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে অ্যাকোনাইটের কিছু শিশি...."

জ্যাঠামশাই এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, তার মানে ওর ওই রূপের ছটা ছিল মৃত পুরুষের মৃত্যুর আহ্বান । স্বগতোক্তি করে বললাম, পুনর্জন্ম! কথাটা বলেও কেমন যেন নিজের প্রতি নিজের অবিশ্বাস্য লাগল। সহস্রাধিক বছর পর, পুনর্জন্ম। কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগছে। এতগুলো বছর পর মেডুসার আগমন এবং পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ এবং ফলস্বরূপ হত্যা। কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকছিল ব্যাপার গুলো। আমার মনের ভিতরে তখন চলছে উথালপাথাল করা সমুদ্র ঝড়। আমার মনের গভীরতাকে জ্যাঠামশাই বোধহয় অনভব করতে পেরেছিলেন। তৎক্ষণাৎ পুনরাবৃত্তি করে উঠলেন, " তুই যেটা ভাবছিস সম্পূর্ণ ভুল। পুনর্জন্ম বলে কিছুই হয় না। বিজ্ঞানের যুগে বাস করে.... তাও এতগুলো বছর পেরিয়ে। জাস্ট ইমপসিবিল।"

জ্যাঠামশাই এর কথা শুনে নিজেকে ধাতস্থ করলাম। কিন্তু কিছুতেই নিজের মনের মধ্যেকার অস্থিরতাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। অস্থির ভাবে বলে উঠি, তাহলে ঠিক কী হয়েছিল জ্যাঠামশাই!

" মেয়েটির ওপর জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব চালাই বেশ কিছুদিন। কিন্তু কোনো রকমের সঠিক তথ্যের নাগাল পাচ্ছিলাম না। এরপর ওর ওপর আরও কিছু বিশেষ পরীক্ষা চালানো হয়। অবশেষে জানতে পরি মেডুসাকে নিয়ে ওর মধ্যে একটা হ্যালুশিনেসন চলছিল। ওর ওপর হিপনোটিজম বিদ্যা প্রয়োগ করতে বাধ্য হই আমরা। তার ফলে বহু অজানা তথ্য আমাদের হাতে আসে। গ্রীক পুরাণ, বিশেষ করে মেডুসা ওর মনের মধ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। আর খুন গুলো ও আদৌ করেনি। ওকে একপ্রকার ফাঁসানো হয়েছিল।"

তারমানে মেয়েটি ছিল হ্যালুশিনেসনের শিকার। যার কারণে নিজেকে মেডুসার মতো ভাবত এবং মেডুসাকে কল্পনা করত নিজের মধ্যেত তাই ওর ঘরের মধ্যে

থেকে ওই পোশাক গুলো পেয়েছিলে। আর এটার সুযোগ নিয়ে কেউ, মেয়েটিকে ফাঁসানোর চ েষ্টায় ব্রতী হয়েছিল। কথাগুলোকে এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষিত করে,মুখগহ্বরে একটি মাছি প্রবেশ করতে পারে এরকম একটি হাঁ করে জ্যাঠামশাই এর দিকে তাকিয়ে থাকি পরবর্তী চমকের জন্য এবং ওই অবস্থাতেই প্রশ্ন করি, তাহলে কে ছিল আসল খুনি?

আমার কথা শেষ হলে, জ্যাঠামশাই বলা শুরু করেন, " ওরই এক বন্ধু বেশ অবগত ছিল, মেয়েটির এই অবস্থার প্রতি। নিজেকে এতটাই সুন্দরী ভাবত যে, অজান্তেই ওর মনের মধ্যে মেডুসার রূপ অঙ্কিত হয়ে যায়। প্রমাণ স্বরূপ মেডুসার কিছু প্রতিচ্ছবিও ওর বাড়ি থেকে পেয়েছিলাম এবং ওর হাতের কব্জির ঠিক ওপরে মেডুসার একটি ট্যাটুও আছে দেখেছিলাম। "

সবই বুঝলাম জ্যাঠামশাই। কিন্তু মেয়েটিকে ফাঁসানোর কোনো কারণ এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না। এরকম বন্ধুও তাহলে পৃথিবীতে আছে। যারা নিজেদের মনস্কামনা চরিতার্থ করতে নরকে নামতেও পিছপা হয়

না, সব সম্পর্ক ভুলে। এইজন্যই আজ সম্পর্কের সমীকরণ থেকে সংজ্ঞা, সব কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে।

আমার কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং ক্ষণিক বিরতি টেনে জ্যাঠামশাই পুনরায় শুরু করলেন, " মেয়েটির বন্ধুটির ছিল রক্তের এক কুৎসিত নেশা। টাটকা তাজা রক্তের প্রতি বিশেষ টান ছিল। দুজনেই ছিল একই ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা। তাই বন্ধুটির পক্ষে কাজটি আরও সুবিধার হয়ে ওঠে। মেয়েটির হ্যালুশিনেসনের সাহায্য নিয়ে...."

এবার জ্যাঠামশাইকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে উঠি, শুধুমাত্র সুদর্শন পুরুষরাই শিকার হল কেন?

পুনরায় গর্বিত হাসি হেসে জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, " ইউ আর এ গুড লিসেনর, তিথি। ওয়েলডান! মেয়েটি যখন আরও একটু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তখন ওর কাছ থেকে পুরুষ বন্ধুটির সমস্ত তথ্য জানতে পারি। কয়েকদিন ওয়াচ করার পর মেয়েটির সাহায্য নিয়ে আমরা ওর পুরুষ বন্ধুটিকে অ্যারেস্ট করতে পারি। শুধুমাত্র নিজের কুৎসিত নেশার তাগিদে

পরিকল্পনা করে প্রতিটা খুন করেছিল এবং এমন ভাবে ঘটনাগুলো সাজিয়েছিল যার কারণে মনে হয় সবগুলোই স্বাভাবিক মৃত্যু। নিজে কোনও দিনও যাতে পুলিশের নাগালে না আসতে পারে প্রমাণ গুলো যত্ন করেই হোক বা ইচ্ছাকৃত ভাবেই হোক ফেলে রেখেছিল মেয়েটির কাছে এবং সুযোগ বুঝে গা ঢাকা দেয়। পরিকল্পনা মতো সুদর্শন পুরুষদের বেছে নিয়েছিল। কারণ পরবর্তীকালে যখন প্রমাণ স্বরূপ মেয়েটিকে পুলিশ হাতের নাগালে পাবে, যাতে সব প্রমাণ মেয়েটির বিরুদ্ধে যায় এবং বন্ধুটি বেঁচে যায়। এটাও হয়তো পরিকল্পনার মধ্যো রেখেছিল, ওই কেস ধামাচাপা পড়ে গেলেই নতুন করে শুরু করবে তার নারকীয় খেলা। কিন্তু...."

জ্যাঠামশাই এর কথা শেষ হতে না দিয়েই বলে উঠি, পাপেরও বাপ থাকে। কথা বলা শেষ হতেই, আমার মনের মধ্যো তখন একটা স্ফূর্তি অনুভব করলাম। জ্যাঠামশাই এর এই কেসের ঘটনা শোনার পর আমার মাথায় জট পাকিয়ে থাকা তার গুলো তখন একটা একটা করে খুলতে শুরু করেছে। অস্থিরভাবে ভীষণ দ্রুততার সঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠতে উঠতেই বলে উঠি,

তোমার কেসে কোনও প্রকার সাপের খোলসের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আমার কেসে তার অস্তিত্ব বর্তমান। তবে কী তর্কের খাতিরে ধরে নিতে পরি ক্রুদ্ধ মেডুসার মস্তক হতে সর্পের শরীর খোলস গুলি শহরের ওলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত্যুর বাণ না কি ক্রুদ্ধ মেডুসার প্রতিশোধের স্পৃহা চলছে গোটা শহর জুড়ে। এটা কী সত্যিই মেডুসার গল্প! না মেডুসার আড়ালে লুকিয়ে আছে গোপন কোনো তথ্য? সেটাই অনুসন্ধান করে কেসের যবনিকা পতনের পালা এবার। তোমার কেসের সঙ্গে আমার কেসের একটাই মিল আছে জ্যাঠামশাই।

আমার দিকে গভীর অথচ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, জ্যাঠামশাই। মৃদু হেসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলাম, তোমার এবং আমার কেসে ভিক্টিমরা সবাই সুদর্শন পুরুষের দল। তোমার কেসে অপরাধী ছিল একজন পুরুষ। আমার কেসে কারণটা এক হলেও অবাক হব না। কিন্তু চরিত্ররা উল্টোটাও....

কথা শেষ হয়না, ঠিক এমন সময় পকেটে থাকা মুঠোফোনের কাঁপুনি অনুভব করলাম। কলটা রিসিভ

করতেই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। ফোনটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে জ্যাঠামশাই এর দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলে উঠলাম, মেডুসা এন্ড পর্সিয়াস.... বোথ আর ব্যাক ইন ওয়ার। কথাটা বলেই জ্যাঠামশাই এর পরবর্তী কথার অপেক্ষায় না থেকে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। গাড়ির কাছে এসে ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে বলেই গাড়িতে চড়ে বসলাম। খুব সংক্ষেপে গন্তব্যস্থলের কথা বলে দিয়ে মুঠোফোনের পাতায় গুগল ওপেন করে 'মেডুসা' লিখে সার্চ করলাম। নেটের সুপার স্পিডের হাত ধরে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, এক দানবীয় রমণীর মূর্তির ছবি। ঠিক এমন সময় হোয়াটসঅ্যাপের বিপ আওয়াজও বেজে উঠল। আমার গন্তব্যস্থল থেকে, টিম মেম্বারের পাঠানো একটা ছবি। ঘটনার অকুস্থলে পড়ে আছে দুটি প্রাণহীন শরীরের অংশ। পরনের পোশাক পরিচ্ছদ যেন কোনও গ্রীক দেব-দেবীকে নির্দেশ করছে। ছবিগুলো একটার পর একটা দেখতে দেখতে, একদম শেষের ছবিতে গিয়ে প্রস্তরবৎ বসে রইলাম। মনে হল যেন মেডুসার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হল একঝলক। তার ফলস্বরূপ আমার ক্ষণিকের প্রস্তরবৎ অবস্থান। ড্রাইভারের প্রবল

ব্রেক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহজগতে ফিরে এলাম। শেষের ছবি দুটো ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে আঁতকে উঠলাম প্রায়।

মেডুসা এবং পসাইডনের ছবির সাথে, দুটি প্রাণহীন শরীরের অবিকল মিল দেখে...
জ্যাঠামশাইকে বলা কথাটা এখন ফিরিয়ে নিতে বাধ্যম হলাম, এবং জ্যাঠামশাই যে ভুল সেটা উল্লেখ করে ছবি দুটো পাঠিয়ে দিলাম। ছবি দুটোর নীচে মোটা অক্ষরে লিখে দিলাম, পুনর্জন্ম বলে কিছু হয়।

সবসময়ই যে সব ক্ষেত্রে হ্যালুশিনেসনকেই দায়ী করতে হবে এমনতর কথা কোথাও লিখিত নেই। অফিসের ঘরে বসে, ওয়েট পেপার নিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে কেসের ব্যাপারে ভাবছিলাম। মেডুসার রূপটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। জ্যাঠামশাই এর কেসটার মতো, আমার জীবনের এই কেস আমিও জীবনে ভুলতে পারব না। যখন এইসব ব্যাপারে চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে আছি। মুঠোফোনটা বেজে উঠে জ্যাঠামশাই এর নামটা প্রকাশিত করল।

ধ্বস্ত মানবিকতা

দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়

মনখারাপের বিকেলে আমি ফিরছি দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে।ওর শ্বশুরমশাই খুব অসুস্থ। মাল্টিঅর্গ্যান ফেলিওর ! সাথে বেড সোর। বাঁচবেন না বেশি দিন মনে হলো।দিদির বাড়ির সামনে থেকে ট্রেকার ধরলাম। ট্রেকারের পিছনে বসার জায়গা পেলাম। আমার পাশে মোটাসোটা চেহারার এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বসে আছেন। স্বামী স্ত্রী বলেই মনে হলো।কোন একটা বিষয়ে চাপা কথা কাটাকাটি চলছে দুজনের। উল্টোদিকের সিটে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, সঙ্গে একটি অল্প বয়সী মেয়ে বসে। মনে হলো নাতনি ভদ্রলোকের।নাতনির কথাবার্তা শুনে মনে হলো বৃদ্ধ অসুস্থবোধ করছেন। গায়ের জামা কাপড় দেখে মনে হলো কোন অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে ফিরছেন।যা গরম পড়েছে !এই অবস্থায় অনুষ্ঠান বাড়ির খাওয়া দাওয়া মানেই তো শরীর যন্ত্রণা ! মেয়েটির পাশে একটা বাচ্ছা ছেলে বসে। আপনমনে বাইরের

চলমান জগৎ দেখছে আর উল্টোদিকে বসা মা বাবাকে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। ওরা বিরক্ত হচ্ছেন ছেলের প্রশ্নে। ওরা বেশি আগ্রহী নিজেদের মধ্যে ঝগড়াটা চালিয়ে নিয়ে যেতে। মুচকি হেসে বাইরে তাকালাম। ট্রেকারটা খুব দুলছে নৌকার মতো। রাস্তায় বড়ো বড়ো গর্ত বোঝা গেল। জরুরী ভিত্তিতে মেরামত না করলে বড়ো কোন দূর্ঘটনা ঘটে যাবার সম্ভাবনা।

হঠাৎ ট্রেকারের দুলুনিতে বৃদ্ধ বমি করে বসলেন। বমি গিয়ে পড়লো সামনে বসা ভদ্রমহিলার গায়ে। খুব গন্ধ ! দুপুরের খাবার সব উঠে এসেছে বোঝা গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অসুস্থ বোধ করছেন খুব। আরো বমি হবে মনে হলো। তাড়াতাড়ি ওনাকে বাইরের দিকে সরিয়ে বসাতে বললাম। মেয়েটির মুখে চোখে অসহায়তা। বৃদ্ধ আরো দুবার বমি করলেন। মনে হলো হালকা হলেন কিছুটা। আমার জলের বোতলটা থেকে ওনার মুখে চোখে ঘাড়ে জল দিলাম। ট্রেকারের হাওয়ায় একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলেন বৃদ্ধ।

এবার শুরু হলো ভদ্রমহিলার বিস্ফোরণ। বৃদ্ধকে রীতিমত বাক্যবাণে বিদ্ধস্ত করতে চাইছেন ওনার দামী শাড়িতে বমি করার জন্য।চোখ মুখ থেকে আগুন বেড়োচ্ছে যেন। স্থান কাল পাত্র ভুলে গালিগালাজ করে চলেছেন । সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ওনার স্বামীও। বুঝলাম, এতোক্ষণ চলতে থাকা রাগের স্থানান্তর হচ্ছে। উপস্থিত সকলে বৃদ্ধের অসুস্থতার কথা বললেও থামছেন না ওনারা।অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ চলছে বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে। এরকম প্রতিক্রিয়ায় বৃদ্ধ আরো যেন অসুস্থ বোধ করছেন। সঙ্গের নাতনিও বাক্যহারা। অসহায় করুণ মুখে সকলের মতো সেও বসে। সকলে বিরক্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার ব্যবহারে। মানবিকতা বলে কিছু থাকবে না? মনে পড়ে গেল বাবার কথাটা।মানুষ সেই যার মান ও হুঁশ দুটোই আছে। বৃদ্ধের জন্য একরাশ খারাপ লাগা তখন আমার বুকের পাঁজরে।

ট্রেকার অবশেষে ষ্টেশনে পৌঁছাল। বৃদ্ধের বাড়ি কাছাকাছি।তাই একটা দোকানের বেঞ্চে ওনাকে বসিয়ে দিলাম। ওনার নাতনি বাড়িতে খবর দিয়েছে।বাড়ির লোক আসছে ওনাকে নিয়ে যেতে।

আশ্বস্ত হয়ে ওনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেলাম উল্টোদিকের কলে মুখ হাত ধুতে। ঠান্ডা জলে একটু সতেজ হওয়া গেল। হঠাৎ দেখি পাশে ট্রেকারের সেই যুগল।জল দিয়ে কাপড় ধুতে ধুতে আমাকে উদ্দেশ্য করে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন :"দেখলেন বুড়ো ভামের কান্ডটা।লোভী বুড়ো। ঘাটের মড়া। ভালো ভালো খাবে বলে এই গরমেও গেছে অনুষ্ঠান বাড়িতে।হজম করতে পারবে না,বমি করবে লোকের গায়ে"। সঙ্গে আগে শোনা গালাগালের রিপ্লে ! বাচ্ছা ছেলেটা পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে।ভেতরে যেন আগুন জ্বলে উঠলো।রাগত গলায় বলে উঠলাম :"শাড়ির নোংরা তো জল দিয়ে ধুয়ে নিলেন। কিন্তু এতোক্ষণ যে এই ছোট্ট বাচ্চাটার কানে আপনি শব্দ বমি করে গেলেন তা পরিস্কার করবেন কিভাবে"? ট্রেন আসার আওয়াজে এগিয়ে গেলাম ট্রেনের দিকে একটা অমানবিক ঘটনার ছায়া বুকে নিয়ে।

লুডো

সুচেতা ঘোষ

আজ অনেক দিন পর পুরনো অ্যালবামগুলো উলটে পালটে দেখছিলেন নমিতাদেবী । প্রতিটা ছবি যেন অনেক দিন পর কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। তাই নমিতাদেবীও স্মৃতির হাত ধরে পৌঁছে গেছেন বহু পুরনো দিনে। তাঁদের বিয়ে,নানান জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, তারপর দুই সন্তানের জন্ম, সবই ক্যামেরা-বন্দী করে ধরে রাখা হয়েছে । এসব কাজ নমিতাদেবীর স্বামী সোমনাথবাবুর। তবে মুহূর্তগুলো নিঃসন্দেহে ভীষণ দামি , তা যেন আজ ভীষণভাবে অনুভব করছেন নমিতাদেবী। এইতো এই ছবিটায় বাড়ির সবাই মিলে লুডো খেলা হচ্ছিলো , তখন একান্নবর্তী সংসার। তাঁর দেওরের পরিবারও তখন এই বাড়িতেই থাকতো। দেওরের দুই ছেলে মেয়ে। বাড়ির এই চারটে ছোটকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যেত সকলে। তাই চুপ করে বসিয়ে রাখতে লুডো খেলতে বসানো হতো। ওরা খেলত আর দুজন বাবা পাশে বসে খেলা শেখাত। সেই ফাঁকে রান্নার কাজ

এগিয়ে নিতেন নমিতাদেবী আর ওনার জা। এই লুডো খেলা নিয়ে যে কি উত্তেজনা হতো, তা ওদের স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবেনা। এই দৃশ্য বড় উপভোগ করতেন নমিতাদেবীর শ্বশুরমশায় আর শাশুড়িমা। ওঁরা বাজি ধরতেন আজ এ জিতবে, কাল ও জিতবে বলে। যেই জিতুক সব নাতিনাতনিই উপহার পেতো ওনাদের কাছ থেকে । সবাই মিলে হইহই করে কাটতো দিনগুলো। সে দিন আর নেই। সোমনাথবাবু গত বছর পরলোক গমন করেছেন। দুই ছেলে বউ- বাচ্ছা নিয়ে প্রবাসী, চাকরির সূত্রে। তারা আর কাজের চাপে আসতে পারেনা। বছরে ১বার আসে, দুর্গা পূজার সময়। তাই সারাবছর তাদের জন্য অপেক্ষা ,পুরনো অ্যালবাম-এর ছবি আর রোজ সোমনাথবাবুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মনের সমস্ত কথা বলা- এই নিয়েই নমিতাদেবীর জীবন।

দেখতে দেখতে পূজা এসে গেল। আর কয়েকদিন পরেই আসবে নমিতাদেবীর ছেলে-বউমারা, আর ৩ নাতি-নাতনি। ফোনে কথা হয়েছে নাতি-নাতনিদের সাথে। ভিডিও-কলে। সবার আবদার ‘ঠাম্মা এবারে আমাদের লুডো খেলা শেখাতে হবে’। পাশ থেকে বড়

বউমা কলি বলেছিল, 'মা, দেখছো তো, তুমি গল্প করেছো যে ওদের বাবারা ছোটবেলায় লুডো খেলত, এখন ওরাও খেলবে'। নমিতাদেবী অবশ্য ওদের এই আবদারে খুশিই হয়েছিলেন। আর ২দিন পরই ষষ্ঠী। আজ বাড়ি ফিরছে ওরা সব। আর তাই আজ খুব ব্যস্ত তিনি। ঘরদোর গোছানো, রান্নাবান্না, নাতি-নাতনির খেলনাগুলো আলমারি থেকে বার করা, এরকম খুঁটিনাটি কাজগুলো মালতীকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছিলেন। মালতীকে ওনার দেখাশোনার জন্য রাখা হয়েছে। এবাড়িতেই থাকে। সব কাজ হয়ে গেলে নমিতাদেবী নিজে ছেলেদের ছোটবেলার ঘরে গিয়ে নিয়ে এলেন লুডোর বোর্ডটা। কত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, খুনসুটি আর মজার সাক্ষী এই লুডোর বোর্ড।

সন্ধ্যেবেলায় সবাই মিলে চা-কফির আড্ডায় বসে বড় ছেলে অতীশ বলল, 'মা, তুমি আমাদের সবার পছন্দ মতো সব আনিয়ে রেখেছ মনে করে? আমার পছন্দের কফি,তাও আমার পছন্দের কাপে, কলির পছন্দের রজনীগন্ধা ফুলের স্টিক'।ছোট ছেলে সতীশ বলল, ' আরও আছে, আমার পছন্দের মিউজিক সিস্টেম, অনুর পছন্দের রবি ঠাকুরের বই'।ছোট বৌমা এসে

নমিতাদেবির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, ‘এই বয়সে এতো কিছু মনে রাখো কিকরে তুমি?’ । নমিতাদেবী বললেন, ‘তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বলতো? সারা বছর তো এই দিনগুলোর জন্যই অপেক্ষা করে থাকি’। ‘ মা, আমরাও কিন্তু তোমাকে খুব মিস করি’, কলি বলল ‘এবার তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। দেখো এখন তো আমাদের উচিত তোমার সেবা করা। অথচ আমরা সেই সুযোগটাই পাইনা’। ‘হ্যাঁ ,আর আমাদেরও তো তোমাকে পেতে ইচ্ছা করে বল। সেই একবার দেখা বছরে। তার চেয়ে তুমি চলো, কিছুদিন আমার কাছে, কিছুদিন দাদার কাছে থাকবে। ছেলেমেয়েগুলোও ওদের ঠাম্মাকে পাবে’।সতীশের কথায় নমিতাদেবী হেসে বললেন, ‘এই বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবো বাবা? বুড়ো বয়সে আর ভিটে ছাড়া করিস না বাপু’। শুনে সতীশ বলল, ‘ বাড়ি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবেনা। বাড়ির লোকেশন ভালো। প্রোমোটাররা লুফে নেবে বিক্রি করতে চাইলে’। এবার চুপ করে গেলেন নমিতাদেবী। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। সোমনাথ বাবুর ছবির সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন ‘এই বাড়ি আমার কাছে স্বর্গ। অনেকদিনের

বন্ধন এই বাড়ির সঙ্গে। এই বাড়ির সব জায়গায় কত স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। তোদের ছোটবেলার স্মৃতি, বড় হওয়ার প্রতি মুহূর্তের সাক্ষী এই বাড়ি। তোরা এখন এখানে থাকিস না, কিন্তু তোদের স্মৃতিগুলো নিয়ে আমি বেশ আছি। আর সবচেয়ে বড় কথা এই বাড়িতে তোদের বাবা আছেন। হয়তো ওনার অস্তিত্ব বাকিরা বুঝবেনা, কিন্তু আমি জানি উনি আমার আশেপাশেই আছেন সবসময়। আর যে মানুষটা আমাকে সারাজীবন সঙ্গ দিল, শেষ বয়সে তাকে একা ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়'। সতীশ এসব শুনে বলল, 'আমরা কি তবে ফ্যালনা?' এই কথার উত্তর দেওয়া আর হলনা। সেই সময় খুদেগুলো খেলছিল পাশের ঘরে, এসে ধরল ঠাম্মাকে, 'ও,ঠাম্মা একটা গল্প বল'। নমিতাদেবী সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সতীশ আর অনুর মেয়ে পুচকু বলল, 'ঠাম্মা, তুমি কাঁদছ?' তখন অতীশের ছেলে বিকু বলল, ' কে বকেছে তোমাকে? তাকে আমি ভীষণ বকে দেব'। ওদের কথা শুনে হেসে ফেললেন নমিতাদেবী। 'ঠাম্মাকে একদম জ্বালাতন করবেনা কিন্তু', ৩ খুদেকে বলল কলি। তারপর যে যার কাজে চলে যেতেই ঠাম্মার কাছে গল্প শুনতে বসলো বিকু, রিকু আর পুচকু।

পঞ্চমীর সকালে চা খেতে খেতে সতীশ আর অতীশ ব্যাল্কনিতে বসে গল্প করছিল । 'আজ একজন প্রোমোটার আসবে বুঝলি, বাড়িটা দেখতে'। সতীশের কথায় অবাক হয়ে অতীশ বলল, 'কিন্তু মা তো রাজি নয়। মাকে কষ্ট দিয়ে এভাবে বাড়ি বিক্রি করতে ভালো লাগবে তোর?' 'প্রথম প্রথম কষ্ট হবে, তারপর সব অভ্যাস হয়ে যাবে। খুব ভালো থাকবে মা আমাদের সঙ্গে তুই দেখিস', সতীশ খুব জোর দিয়ে বলল।

পঞ্চমীর সন্ধ্যে। পুজোর বাজার করা হয়েছিল অনলাইনে। সেইসব দেখা হচ্ছিলো এতক্ষণ। সবার জন্য চা ,কচুরি এনে অনু বাচ্চাদের বলল, ' সব জামাকাপড় দেখা শেষ, এবার তোরা খেল'। অমনি ঠাকুমার কাছে এসে বায়না ' চলো এবার লুডো শিখিয়ে দাও'। আজ সকালে প্রোমোটার আসায় নমিতাদেবী এতক্ষণ কারোর সাথে কথা বলেন নি। দুপুরে ভালো করে খাননি, নিজের ঘরে চলে গেছেন তাড়াতাড়ি। বিকেলে জোর করে নিয়ে এসেছে অতীশ আর কলি। জামাকাপড় দেখতে দেখতেও কোন কথা বলেননি। কিন্তু নাতিনাতনিরা এসে ধরতেই উনি লুডো

নিয়ে বসলেন ওদের সঙ্গে।আর ওদের শেখাতে গিয়ে সব দুঃখ যেন ভুলে গেলেন। উনি শেখাতে শেখাতে সতীশ অতীশও এসে যোগ দিলো।সবাই মিলে বুঁদ হয়ে গেল খেলার মধ্যে। ‘এই ছক্কা ফেল দেখি’, ‘ চারে কাটা তোর ঘুঁটি’। কথাগুলো যেন প্রাণবায়ু অক্সিজেনের চেয়েও প্রিয় মনে হল। সেই পুরনো দিনগুলো যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠলো। নিস্তব্ধ ঘরগুলো যেন আবার শব্দমুখর হয়ে প্রাণ ফিরে পেল। নতুন আনন্দের মেজাজে সরগরম হয়ে উঠলো গোটা বাড়ি। নমিতাদেবী হাসি হাসি মুখে সোমনাথবাবুর ছবির সামনে এসে দাঁড়ালেন। ‘দেখেছো, আজ আবার সবাই একসাথে হয়েছে। এ এমন এক খেলা’। অমনি দেখলেন অনু ফোনে ওদের লুডো খেলার বিভিন্ন মুহূর্তের ফটো তুলে নিলো। দেখে আনন্দে চোখে জল এলো নমিতাদেবীর।

রাতে খাওয়ার সময় সবাই মিলে খুব হইচই হল। রিকু জিতে গেছে লুডো খেলায়। আর সবাই ঠাম্মার কাছ থেকে একটা করে কমিক্স বই পেয়েছে । কাল থেকে পূজো শুরু,ঠাকুর দেখতে বেড়িয়ে কে কি পরবে, কে কি খাবে এইসব আড্ডা চলছে। কলি বলল, ‘তোমাদের ৩জনের কাজ হল ঠাকুমার সাথে সকাল

সকাল নতুন জামা পরে পুজো দিয়ে আসবে’। বিকু,রিকু,পুচকু সঙ্গে সঙ্গে ‘আমি যাব,আমি যাব’ বলে চিৎকার করে উঠলো। সবাই খুব খুশি। নমিতাদেবী বললেন, ‘সবাই যাবে। কাল কে ক’টা ঠাকুর দেখবে গুনবে কিন্তু, সকাল থেকেই গোনা শুরু, কেমন!’ অতীশ বলল, ‘সত্যি পুজোর কটা দিন কিন্তু বেশ কাটে হইহই করে। আজ আবার ছোটবেলার সেই দিন গুলোর কথা খুব মনে পড়ছে। চার ভাইবোন মিলে গোটা বাড়িটা একদম মাতিয়ে রাখতাম। এই বাড়িটা আমাদের অনেক সুখ-দুঃখের সঙ্গী। এখন আর হারানো সেই দিনগুলো চাইলেও ফিরে পাওয়া যাবে। স্মৃতিটুকুই সম্বল’। সতীশ বলে উঠলো, ‘ঠিক বলেছিস, এই বাড়িটা আছে বলেই আমরা বছরে একবার হলেও এক জায়গায় হতে পারি, এত আনন্দ করতে পারি। ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে আজ আমরা কিছুক্ষণের জন্য ছেলেবেলায় কাটিয়ে এলাম যেন। আমার খুব ভুল হয়ে গেছে মা। আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। এ বাড়ি আমি তোমার থেকে কেড়ে নেব না। এখানেই তুমি থাকবে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের সাথে ঘুরতে যেও। আমরা সত্যিই তোমাকে খুব মিস করি’। নমিতাদেবীর মুখে তৃপ্তির হাসি।

পরদিন ষষ্ঠীর পুজো দিতে গিয়ে মা দুর্গার মমতাময়ী মুখখানি দেখে মন ভরে গেল নমিতাদেবীর বাড়ির সবার। নাতিনাতনিদের প্রনাম করিয়ে নিজেও গড় হয়ে প্রনাম করলেন। ‘প্রতিবার যেন এমন ভরা সংসার নিয়েই তোমায় দেখতে আসতে পারি’।

অহং সম্পর্ক

সুব্রত ব্যানার্জ্জী

স্নান সেরে পরিপাটী করে সাজগোজ করল পৌলমী । আজ সে খুব খুশি । গুণগুণ করে গান গায়ছে , আর দরকারি কাগজপত্র ব্যাগে রাখছে । আজ প্রথম দিন , কোনও ভুল হলে চলবে না ।

হ্যাঁ , দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আজ সে চাকরি করতে যাচ্ছে । এই দিনটার জন্যই এত পরিশ্রম , এত লেখাপড়া । মা আশীর্বাদের ফুল নিয়ে ভেতরে এল।

" কি রে , এভাবে কেউ শাড়ি পরে ? "

পৌলমী আড়চোখে মাকে দেখে বলল , "দেখো না , কতক্ষন ধরে চেষ্টা করছি , তাও ঠিকঠাক বাগে আনতে পারছি না শাড়িটা।"

"ছার , তোর দ্বারা হবে না , আমি পরিয়ে দিচ্ছি । কিন্তু তারাতারি শিখে নে , নইলে বিয়ের পর কি করবি ! " মা হেসে বলে ।

বিয়ের কথা শুনতেই মুখে একটা মুচকি হাসি খেলে গেল পৌলমীর । মাকে প্রণাম করে বলল , "আশীর্বাদ করো মা , আমি যেন চাকরিতে সফল হই।"

"আমি জানি তুই সব সামলাতে পারবি" , মাথায় হাত রেখে পরম মমতায় বলে , "এবার সাবধানে আয়। "

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে পৌলমী। পেছন থেকে শুনতে পায় মা চিৎকার করে বলছে, "টিফিন রেখে দিয়েছি ব্যাগে, তোর প্রিয় আলুর পরোটা ।"

বাস ধরে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেল । অফিসে প্রবেশ করে ম্যানেজারের সাথে

দেখা করে প্রয়োজনীয় সব নিয়মকানুন সম্পন্ন করল ; তারপর নিজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসল ।

এটা একটা বেসরকারি ব্যাঙ্ক । গ্র্যাজুয়েশনের পর চাকরির জন্য নানা সংস্থায় ইন্টারভিউ দিলেও সরকারি চাকরি কপালে জুটল না । অগত্যা এটাই নিতে হল । যদিও বেশ সম্মানজনক পদ পেয়েছে সে ; মাস মাইনেও সন্তোষজনক ।

মাষ্টার্স করার ইচ্ছে ছিল তার , কিন্তু পারিবারিক অবস্থার কথা চিন্তা করে সেই ইচ্ছা ত্যাগ করে । বাবা মারা গেছেন পাঁচ বছর হল । বাবার চাকরিটা মা পেলেও সেটা খুব নিম্নমানের , কারণ মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম । যে টাকা মা পায় , তাতে কোনভাবে সংসার চলে , বেশি সুখ সেখানে স্থান পায় না ।

চাকরিটা পাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই পৌলমী আর তার মা , দুজনেই খুশি হয়েছে প্রচণ্ড । যদিও মা বলত "তোকে কষ্ট করে চাকরি করতে হবে না , আমি আছি তো । তাছারা একটা ভাল পাত্র দেখে তোর বিয়ে দিতে পারলেই আমার শান্তি । "

"কি যে বলো না মা , আমি এখন বিয়ে করব না । আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই ।" পৌলমী প্রতিবাদ করে ।

চাকরির কথা শুনে আরেকজনও আপত্তি করেছিল। রজত , পৌলমীর কলেজের বন্ধু । বন্ধু বলা ভুল হবে , রজত তার কলেজের সিনিয়র ছিল । একটা প্রজেক্টের ব্যাপারে আলাপ শুরু হয় । তারপর সেটা বন্ধুত্ব হয়ে কখন যে ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে গেল , কেউ বুঝতেও পারেনি ।

রজতও একটা ছোটখাট চাকরি পেয়েছে , যদিও তার চাকরির প্রয়োজন ছিল না , বাবার প্রচুর সম্পত্তি। এক বছর আগে থেকেই সে পৌলমীকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে ।

অফিসে বসে এসব কথা চিন্তা করছিল পৌলমী । আজ রজতের সাথে দেখা হওয়ার কথা । ছুটির পর তাই যত তারাতারি সম্ভব বাইরে বেরল । ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে একটু দেরী হয়ে গেছে । এদিক ওদিক

তাকাতেই নজরে এল পৌলমীর প্রিয় রজত তার প্রিয় বাইকে গোমড়া মুখে বসে আছে । কাছে গিয়ে বলল -

"সরি, একটু দেরী হয়ে গেল , কতক্ষন এসেছ তুমি?"

"হ্যাঁ , এখন তো এরকম হবেই । ভাল চাকরি করছ । "রজত তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ।

পৌলমী চমকে উঠল, “এসব কি বলছ তুমি , আমি চাকরি করছি এতে তো তোমার খুশী হওয়া উচিত । বেশ ছাড়ো , কোথায় যাবে চল ।"
রজত বাইকে স্টার্ট দিয়ে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়াল । দুজনে খাওয়া দাওয়া শেষ করলে পৌলমী বিল মেটাতে গেল । রজত গম্ভীর গলায় বলল, "থাক আর চাকরি গিরি দেখাতে হবে না , আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি । "

পৌলমী খুব আঘাত পেল, " এভাবে কেন বলছ , আজ আমার চাকরির প্রথম দিন, নিজের জমানো টাকায় তোমাকে কিছু খাওয়ালে দোষ!"

এরপর একমাস কেটে গেছে। রজত কেমন পাল্টে গেছে। মাইনে হাতে পেয়ে ফোন করতে শুধু একটা কথা বলল , "বাহ্ ভালো । "

পৌলমীও এখন নিজেকে সরিয়ে আনছে।

একদিন অফিস ছুটির পর সে বাড়ির জন্য কিছু খাবার নিতে রেস্টুরেন্টে পৌঁছাল । ভেতরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠল ! কোনার দিকের সোফা দখল করে বসে আছে রজত , পাশে তারই বয়সি একটা মেয়ে । দুজনে এতটাই কাছাকাছি আর গল্পে মশগুল যে তারা পৌলমীর উপস্থিতি টেরই পেল না ।

প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে পৌলমী আরেকবার দেখে নিল টেবিলটার দিকে । তারপর মুচকি হেঁসে বাইরে বেরিয়ে এল । আজ তার মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে । মনে হচ্ছে একটা বোঝা নেমে গেছে । রজতের সাথে সব সম্পর্ক ত্যাগ করল আজ থেকে । বুক ভরে শ্বাস নিল পৌলমী , তারপর বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল । আজ সে প্রকৃত স্বাধীনতা খুঁজে পেল ।

অন্যরকম জীবন

আবীর মহাপাত্র

বছর বছর মা আসেন, এবার পুজো, আমাদের অন্যরকম। দু মেয়ের বিয়ে হয়েছে, এক মেয়ে আর আমার সংসার।

যখন এলাম বউ হয়ে তখন সবে কুড়ি। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, স্বামী নিয়ে ভর্তি ঘর। স্বামীর সাথে গেলাম চাকরি পেল যেথা। নতুন ঘর বাঁধলাম হোথা। অল্প বেতনে মানিয়ে নিয়ে বাঁচিয়ে দিতাম কিছু ঘরে পাঠাতে। একে একে তিন মেয়ে এল কোল জুড়ে। শরীর গেল ভেঙে। আর না এখন, শরীর হোক আগের মতন, তখন যাবে দেখা। শ্বশুর শাশুড়ি একা, চাইলেন বড় নাতনি ওখানে থাক। বড় হোলো একা, তাই মেজ মেয়ে যোগ দিল। একবার ছোটটি এসে দিদিদের ছাড়তে চাইল না। ঠিক হল বড় মেয়ের মাধ্যমিক পর্যন্ত আমিও থাকি। বছর পরে যখন গেলাম ফিরে, বুঝলাম পুড়েছে কপাল। নিশ্চই করেছে বে দ্বিতীয় বার! বলল, বারবার স্কুল পাল্টানো নয় ভালো, আমি তো যাব

বছরে চার বার। আমাকে দিয়ে গেল। পারিনি দিতে ছেলে, তাই নিলাম মেনে।

মেজ মেয়ের বে-র সময় চাইল তারে আনতে। সে মেয়ে আর চায়নাতো নিজেকে নুকিয়ে রাখতে। সে দিয়েছে ছেলে। আপত্তি করলে স্বামী বলল, আর দেবেই না মেজর বে! ননদ, ঠাকুরপো নিল দাদার পক্ষ। তবু বেশ লাগল প্রথমবার। পুচকে টাকে নিলাম আপন করে। কিন্তু পরের বারই সতিনের মুখ হাঁড়ি, একবেলা থেকেই গেল উঠে ঠাকুরপোর ঘরে। তারপর স্বামীও মাড়ায় না এদিক। আমার মেয়ে আর যেন ওর মেয়ে নয়! টাকা দেওয়া হল অনিয়মিত। পুজো তে বাড়তি কিছুই না। শরীর খারাপ, মেয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠান কিছুই চায়না শুনতে। শহর ছেড়ে সম্পত্তির দখল নিতে বাড়ি বানালো একটু দূরে। অসম্মান আর অভাব সইতে না পেরে করলাম খোরপোষের কেস। টাকা দেওয়া করল একেবারেই বন্ধ, স্বাভাবিক, কিন্তু কেস চলতে লাগল অস্বাভাবিক। কখনও ওদের উকিল নয় প্রস্তুত, বা উনি গর হাজির, বা অসেননি জজ! শেষমেশ অস্থায়ী খোরপোষ হল শুরু। কিন্তু বকেয়া পেয়ে মেয়ে জামাইয়ের ঋণ শোধ করার আগেই এল মারণ

ভাইরাস! আবার সব বন্ধ। স্বামীর সেন্ট্রালের চাকরি, আর আমার জীবন অন্যরকম।

ঘটনা নাকি কাকতলীয়

অর্ঘ্যদীপ দাস

কখনো কখনো কিছু কিছু ঘটনা জীবনে ঘটে যা বেশ রহস্যজনক। অবশ্য মাঝে মাঝে ভাবি হয়তো সেই দিনের ঘটনা মোটেই রহস্যজনক নয়, কিছুটা কাকতলীয়, কিন্তু সেই দিনের সাথে যে এক বিষাদময় ঘটনা লুকিয়ে আছে , সেটাই বা ভুলি কি করে। যাক ভনিতা ছেড়ে আসল কথায় আসি। যারা পড়বে তারা নিজেরাই ঠিক করুক এটা রহস্য নাকি শুধু কাকতলীয়।

দিনটা ছিল জানুয়ারি মাসের মাঝের এক দিন। আমরা চার বন্ধু অর্থাৎ অনিন্দ্য, সুমন , দীপন আর আমি গেছিলাম ঝাটিপাহারী এক বন্ধুর বাড়িতে দিনটিনেকের জন্য। ফেরার দিন এদিক সেদিক গল্প করার জন্য বিকেলের ট্রেন টা মিস হল, অগত্য ঠিক করলাম রাতেই একবারে ডিনার করে বেরোবো। তাই রাত ১১

টার ট্রেন টা ধরব ঠিক করলাম। কিন্তু কোনো এক জায়গায় লাইনের গন্ডগোল থাকায় সেই ট্রেন এল ১ ঘণ্টা পর। এত রাতে ট্রেন এ খুব বেশি লোক ওঠে না। যারা ওঠে বেশিভাগ কলকাতা যাচ্ছে জিনিসপত্র বিক্রির উদ্দেশে। তাই কামরা গুলো প্রায় ফাঁকাই। আমরা যে কামরায় উঠলাম সেটা যেন অন্য কামরা থেকেও বড্ডো কম লোক। হাতে গোনা ৫-৬ জন। বেছে বেছে একটা ফাঁকা কূপ বেছে নিলাম। আমরা বাদে সেই কুপে একটি মাত্র লোক বসে আছে। লোকটাকে দেখেই বেশ বয়স্ক মনে হল। লোকটার শরীর আপাদমস্তক চাদর দিয়ে ঢাকা, হাতে একটা সাদা খাতা নিয়ে জানলার ধারে বসে একমনে যেন কিছু আঁকছে। আমাদের দেখে একটু সরে বসল। আমরা বিশেষ পাত্তা দিলাম না, নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর লোকটি নিজে থেকে আমাদের দেখে বলল "যাক ভেবেছিলাম সারা রাস্তা আমাকে একাই যেতে হবে। তোমাদের দেখে একটু স্বস্তি বোধ হল। টা তোমরা কতদূর যাবে?"। আমাদের মধ্যে সুমন বলল "হাওড়া নামব"। এই প্রথম লোকটার মুখটা দেখতে পেলাম। মুখের মধ্যে বয়স্কর ভাব স্পষ্ট। লোকটি বলল "টা ভাল। এতটা

রাস্তা একা যেতে সচন্দ বোধ করছিলাম না। তোমাদের দেখে ভাল লাগল। বেশ গল্প করে যাওয়া যাবে। দেখ কথায় কোথায় আমার নাম বলি নি। আমার নাম পূর্ণেন্দু সেন। আমি একজন সামান্য শিল্পী। পোর্ট্রেট আঁকি।" এই বলে লোকটা তার খাতা থেকে বেশ কয়েকটা ছবি দেখাল। প্রত্যেকটাই বয়স্ক লোকের অবয়ব। দীপন বলল "আপনার এই বয়সেও হাতের আঁকা তো বেশ ভাল। আমার বাবাও এককালে ছবি আঁকতো। তবে আপনার এ ব্যাপারে বেশ পারদর্শিতা আছে বোঝাই যায়।" পূর্ণেন্দু বাবু একটু হেসে বলল "তা ওই আছে বই কি। তবে আমি যে সে পোর্ট্রেট আঁকি না। তোমরা যে ছবি গুলো দেখছো, তারা প্রত্যেকেই তোমাদের মতই বয়স। এগুলো তাদের ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি।" কথাটা শুনে আমাদের বেশ অবাক লাগল। আমাদের মনের কথা পূর্ণেন্দু বাবু বুঝতে পারল। তাই বলল "তোমরা হয়তো অবাক হলে কথাটা শুনে। আসলে আমি কোনো লোকের দিকে কিছুক্ষণ দেখলে তার ভবিষ্যতের অবয়ব আমার চোখে ফুটে ওঠে। আমি তাই আঁকি।" এই কথাটা আমাকে বেশ অবাক করাল। শুনেছি জ্যোতিষীরা ভবিষ্যত দেখতে পারে। কিন্তু জ্যোতিষীরা ভবিষ্যতের অবয়ব

দেখতে পারে কিনা টা অবশ্য আমার জানা নেই। আমাদের মধ্যে সুমন বরাবরই কৌতহল স্বভাবের ছেলে। ও সরাসরি বলল "তা দাদু, আমার একটা বয়স্ক কালীন ছবি এঁকে দিন না। আমি দেখতে চাই কেমন দেখতে হব আমি"। উনি বললেন "অবশ্যই। টা তুমি কোন বয়সের ছবি আঁকতে চাও বল?" । সুমন একটু হিসাব কষে বলল "আমার বয়স এখন ২৬। পঞ্চাশ বছর পর আমার বয়স হবে ৭৬। বেশ বয়স্ক। সেই সময়ের একটা ছবি এঁকে দিন।" লোকটি এবার সুমনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর এক মনে সাদা পাতায় পেন্সিল দিয়ে আঁকতে লাগল। মিনিট পনেরো পর আমাদের সামনে সুমনের যে বৃদ্ধ অবস্থায় প্রতিচ্ছবি দেখাল। টা দেখে সুমন বলে ভাবতে আমাদের বেশ কষ্টই হচ্ছে। মুখের মিল থাকলেও, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সুমন বরাবরই স্থূলকায় প্রকৃতির ছেলে। এই নিয়ে ওর বেশ গর্ব আছে। সে যে এরম শীর্ণকায় চেহারায় পরিণত হবে সেটা ভাবতে বেশ কষ্টই হচ্ছে। সুমনও ছবিটা দেখে বেশ দমে গেল। এই নিয়ে বেশ একপ্রস্ত হাসাহাসি হল। কিন্তু ভবিষ্যত কেই বা দেখেছে। এরপর একে একে দীপন আর আমারও ছবি আখলো। আমার ছবি টা আমি

নিজেই বেশ অবাক হলাম। আমার মাথায় বেশ ঘন চুল আছে। এই চুলের স্টাইলের মধ্যে আমার একটা পার্সোনালিটি ফুটে ওঠে। কিন্তু আমার শেষ বয়সের ছবিতে যে এরম টাকের সৃষ্টি হবে টা আমি ভাবতেই পারিনা। অবশ্য আমার বাড়িতে এই ধারা টা আছে। আমার বাবার বয়স ৫০, কিন্তু এর মধ্যেই তার মাথায় বেশ টাকের উদ্ভব হয়েছে। শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষদের এই ব্যাপারটা ছিল। সুতরাং আমার যে এরম হবে না, তার গ্যারান্টি নেই। তবে যাই হোক ভদ্রলোকের ছবিতে বেশ নৈপনতার পরিচয় আছে। আমরা আমাদের ছবি দেখে বেশ হাসাহাসি করছিলাম। আমাদের মধ্যে অনিন্দ্য বেশ শান্ত স্বভাবের ছেলে। এতখুন অবধি ও খুব বিশেষ কথা বলেনি। তাছাড়া ও ভবিষ্যত এসব কিছু বিশ্বাস করে না। তবু আমরা ওকে বলতে লাগলাম ওর ছবি আকার জন্য। কিন্তু ও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল মুখে বলল "দেখ ভাই, আমি এসব ভন্দবাজিতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না। তোদের একটা যা হক ছবি একে দিচ্ছে। আর তোরা সেটা ভবিষ্যতের ছবি বলে মেনে নিচ্ছিস। মানছি লোকটার আকার হাত দুর্দান্ত। তবে ভবিষ্যতের গল্পটা লোকঠকানো।" ভদ্রলোক এতক্ষুন চুপ ছিল, এবার

বলল "দেখ ভাই। আমি বিন্দুমাত্র ভুল কিছু বলছি না। তোমাদের দিকে তাকিয়ে আমি যেরম অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। আমি সেরকমই আকছি। যদি আমি ভুল আঁকি আমার গুরুর নির্দেশে আমি এই গুন হারাবো। এবার বিশ্বাস অবিশ্বাস তোমাদের ওপর।" ভদ্রলোকের কথার মধ্যে একটা যেন জোর ছিল কেউ তা অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু অনিন্দ্য যেন মানতে নারাজ। অবশেষে অনেক জোরাজুরির পর ও আকাতে রাজি হল, কিন্তু ওর কালকের ছবি। এরপর পূর্ণেন্দু বাবু ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে নিজের খাতায় মনোনিবেশ করল, কিন্তু ১০ মিনিট কেটে গেলেও ছবি তো দুর একটা পেন্সিলের আঁচড় পড়ল না, আমরা বেশ আশ্চর্য্য হলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা, উনি বলল "ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তো কোনো অবয়ব দেখতেই পেলাম না"। "কি বলতেন চাইছেন,কালকেই আমি থাকবো না নাকি। আপনি তো দেখছি দিনে দুপুরে ঠগের ব্যবসা খুলে বসেছেন। বেশ ভালই আছেন" বিদ্রুপের সুরে বলল অনিন্দ্য। "দেখ আমি যা দেখতে পাই তাই বললাম, এর মানে এটাই দারাচ্ছে, মানুষের ভাগ্য কি ঠিক করা যায়" পূর্ণেন্দু বাবু বলল ।

"আপনি স্বীকার করুন, আপনি আঁকতে পারবেন না। তোরাও এরম লোককে বিশ্বাস করছিস, কি বলবো তোদের। তোদের মত আকাত মূর্খ আমার বন্ধু ভাবতেও কষ্ট হয়। ভাই তোদের সাথে এখানে বসে এসব অন্ধবিশ্বাস কে প্রশ্রয় দেওয়ার তুলনায় আমার দরজায় দাড়িয়ে হাওয়া খেলে ভালো হয়"। এরপর অনিন্দ্য ট্রেনের দরজার সামনে গেল। আমরাও ওকে আর কিছু বললাম না, আমাদের মনেও বিশ্বাস হতে লাগলো হয়তো উনি সত্যি জোচ্চোর। ৫০ বছর পরের ছবি আঁকা সহজ, কারণ তখন না মিললেও ওনাকে তো আর পাওয়া যাবে না।

দেখতে দেখতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলাম। ভদ্রলোক চুপ করে মাথা নিচু করে ছিল। হয়তো ওর জালিয়াতি ধরা পড়ে যাবে নিজেও ভাবতে পারেনি। তখন ট্রেন খরোগপুরের দিকে চলছে। একটু পরেই আচমকা কামরার সব লাইট সাময়িক নিভে গেল, আর তখনই ঘটলো ব্যাপারটা, হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম, এবং আওয়াজটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ট্রেনের

শব্দে। আওয়াজটা আসছে দরজার সামনে থেকে,অনিন্দ্যর গলা। আমরা ছুটে গিয়ে দরজার সামনে গেলাম। ততক্ষণে কামরার সব লাইট আবার জ্বলে উঠেছে। কিন্তু দরজার সামনে অনিন্দ্য আর দাড়িয়ে নেই। আমরা বুঝতে পারলাম ও আর কখনোই ফিরবে না। সত্যি ভবিষ্যতে কখন কি ঘটে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না।

পথিক

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

কাঁধের ওপরে চাপানো ব্যাগটা বইতে পারছিল না রিজা। রাস্তার একপাশে জলের কল খোলা, ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। মানুষ কবে বুঝবে এই জলের কদর কে জানে? বুঝবে একদিন, জলের জন্যই যেদিন একটা বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে। অবাক লাগে ভেবে, কত আর দাম একটা ট্যাপের। কোটি টাকার ফিল্টার করা বা পাম্প করে তোলা পানীয়জল এভাবে নষ্ঠ হচ্ছে এটা, দেশের, দশের ঠিকে নিয়েছে যারা, তাদের চোখে পড়ে না? ওর চলার পথে দেখেছে একটু খাবার জলের জন্য মরুভূমির তপ্তবালিতে নিজেদের সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে মাইলকে মাইল হেঁটে যায় গ্রামের মেয়েরা। জলের জারিক্যানের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে সমতল থেকে চড়াই ভাঙছে অশীতিপর বৃদ্ধ, শিশু।

কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে, বোতলটা ভরে নিল। একটু দূরে বাঁশের বেড়ার তৈরি একটা চায়েরদোকান দেখে এগিয়ে গেল। বাঁশের তৈরি বেঞ্চে বসে কাঁধ থেকে

ভারী ব্যাগটা নামাল পাশে। অল্পবয়সেই আধবুড়ো হয়ে যাওয়া দোকানি বলার অপেক্ষা করেনি। একটা মিশকালো চায়ের প্যান চাপিয়ে ভাঙা পাখা দিয়ে আগুনটাকে উসকে দিল। “কাঁহা জায়েঙ্গে আপ?” প্রশ্নটা যে ওকেই করা বুঝতে একটু সময় লাগল রিজার। কাঁচের গ্লাসে কালচে লাল রঙের তরল পদার্থ নিয়ে সামনে চলে এল দোকানদার।

“ম্যায় জঙ্গল কি তরফ চল রহা হুঁ। উধার কহিঁ খালি জ্যাগা মেঁ তাম্বু লাগাকর শো যায়েঙ্গে। ইয়ে জঙ্গল মে শের তো নহি হ্যায়?” পারিজাতের উত্তরে অবাকই হল দোকানি। “শের নহি হ্যায় লেকিন ঢোল হ্যায় বহুত। বো বহুত খতরনাক হোতে হ্যায়। আপকো তাম্বুকে সামনে আগ জ্বালানাই হোগা। হ্যায় কুছ জংলী শুওর, হাতী ভী হ্যায়। সবসে বদমাশ হ্যায় ভালু, উনসে বচকে রহেনা জী। লেকিন আপ ইধার কোই গাঁও মে পণহা কিউ নেহি লেতে? ওহী আচ্ছা হোতা” ।

রিজা চায়ের সাথে বেকারীর বিস্কুট চিবোতে চিবোতে ভাবল, সেটা মন্দ হত না। নাঃ আবার এক ঝামেলা। নানারকম কৈফিয়ত দাও, কেন এসেছ, কোত্থেকে

এসেছ, কোথায় যাবে, এসব ভালো লাগে না আর। কথায় বলে নিজের চেয়ে পর আর তার চেয়েও বেশি জঙ্গল ভালো। “কিতনা দূর হ্যায় জঙ্গল ইঁহাসে? পয়দল যা শকতা হুঁ ক্যা?”

“নজদিকই হ্যায়, মেরা দুকান সে লগভগ এক মাইলকে বাদ হি শুরু হো গয়া জঙ্গল। মেরা ঘর ভি জঙ্গলকে পাসই হ্যায়। আপ চাহে তো ম্যায় যা শকতা হুঁ আপকে সাথ। দুকান তো অভি বন্ধ কর দেঙ্গে” ।

সেটা অবশ্য মন্দ হয়না। রিজার কথায়, তাড়াতাড়ি বাসন ধুয়ে, বাঁশ দিয়ে তোলা ঝাঁপ নামিয়ে দড়ি দিয়ে সেটাকে বেঁধে ফেলল, ভিরগু। নিজেই নাম জানিয়ে পরিচিতি বাড়িয়ে নিয়েছে। একটা লড়ঝড়ে সাইকেলের মস্তবড় কেরিয়ারে তুলে নিল রিজার ব্যাগটা। ওর আপত্তি শুনলই না। “মেরা সাইকিল যব হ্যায় তো ইসে বোঝ বনানে সে কেয়া মতলব? চলিয়ে জঙ্গল তক আপকো ছোড় দেতা হুঁ” ।

রাস্তায় কথাবার্তাও চালু রাখল, “রাত মেঁ খানা কাঁহা খায়েঙ্গে? ভুখা রহেঙ্গে ক্যা? চলিয়ে মেরে ঘর, ম্যায়

গরিব হুঁ লেকিন যো হ্যাঁয় ওহী বাঁটকে খায়েঙ্গে একসাথ” ।

অদ্ভুত একটা ভালোলাগায় মনটা আচ্ছন্ন হল পারিজাতের। এই তো সেই ভারতবর্ষ। যেখানে এখনো অতিথিকে নারায়ণ ভেবে, সেবা করে, আনন্দ, তৃপ্তি পায় এই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষেরা। একটা দেশের চেয়েও বড় এদের মন। এদের ভালোবাসা আদি, অকৃত্রিম, নিখাদ। এই দেশের, মানুষের খোঁজেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে ও, আজ বেশ কয়েকমাস ধরে, এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। এরাই তো ওর আপনজন, প্রাণের সাথী।

ওর সদ্য হওয়া বন্ধুকে বলল, “ইধার কোই দুকান ইয়া বাজার নহি হ্যায় কেয়া? ম্যায় আপকে ঘর খা শকতা হুঁ লেকিন পহেলে কুছ সামান লেনা চাহতা হুঁ। কৌন কৌন হ্যায় আপকে ঘর মে?”

“মেরা বিবি আউর দো বচ্চা লেকর চারহি আদমি রহতে হ্যায়। কেয়া লেঙ্গে আপ বাজার সে? ঘর চলিয়ে ম্যায় আপকে খাতির এক মুর্গা বনানে কে লিয়ে

বোলুঙ্গা বিবিকো” । রিজা ঠিক করে নিল, মুর্গার দাম ওই ধরে দেবে ওর এই বন্ধুকে। তাও বলল, “ম্যায় আপকে সাথ জানেকে পহেলে মেরা তাম্বু লগানে কা জ্যাগা ঢুন্ড লুঙ্গা, উসকে বাদ জাউঙ্গা আপকে ঘর। ঠিক হ্যায় না?”

“ঠিক হ্যায় বাবুজী, আপকি মর্জি। চলিয়ে পহেলে আপকা জ্যাগা দেখ লেতে হ্যায়। এক ছোটাসা ঝর্ণা ভী হ্যায় উধার। ঝর্ণাসে আপকো পানি মিল জায়েগা। ইয়ে তো সহি, লেকিন রাত মে পানিকে লিয়ে জানবার ভি আতে হ্যায়, আগ আপকো জ্বলানাই হোগা” । ভাঙ্গাচোরা পিচ রাস্তা থেকে একটা মাটির রাস্তা ধরে অনেকটা যাওয়ার পর দূর থেকে গাছপালার ফাঁকে চোখ পড়ল সুন্দরী স্রোতস্বিনীর দিকে। হালকা কুলকুল করে ছোট বড় পাথরের ওপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাওয়ার শব্দটাও যেন ঘুমপাড়ানি গানের মত শোনাচ্ছিল।

গাছগুলোর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে রয়েছে নানাজাতের বাঁশের ঝোপ, একটা নিশ্ছিদ্র সহবাস যেন। তিনটে আলাদা বাঁশঝাড়ের মাঝে যে ফাঁকা জায়গাটা, সেখানে

দুপাশের নুয়ে পড়া বাঁশ একসাথে বেঁধে তাঁবুর বেসটা তৈরি করে ওপরে শক্ত নাইলনের আচ্ছাদন বিছিয়ে, খোঁটাগুলো মাটিতে পুঁতে তাঁবু খাটাতে মাত্র মিনিট দশেক সময় লাগল দুজনের। কিছু নুয়ে থাকা বাঁশের কঞ্চি টেনে এমনভাবে পরস্পরের সাথে জড়িয়ে দিল ভৃগু, যে সেখান দিয়ে কারুর আসা অসম্ভব। সামনের দিকে দুতিনটে বাঁশের কঞ্চি একসাথে নিয়ে দুই টানে পরিষ্কার করে দিল বেশ খানিকটা জায়গা।

রিজা অবাক হয়ে দেখছিল। ভৃগু, ওকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে, নিঃশব্দে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল। কয়েক মিনিট বাদে বেশ জোরে খসখসানি আওয়াজ শোনা গেল। দুহাতে টেনে দুটো বড় ভেঙে পড়া গাছের ডাল টেনে নিয়ে এল। “ইয়ে আজ রাতকে লিয়ে কাফি হোগা। ঠিকসে জ্বলানেসে সারে রাত জ্বলেঙ্গে। পিছেসে কোই আ নহি সকেগা ঔর সামনে ইয়ে আগ আপকো সুরক্ষিত রাখেগা। অভি সামান ছোড় দিজিয়ে ইঁহা। কুছ নহি হোগা। চাহে তো আপ হাত মু ধো লিজিয়ে ইস ঝর্ণে মে, ফির চলিয়ে মেরে সাথ” ।

০-০-০-০

যে পথে ওরা এসেছিল, সে পথেই রাস্তার থেকে উল্টোদিকে একটু গেলেই ভৃগুর ছোট্টবাড়ি। কাঁটালতার ঘন বেড়ায় মোড়া উঠোনটা ঝকঝকে তকতকে। মাটির কিন্তু এত সুন্দর ভাবে লেপে রাখা যে মনেই হচ্ছে, একজন নিপূণার হাত রয়েছে এর পেছনে। ওদের দুটি সন্তান। মেয়েটি বড়, সাতআট বছরের হবে, ছেলে পাঁচ। দুজনেই গ্রামের স্কুলে পড়ে। বাবার সাথে আসা অতিথিকে দুজনেই নিজেদের বইপত্র দেখানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এরই মধ্যে ভৃগুর স্ত্রী কাঁসার গ্লাসে করে চা নিয়ে এসেছে। কথাবার্তায় যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ, জানা গেল ওর পড়াশুনো ক্লাস নাইন অবধি, তাও এক মিশনারি স্কুলে। এখানে বাড়ির দাওয়াতে গ্রামের বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠও দেয়। বিনিময়ে টাকা নেয়না কিন্তু গাছের কলাটা, মুলোটা ভালবেসে দিয়ে যায় কৃতজ্ঞ বাবামায়েরা। সেই সামান্যতেই কত খুশি লাজ্জো, লাজবন্তী, ভিরগুর ঘরণী।

স্বামীর কছে অতিথির কথা জানতে পেরেই রান্নার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে সে। প্রিয়াঙ্কা আর রাহুল,

দুজনেই রিজার কাছে ঘেঁষে এসে বসল। ভিরগু বা ভৃগু, বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটা মোরগকে বধ করে তাকে ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে বৌয়ের হাতে দিয়ে বসল চারপাইয়ের ওপরে। "বাবুজী ইয়ে দোনো বাদ মে কেয়া হোগা পতা নহী। লেকিন কোই প্রিয়াঙ্কা ইয়া রাহুল নহি বন পায়েগা। ম্যায় চাহুঙ্গা ভি নহি। উস খানদান শাপিত হ্যায়। হাত মে হাত মিলাকর দেশকো বেচনে ঔর বাটোয়ারা কা কাম জো লোগ কিয়া থা, উনসে তালুকাত হ্যায় এইসা আদমি কো ম্যায় কভি আপনা নহি মানতা। দেখিয়ে দেশকা হাল। হর এক আদমি গরিবি সে জুঁঝ রহা হ্যায়, ঔর গিনেচুনে কুছ লোগ মস্তি কর রহে হ্যায়। কেয়া করু, মেরা বিবি ইনদোনোকা নাম দি থি। চলো ওহী সহি হ্যায়" ।

গায়ের পকেটওয়ালা জ্যাকেটের একটা পকেট থেকে কয়েকটা চকোলেট বের করে বাচ্চাদুটোর দিকে এগিয়ে ধরল রিজা। ওরা সম্মতির জন্য বাবার দিকে তাকালো, "লে লো বেটা, বাবুজী খুদ যব খাতে হ্যায় ঔর প্যারসে দিয়া, তব ঠিক হি হ্যায়" । রিজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "হাম গরিব হ্যায় বাবুজি লেকিন লালচি নহী। বচ্চেকো ইয়ে সবক শিখানা জরুরি হ্যায়।

লালচ জিন্দেগী কো বিগড়নে কে লিয়ে সবসে বুরা চিজ হোতে হ্যায়” ।

পারিজাত স্তম্ভিত হয়ে গেল, এই গরিব, খেটে খাওয়া মানুষটার কথা শুনে। এর কথায় শিক্ষার ছাপ, সম্ভ্রান্ত কোন পরিবারের, আদর্শের ছবি কেন জানি না বারবার ফুটে উঠছিল। ভৃগু হয়তো ওর মনের কথা বুঝতে পেরে গিয়েছিল। “বাবুজি, মেরা খানদান বহুত রইস থা। দাদাজী, পিতাজী দোনো দেশকে লিয়ে আপনা জান গবায়া। বাবুজিকা লাস ভি নহি দেখা হামলোগো নে। ব্যস, হামারে সারে জায়গাত জমিন্দার নে হরপ কর লিয়া। বাদ মে খুদ নেতা ভী বন গয়ে। ম্যায় এক সাল ইউনিভার্সিটি মে ভী পড় চুকা, এক টিচার কা নোকরি ভি মিলা থা। লেকিন সব ছোড়কে জান লেকে ভাগনা পড়া। ইয়ে জঙ্গল কে কিনারে ছোটাসা জমিন মেরা খানদান কা আখরী নিশান হ্যায়। দুকান দিয়া, থোরি বহুত জো মিলতা হ্যায় ঔর বিচবিচ মেঁ কুছ লিখতে হ্যায়, পেপার সে কুছ মিলতা হ্যায়, ব্যস, চলা যাতা হ্যায়” ।

কিছুক্ষণ নিজের ফেলে আসা দিনের ভাবনাতেই বুঁদ হয়ে রইলো ভৃগু। তারপর একচিলতে হাসি মুখে টেনে এনে বলল, "আপকা বাতাইয়ে বাবুজি। আপ একেলে এইসে কিঁউ ঘুম রহে হ্যায়? জঙ্গল মে রহেনে কা ইয়ে শখ কিঁউ হ্যায় আপকা?"

একটু আগে ভিরগুর বৌ লাজ্জো, দূরের ওই ঝর্ণা থেকেই বোধহয় সান্ধ্যকালীন প্রসাধন সেরে এসেছে। এখন মাথায় ঘোমটা দিয়ে একটা থালায় মাটির প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে উঠোনের এককোণে তুলসী তলায় হাঁটুমুড়ে বসে প্রণাম করছে। কমদামী ধূপের গন্ধও যে কাউকে এত আনমনা, উদাসীন করে দিতে পারে তা আগে কখনো অনুভব করেনি পারিজাত।

মাকে তেমন করে মনে পড়ে না ওর। মা যখন চলে যান তখন ওর বয়স পাঁচ বছর। ওর মনে আছে বড়জেঠি কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে সন্ধ্যে রাতে, গ্রামের বাড়িতে মাকে, মাটিতে শুয়ে থাকা মাকে প্রণাম করিয়েছিল। ঘুম চোখে ও জিজ্ঞেসও করেছিল, মা মাটিতে শুয়ে আছে কেন? মুখাগ্নি বাবাই করেছিল। ওর ছোট্ট মনে এই ঘটনার ছাপ যাতে সারাজীবন না থাকে

তার জন্যই হয়তবা। অনেক পরে বুঝেছিল ওর অসুস্থ, রুগ্না মা আর কোনদিন আসবে না ফিরে। বড় জেঠিই নিজের সন্তানের মতো করে মানুষ করেছিল ওকে।

তাকেই দেখত এমন ভাবে তুলসী তলায় সন্ধ্যে দিতে। "মা কি ইয়াদ আ গয়া, লাজ্জো বহেন কো এইসে বাত্তি দিখাতে হুয়ে দেখকে। আপ কেয়া পুছ রহে থে? হাঁ, মেরা সব থা অভি কোই নেহি হ্যায়। কলকাত্তা মে বিজনেস ভি হ্যায় লেকিন মেরা মন নহি লগতা। ম্যায় ঘুমতা হুঁ ইধর উধার। ঢুন্ডতা হুঁ আপ জ্যায়সা আপনোকো। খুনকা রিস্তা জিন লোগোঁ সে থা বো তো কব চল বসে, অভি দিলকা রিস্তেকে লিয়ে ঘুমতা ফিরতা হুঁ" ।

"আপ তো শায়ের লাগতে হ্যায় বাবুজী। সহি বোলা আপনে, খুনকা রিস্তা মিট যাতা হ্যায় লেকিন দিলকা রিস্তা হামেশা বরকরার রহেতে হ্যাঁয়। আপ এহি রহ জাইয়ে, হাম লোগ তো হ্যাঁয় হি আপকে আপনা। ঘুম ফির কর আ জাইয়ে মেরে ঘর পে" । ভিরগুর কথায় অবিভুত হয়ে, ভাললাগায় আপ্লুত হয়ে গেল রিজা।

বাতি জ্বালানোর তেলের খরচাটা এদের কাছে বিলাসিতা। তাই প্রায় সব্বাইই অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। আজ রিজার জন্য বাতি জ্বালাতেই হয়েছে। লাজ্জো রান্নার কাজও প্রায় শেষ করে এনেছে। রান্না বলতে অন্যদিন ওরা রুটির সাথে আলুর চোখা বা ডাল ও আচার দিয়েই খাওয়া সারে। আজ অতিথির কথা ভেবে ভাত হচ্ছে। বাচ্চাদুটোর তো মহা মজা। নিকানো উঠোনে বাবা আর আঙ্কেলের আশপাশে নেচে, খেলে বেড়াচ্ছে।

বেশ ঝালঝাল মুরগীর ঝোল দিয়ে মোটা চালের ভাত যে এত সুস্বাদু হতে পারে তা ভাবতেও পারেনি পারিজাত। খিদের পেটে বেশ অনেকটাই খাওয়া হয়ে গেল। রান্না ও খাবারের প্রশংসায় স্বামী স্ত্রী দুজনেরই মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। রিজা লাজ্জোকে ডেকে ওর হাতে দুহাজার টাকা তুলে দিয়ে বলল, "বহিন ইয়ে ভাইসাব তো মেরা গয়ের লাগতে হ্যাঁয় লেকিন তুম তো আপনা বহিন হো। মেরে ভাঞ্জা ভাঞ্জীকে লিয়ে সোয়েটার বগেরা খরিদ লেনা। উন দোনোকো উনকা পিতাজীকে মাফিক বড়ে দিলবালে

ইনসান বননাই হোগা। ঠন্ড কে মৌসম আনেই বালে হ্যাঁয় না?”

পারিজাতকে ওর তাঁবু অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল ভৃগু।

০-০-০-০

আগেই জড়ো করে রাখা কাঠের স্তুপ থেকে কাঠ বেছে নিয়ে একটা আগুন জ্বালালো রিজা। খুব বড় না আবার এত ছোটও না যে শনশন করে বয়ে আসা হাওয়ার থেকে উদ্ধার পাওয়ার মতো উত্তাপ যাতে পায় ওর শ্রান্ত শরীর। তাঁবুর সামনেই জ্বেলেছে আগুন যাতে উল্টো দিক থেকে আসা হাওয়া আগুনের উত্তাপ পৌঁছে দেয় ওর তাঁবুর ভেতরে।

বাঁশগুলোকে টেনে একটা জায়গায় নিচু করে তাঁবুর ছাউনিটা বানিয়েছিল ভৃগু। একটা জায়গায় গিয়ে বাঁশগুলো একসাথে মিলে গ্যাছে, পাশ দিয়ে উঁকি দিয়েছে অনেকটা আকাশ। ভাঙ্গাগাছের গুঁড়ির পাশে, আগুনের সামনে স্লিপিং ব্যাগটা অস্থায়ি ভাবে পেতে

গুঁড়িতে মাথা রেখে শুলো রিজা। পাশে আগুনটা কটকট শব্দে জ্বলছে কিন্তু ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভালোলাগায়, দমবন্ধ হয়ে এল ওর।

এত সুন্দর আকাশ শেষ কবে দেখেছিল মনে করতে পারল না। মনে হচ্ছে যেন কালো সিল্কের চাদরে একটা একটা করে হীরে লাগিয়ে দূর্মূল্য একটা কিছু বানাতে গিয়ে এক সময় ধৈর্য হারিয়ে মুঠোমুঠো হীরে ছুঁড়ে দিয়েছে চাদরে। পর গে যেখানে খুশি গিয়ে। একজায়গায় ছায়াপথের খানিকটা পাড়, এঁকেবেঁকে আছে যেন ভাঁজ পড়েছে সেই চাদরে। মনে পড়ল একটা গানের লাইন, “খেলিছো, এ বিশ্ব লয়ে, বিরাট শিশু আনমনে..”

চোখের সামনে দিয়ে এমাথা থেকে ওমাথা ছুটে গেল একটা উল্কা। যেন বলে গেল, দ্যাখো আমরাও আছি। উল্কাটা দেখা মাত্র সংস্কার, অভ্যাসের বশেই মনেমনে একটা ইচ্ছা প্রকাশ করল রিজা। “ভৃগুর ছেলেমেয়ে দুটো যেন অনেক বড় মানুষ হয়। বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে যেন এই গ্রহনক্ষত্রভরা আকাশের মতো। ওদের সব দুঃখ, কষ্টের অবসান হয় যেন” ।

রাতে ওপরের বাঁশ ঝাড় থেকে টপটপ করে গায়ে হিমের ফোঁটা পড়ায় ধড়মড় করে উঠে বসল রিজা। ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিজের অজান্তেই। এখন বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। গাছের গুঁড়িটার সাথে আরোকিছু টুকরো টাকরা কাঠ গুঁজে, আগুনটা ভালোকরে জ্বালিয়ে দিয়ে এবার তাঁবুর ভেতরে স্লিপিং ব্যাগটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল ও।

রাত অনেকটাই হয়েছে, হয়তো বা ভোরের জন্য উল্টোগুনতিও শুরু হয়ে গ্যাছে। স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণতাও ঘুম টেনে আনতে পারলো না রিজার চোখে। বাইরে জ্বলতে থাকা অগ্নিকুন্ডের দিকে তাকিয়ে রইল ও। কি কাঠ জানে না, সম্ভবত কোন তৈলাক্ত বস্তু আছে এতে। আগুনের কয়েকটা শিখা মাঝেমাঝেই লাফ দিয়ে উঠছিল। শূন্যের মধ্যেই জ্বলছিল তারপর আবার নিভে যাচ্ছিল। জীবনের মতোই। এভাবেই বেড়ে উঠে সবার মাঝে আলাদা করে জ্বলতে থাকার প্রবণতা একসময় যে দপ করে নিভে যাবে তা অনেকেই বোঝে না। আলেয়ার পিছনে ছুটে বেড়ায় খামোকাই।

বাইরে আঁধার আরো ঘন হয়ে এসেছে। আগুন নিভে এখন অঙ্গারগুলো রয়ে গ্যাছে। কথায় আছে না রাত সবচেয়ে বেশি কালো হয় ভোরের আগে। যাতে মানুষ আলোআঁধারের তফাতটা টের পায়। উদ্ভাসিত করে নিতে পারে নিজেকে সুর্যের দীপ্তিতে। কজন তা করে ও জানে না, কেউ কেউ তো নিশ্চয়ই করে। তা না হলে চির আঁধার নেমে আসতো পৃথিবীতে। সামান্য কিছু ভালো, সৎ মানুষের সদিচ্ছাই এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে মানবিকতাকে।

বাইরে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আলো ফোটে নি এখনো যদিও। তার মধ্যেই রিজা দেখল, একটা ছায়ামুর্তি একটা কাঠের টুকরো হাতে অঙ্গারগুলোকে খুঁচিয়ে দিচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসল রিজা। এ আবার কে? কোন জন্তু হলে তো আগুনের কাছে আসতো না। তাহলে কি ভৃগুই এসেছে, এই ভোররাতে? হাতের কাছে থাকা টর্চটা জ্বালিয়ে বাইরে ফেলল ও। দেখতে পেল, জটার মতো চুলদাড়িশুদ্ধু একজন মানুষকে। পরনে লুঙ্গির মতো করে কোন এক পশুর ছাল। এই কনকনে ঠান্ডাতেও খালি গা। হাতে থাকা লাঠিটা দিয়ে

আগুনটাকে খোঁচাচ্ছেন। লাঠির মাথাটা ইংরিজি ‘ওয়াই’ শব্দের মতো।

কেমন এক তীব্রদৃষ্টিতে তাঁবুর দিকে তাকালেন আগন্তুক। মাথা নামিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন। টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রিজা। উবু হয়ে বসে, ওর দিকে পড়ে থাকা কাঠগুলোর না জ্বলা অংশগুলো ঠেলে দিল অঙ্গারের মধ্যে। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠলো আগুন। এবার জোড়াসন করে মাটিতে বসে পড়লেন সেই মানুষটি। আগুনের সামান্য আলোতে রিজার চোখে পড়ল ওনার সঙ্গে থাকা একটা চামড়া মোড়া পুঁটলির দিকে। সেই পুঁটলিতে ঠেস দিয়েই বসেছেন।

সোজাসুজি রিজার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন। মনে হল যেন মেঘ ডাকল। “তুম কৌন হো বেটা? কেয়া কর রহে হো ইস জঙ্গল মে, এইসে, অকেলা?”

পারিজাত একটা ঘোরের মধ্যে আছে এমন ভাবেই উত্তর দিল, “এইসেহি, মেরা ইয়ে অকেলাপন জ্যাদা

পসন্দ হ্যাঁয়। অকেলা রহেনে কা আদত পর গয়া মুঝে। অকেলা ম্যায় খুদকো পহেচাননে কি কৌশিস করতা হুঁ। লেকিন আপ ইহা কেয়া কর রহে হ্যাঁয় বাবুজী, বো ভি অকেলা, মেরে জ্যাসা?”

হাসলেন বৃদ্ধ। নিঃশব্দে। রিজা দেখলো এতো বয়স হয়েছে তবুও ওনার দাঁতগুলো এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে। গলার স্বর নামিয়ে বললেন, “ম্যায় ভি কিসিকে তলাস মেঁ হুঁ। কাঁহা কাঁহা, কবসে ঢুন্ড রহা হুঁ উনলোগোকো। সব জানতে হ্যাঁয় কি ম্যায় মর চুকা হুঁ। লেকিন তুম বতাও, দিলকা খোয়াইস যবতক পুরা না হুয়া, মরনেসে ক্যা ফয়দা?”

“কেয়া আপ ভিরগু কো ঢুন্ড রহে হ্যাঁয়?” নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে এল রিজার মুখ থেকে। বৃদ্ধ যেন একটা ঝাঁকুনি খেলেন। শরীর টান হয়ে উঠলো। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, “ভিরগুকে বারে মেঁ তুমকো ক্যায়সে পতা চলা? তুম মিলে হো উসসে? কাঁহা, কব? কাঁহা রহেতা হ্যাঁয় বো?” শেষের দিকে গলার আওয়াজ ভেঙে এল ওঁর।

রিজার বুঝতে অসুবিধে হল না, কার সামনে বসে আছে ও, কে এই শালপ্রাংশু বৃদ্ধ। এখন শুধু ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা। আবার একটা মনের মিলনসভার সাক্ষী হতে পারবে। তারপর এই পছন্দের পরিবারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে দূরে। আরো দূরে কোথাও। যেখানে হয়তো নিজের জন্য খুঁজে নিতে পারবে কোন একটা মাথাগোঁজার ঠাঁই। এমনই কোন শান্ত, জঙ্গলের পাশে, ধীরে বয়ে চলা তিরতিরে কোন এক নদীর ধারে ছোট্ট একটা কুটির বানিয়ে নেবে নিজের জন্য।

o-o-o-o

হাত বাড়িয়ে নিজের ব্যাগটা কাছে টেনে নিল পারিজাত। অভ্যস্ত হাতে বের করে ফেলল, রান্নার ছোট্ট প্যানটা, দরকারি সামগ্রী, দুটো কাপ, বোতল থেকে জল ঢেলে বসিয়ে দিল আগুনের ওপরে, একটা চেটালো পাথরের ওপরে। ইন্সট্যান্ট কফির দুটো পাউচ ঢেলে দিল কাপে। তারপর ফুটে আসা জল ঢেলে এগিয়ে দিল বৃদ্ধের দিকে। “লিজিয়ে, থোড়া পী

লীজিয়ে। ঠন্ড কা মৌসম তো লগভগ আ হী চুকা হ্যাঁয় না?”

বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে নিলেন বাড়িয়ে দেওয়া কাপটা। দুহাতে চেপে ধরে যেন উষ্ণতা শুষে নিতে চাইলেন কাপ থেকে। চুমুক দিলেন। যেন অনেকটা শক্তি ফিরে পেলেন ওই এক চুমুকেই। রিজার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ভিরগু ঠিক তো হ্যাঁয় না? শাদী কিয়া হ্যাঁয় কেয়া? আওর বচ্চে হ্যাঁয় না উনকে” ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “বো সব জানতে হ্যাঁয় কি ম্যায় মর চুকা হুঁ। লেকিন মুঝে মারনেবালা স্রিফ উপরবালাই হ্যাঁয়। বো হারামখোর, বেইমান লোগ যো দেশকো বেচনে কা কৌশিস কিয়া থা, বো মুঝে ক্যায়সে মারেঙ্গে? এক সাধুজী নে বচা লিয়া থা মুঝে। সাথ মেঁ লেকে চলে গয়ে থে হিমালয় কি তরফ। ইতনা সাল ম্যায় উনকে সাথহি থা। সাধন কা আওর এক মার্গ ছুঁনে কে লিয়ে বো দুসরে কোই জ্যাগা পে জানে কে পহেলে মুঝে ভেজ দিয়া বাপস” ।

এক নির্মল হাসি ফুটে উঠল অগোছালো দাড়ির ফাঁকে। “মুঝে বাবাজী বোলে থে কি পহেলে কোই অজনবি কে সাথ মুলাকাত হোগা মেরা। বো হী মুঝে মেরে আপনে কে পাস লেকে জায়েঙ্গে। তুমে মিলকর মুঝে বো বাত ইয়াদ আয়া” । কফিতে আবারো চুমুক দিয়ে বললেন, ‘তুমহারা আপনা কোই হ্যাঁয় না? তো এইসে ক্যায়সে ঘুম রহে হো? বস যাও কিসি জ্যাগা পর। চাহো তো অকেলেই রহো। জো তুম ঢুন্ড রহে হো সায়দ বো মিল জায়েগা তুমে। বিশসাল বীত গয়া, ম্যায় অভি বো সব জানতা হুঁ জো কভি জাননে কা কৌশিস ভি নহি কিয়া থা। ইন সবকো একবার মিলনে কা ইচ্ছা হুয়া তো আ গয়ে। লেকিন ফির বাপস যাউঙ্গা” ।

পারিজাত শুনছিল বৃদ্ধের স্বগতোক্তি। আকাশে আলো ফুটে উঠছে ধীরেধীরে। উঠে স্লিপিং ব্যাগটা ভাঁজ করে ফেলল। দড়ি খুলে, তাঁবুটা ছোট্ট ভাঁজ করে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। বাইরে বের করা জিনিসগুলোও ভরে নিল। তারপর বৃদ্ধকে বলল, ‘আপ চলিয়ে মেরে সাথ, ম্যায় আপকো আপকা ভৃগুকে পাস লে চলুঙ্গা। বাদ মে ফির চলনা শুরু করেঙ্গে ইঁহাসে। পতা নহি কিসি দিন

হিমালয় কি কোই কোণে মে আপকে সাথ মুলাকাত ভী হো জায়গা। ম্যায় ওহী রহেনে কা সোচ রহা হুঁ” ।

ভৃগুর কথায়, আগের দিনই জানতে পেরেছিল, খুব ভোরে ওঠে ওরা। ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে তারপর ও যায় দোকানে। দূর থেকে পারিজাতকে আসতে দেখে, ভৃগু বাঁশের গেট খুলে বেরিয়ে এসেছিল। ওর কাঁধে ব্যাগটা দেখে একটু অবাকও হয়েছিল। ওই ঢাউস ব্যাগের জন্যই ওর পিছনে থাকা বৃদ্ধের দিকে নজর পড়েনি প্রথমে। রিজা বৃদ্ধকে সাথে নিয়ে ভেতরে গিয়ে, উঠোনে পাতা চারপাইতে বসতে বলল ওঁকে। ঘর ঝাঁট দিতেদিতে লাজ্জোও এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। মায়ের পাশ দিয়ে আরো দুটো কৌতূহলী মুখ উঁকি দিচ্ছে।

রিজা ভৃগুর দিকে তাকিয়ে বলল, “কেয়া ভাই, আপনা পিতাজীকো ভি নহি পহচান পায়া? দেখো ম্যায় উসে লে আয়া হুঁ তুমহারে পাশ” । ভৃগু একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠল মুখে, “বাবুজী আপ? আপ জিন্দা হ্যাঁয়? কাঁহা থে ইতনে সাল” ? বলে বাবার পায়ের কাছে বসে পড়ল। লাজ্জো ছুটে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। মায়ের পিছনেপিছনে লাজুক দুটো বাচ্চা এগিয়ে এলো

তাদের নানাজীর কাছে, যার গল্প শুনেছে ওরা। দেখেনি কখনো। ওদের দুজনকে দেখে বৃদ্ধের চোখমুখ এক অনাবিল আনন্দে ঝলসে উঠল যেন। হাঁটু গেড়ে বসে জড়িয়ে ধরলেন দুটো ছোট্ট শরীর নিজের বুকে।

তারপর হটাৎ মনে পড়ায় ঘুরে তাকালেন, “আও বেটা, তুম কিঁউ এইসে খাড়ে হো? তুমভী তো হামারে ঘরকে এক সদস্য বন গয়ে হো, মেরা আঔর এক বেটা” । ওনার গলার স্বরে শুধু ভদ্রতা নয়, ঝরে পড়ল স্নেহ, মমতা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে চারপাইতে বসল রিজা। কালরাতে ভাব হয়ে যাওয়া দুই খুদেবন্ধু এসে ওর দুপাশে বসে পড়ল।

ভৃগুর মেয়ে বলল, “আপ হামারে সাথ রহিয়ে না চাচাজী, বহুত অচ্ছা হোগা” । সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে আরেক জন চেপে ধরল ওর হাত, যেন ওই ছোট্টহাতেই আটকে রাখবে ওকে, এখানে, ওদের বাড়িতে। দুচোখ জলে ভরে এল পারিজাতের। বিয়ে থা করেনি, জানে না সন্তানস্নেহ কি বস্তু। কিন্তু আজ এই ছোট্ট দুজোড়া হাত যে ওর নিজের সন্তানের মতো দাবী নিয়ে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। কি জবাব দেবে ওদের।

হাঁটুমুড়ে ওদের সামনে বসল রিজা, দুহাতে দুজনকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। এক অদ্ভুত সুঘ্রাণ এসে পৌঁছল ওর নাকে, কে জানে একেই বোধহয় সরলতার, ভালোবাসার, আত্মার গন্ধ বলে।

একদিন স্বপ্ন দেখেছিল এমন একটা ঘরের, একটা সংসারের, ঘরে টলোমলো পায়ে ঘুরে বেড়ানো এমনসব শিশুদের। সে স্বপ্ন ভাঙতে দেরী হয়নি। স্বপ্ন দেখার সঙ্গী ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। না, কারুর সাথে চলে যায়নি। এক দুরারোগ্য ব্যাধি কেড়ে নিয়েছিল ওর স্বপ্ন দেখার সাথীকে। বহু চেষ্টা করেছিল পারিজাত। ভারতে চিকিৎসা হবেনা বলে নিয়ে গিয়েছিল অ্যামেরিকায়। পর পর অপারেশন করেও শেষরক্ষা হয়নি। তিনমাস বাদে চোখ বুঁজেছিল সুবর্ণা। শেষক্ষনেও শক্ত করে ধরে রেখেছিল ওর হাতটা। আর নতুন করে কিছু ভাবতে পারেনি ও। একদিন সব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। ঘর ছিল, আছে। কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়ার মনটা যে রয়ে গেছে সুবর্ণার কাছে, কোথায় তা জানে না পারিজাত।

চোখ থেকে গড়িয়ে আসা অশ্রু মুছে নিয়ে, ওদেরকে বলল, “ম্যায় আ জাউঙ্গা ইঁহা, তুমহারে পাশ, বহুত জলদি হি, লেকিন কুছ দিনো কে লিয়ে মুঝে যানাই পড়েগা। তবতক তুম দোনো ঠিক সে পঢ়াই করো আঔর ইন্তজার করো মেরে আনেকা। ঠিক হ্যাঁয় না?” ওরা এতটাই সরল, বিশ্বাস করে নিল ওকে। ঝকঝকে হাসিতে উদ্ভাসিত হল ছোট্ট দুটো মুখ।

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যাগটা খুলল পারিজাত। ওপরের জিনিস নামিয়ে, নিচ থেকে বের করল একটা চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগ থেকে একটা পাঁচশটাকার বান্ডিল বের করল। পঁচিশ তিরিশ হাজার মতো আছে হয়তো। টাকাটা ভৃগুর হাতে দিয়ে বলল, “তুমনে বতায়া থা কি বো জঙ্গলবালা জমিন ভী তুমহারাই হ্যাঁয়। ওহী মেরে লিয়ে এক ঘর বনাকে রাখনা। একহি ঘর, তুমহারে ঘর জ্যাইসা। ম্যায় বাপস আউঙ্গা আঔর এহী রহুঙ্গা তুমলোগোকে সাথ। লেকিন পহেলে মুঝে থোড়া ওয়াক্ত দো। আভি ভি খুদকো থোড়া সা পহেচাননা বাকি হ্যাঁয়। ম্যায় বাবুজী কে রাস্তে মে কুছ দূরতক জাউঙ্গা, ফির আ জাউঙ্গা এহিঁ” ।

দুইপা এগিয়ে ও ভৃগুর বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, "আশির্বাদ দিজিয়ে মুঝে, মেরে আনে তক আপ এহি রহেনা বাবুজী। ইস দুনিয়ামে আপনো কো ঢুন্ডতে ঢুন্ডতে বহুত দূর আ চুকা হুঁ ম্যায়। থোড়া খুদকো ঢুন্ডনে কা মৌকা দিজিয়ে মুঝে" । মাথার ওপরে ওই বৃদ্ধের হাত অনুভব করল রিজা। সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর ব্যাগটা কাঁধে তুলে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ওদের উঠোনের গেট দিয়ে। ওর পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সজল চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল অনেককটা চোখ। এক একলা পথিকের দিকে।

অযাচিত প্রাপ্তি

রাই পারমিতা আইচ

নামটা শোনামাত্র স্মৃতি ও সোহমের শিঁড়দাড়া বরাবর শৈত্য প্রবাহের ঝাপটা লাগলো একঝলক। চেম্বারের ভেতরে বসেই হৃদপিন্ড মনে হচ্ছে থেমে যাবার যোগাড়...! " কথাটা কানে অনুরণন হচ্ছে বারবার"। মুখে হতাশাসূচক শব্দ করে স্মৃতি কান চেপে ধরে সজোরে! অফিসে কাউকে বলতে পারছেনা। বহুদিন হলো একটা চাপা উত্তেজনা ঘিরে আছে শরীর ছাড়িয়ে মনেও। সম অবস্থা সোহমের'ও। এখন অনুশোচনায় ভুগছে দুজনেই। আলোচনা করছে "প্রথমে যদি শক্ত হাতে ধরতো তাহলে বোধহয়!" কিন্তু এখন সব যন্ত্রনা-কল্পনাই মিথ্যে। ওষুধ ও তেমন কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং ডাক্তারের অ্যাডভাইস অনুযায়ী কোথাও যেতেই হবে ওকে নিয়ে হাওয়া বদলে।

তাই দুজনেরই আপৎকালীন ছুটি। আর অন্যকিছু ভাবার সুযোগ বড্ড কম। চলছে লাগেজপত্র গোছানোর তোড়জোড়।

"রি---য়া তোমার স্পেশাল কিছু লাগলে দাও, গুছিয়ে নেব।" স্মৃতি মেয়েকে ডাকে।

বন্ধ দরজার পিছন থেকে ততক্ষণে আবার শুরু হয়েছে সেই ভয়াবহ চিৎকার, ছুঁড়ছে-ভাঙ্গছে, আছড়ে পড়ছে দরজার ওপর, চলছে তান্ডবলীলা! একটানা কেঁদে যাচ্ছে রাগে

"মোবাইলটা এক্ষুণি সারাই করে দাও নতুবা নতুন এনে দাও বলছি"!

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হচ্ছে দেখে সোহম যে কোন প্রকারে মেয়েকে ইঞ্জেকশনটা দিতে...এখন সব শান্ত। শুধু বিরহী বাতাস ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের মনের ঝুল বারান্দা হয়ে ঘরের আনাচ-কানাচ। প্রথমে স্মৃতি ভেবেছিল বাড়িতে একা থাকে হাওয়া-বাতাস লেগেছে। সেইমতো সকলের সাহায্যে পীরের দরগা যাওয়া, জলপড়া খাওয়ানো চেষ্টা করেছিল সারাতে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে

গেলে তখন বাধ্য হয়েই মনোবিদের শরণাপন্ন হয় তারা।

গাড়িতে দু-একটা কথা বললেও, পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি যতো ওপরে উঠেছে রিয়া নিশ্চুপে বসে ছিল রাস্তায় চোখ রেখে। কিছু আগে হয়তো কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, পথের ধারে জংলি ফুল-পাতাগুলোর শরীর চুঁইয়ে জল ঝরছে এখনো। আকাশ ধোঁয়াশা মেখে অস্থির। পথের মসৃণ আদুরে সোহাগে তীরবেগে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। রিয়ার মনেও সমান অস্থিরতার সহাবস্থান।

প্রায় বছর খানেক স্মৃতি লক্ষ্য করেছিল রিয়ার পড়ার প্রতি চরম অনীহা। বাড়ছিল মোবাইলকে জড়িয়ে বাঁচা। এমনকি খাবার টেবিলেও ওই যন্ত্রটা! লৌকিকতা, সামাজিকতা ভুলে শুধুই অবাধ্যতা। সেই যন্ত্রই ধীরে ধীরে স্মৃতি-সোহমের যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠছিল।

ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে কোন কাজ হয়নি। ইন্টারনেট কানেকশন কিছুক্ষণ না থাকলে অস্থির

পাগলের মত করতে থাকতো সে। যখন ঘুম আলগা হয়, দেখেছে গভীর রাতেও রিয়া মোবাইলে ব্যস্ত এমনকি বাথরুমে ও নিয়ে যায় আজকাল মোবাইল। বুকের মধ্যেকার কষ্টটা মুরিয়ে পেঁচিয়ে গাড়ির কাঁচে নিজে থেকেই ধাক্কা খাচ্ছে স্মৃতির। মনে পড়ছে ঝগড়া, অশান্তি, ক্লাশ টেনে ব্যাক পাওয়া। তাই ওর বিশেষ বন্ধু রায়ানের ক্রমে সরে যাওয়া।

রিয়া চরম অসহিষ্ণুতায় নিজের চুল, জামাকাপড় ছিঁড়ে অবশেষে গুম হয়ে বিছানার একপাশে পরে থাকতো বালিশটা আঁকড়ে বহুক্ষণ। বাধ্য হয়েই যখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হল ততদিনে রিয়ার খাওয়া, ঘুম সব প্রায় বন্ধ, চোখে উদ্দেশ্যহীন চাউনি। চোখের তলায় কালির প্রগাঢ় প্রলেপ মিশেছে মানসিক অবসাদে ।

" নোমোফোবিয়া", "বড্ড দেরী হয়েছে" সেদিন থেকে শব্দগুলোর আতঙ্ক ঘিরে ছিল ওদের

দুজনকে! গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে থামতে সম্বিত ফিরলো।

××××××××

হিমালয়ের ভারতীয় অংশে বনজঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম বামনি। সমতল থেকে প্রায় নয় হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। দুর্গম বলে আশপাশের এলাকা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন গ্রামটি। জাগতিক ঝামেলা থেকে দূরে এমন শান্তির জায়গাই খুঁজেছিল ওরা। শহুরে নাগরিক ব্যস্ততা, কোলাহল আর জীবন-জীবিকার সংঘাত এড়িয়ে এক শান্তিপূর্ণ স্নায়বিক বিশ্রাম। যেখানে থাকছে তাকে হোটেল না বলে বাড়ি বলাই যথার্থ। বেশ ঘরোয়া পরিবেশ।

সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশে রিয়া কিছুক্ষণ যেন হঠাৎ দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। যেন সব আগের মতো। বহুদিন পর মেয়েকে মনভরে দেখছে স্মৃতি। ব্রেকফাস্ট শেষ। ওরা বাদে আর দুঘর বোর্ডার চোখে পড়লো। যারমধ্যে একজন

বিদেশী ভদ্রলোক আছেন যিনি সামাজিক গবেষণার কাজে বেশ কিছুদিন আছেন এখানে সপরিবারে।

সারাদিন চড়কি পাক খেয়ে পাহাড়ের বাঁক ঘুরে গাড়িটা যখন ফিরতি পথে নামছে সন্ধ্যের ঔজ্বল্য বাড়িয়েছে জোনাকির সারি। আজ কতকাল পরে রিয়া মা-বাবার সাথে ভালো করে কথা বলছে, প্রাণখুলে হাসছে। দিনটা ভীষণ ভালো, মেয়ের সমস্যার জটমুক্তি ভেবে তারাও আশ্বস্ত হলেন।

হোটেলে ফিরে মিঃ বেনের সাথে আলাপ জমিয়ে ধোঁয়া ওঠা চা ও স্ন্যাকসের সাথে একচোট আডডা জমলো। সেখানে অজানা যেসব তথ্য জানা গেল তাতে কপালে চিন্তারেখা চওড়া হলো! এখানে গ্রামের মানুষের ধারণা চারপাশে গহীনবনে ঘুরে বেড়ায় তাদের পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মা। মওকামতো কাউকে বাগে পেলে প্রেত ভর করে তার ওপর। আছর করে নানারকম আজগুবি কাণ্ড ঘটায়। " মানে বলতে পারেন এদের নিশ্চল বিশ্বাস কোনো শিশু কিশোর বা কিশোরী যদি খুব ডানপিটে হয় অথবা নিতান্ত খেয়ালবশে চুপ করে থাকে, কারও সঙ্গে

তেমন কথাবার্তা না বলে, তাহলে তার ওপর ভূতের আছর পড়েছে সন্দেহ করা হয়। তখন ওই প্রেতাত্মা তাড়াতে বিশেষ পূজার আয়োজন করে এরা। বিচিত্র সে আয়োজন। তবে থাকুন ভালো লাগবে" বেন বললেন।

××××××××××××

ঘরটার পূব দিকের জানালাটা খুললেই একরাশ তাজা হাওয়া মন ভরিয়ে দেয়। তার কোণাকুণি একটা হোটেলে একদল নাট্যকর্মী এসেছে, বোধহয় কলকাতা থেকেই । সামনের চায়ের দোকানে ধোঁয়া ওঠা গরম চা খাচ্ছে। ওরা তিনজনেই আলাপ করতে চললো। ছোট দোকানটিতে ভিড়বাট্টা ছিল। কারণ নানারকম বিচিত্র মুখোশও বিক্রি হচ্ছিল। বাইরে বিশাল এক তিব্বতি কুকুর বাঁধা। কুকুরটি আসলে রাতের গ্রাম পাহারাদার। চিতার কবল থেকে গ্রামবাসীর ছাগল ও পোষ্য রক্ষা করাই তার মূল কাজ। একটি বছর চারেকের ছেলেকে দেখে আচমকা ঘেউ-ঘেউ করে উঠল কুকুরটা।

আতঙ্কে চিৎকার করতে লাগল শিশুটি। সকলে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। এমন সময় দোকানি তড়িঘড়ি ভেতরের দিকে চলে গেল। ফিরে এল এক থুত্থুরে বুড়িকে নিয়ে। বুড়ি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্থিরভাবে সোজা শিশুটির দিকে এগোতে লাগল। তার হাতে একমুঠো ছাই। বুড়ির কাণ্ড দেখে স্মৃতি বোধহয় আঁচ করতে পারছে মিঃ বেনের বিগত রাতের কথাগুলো। কাছে গিয়ে ওর মাথায় কিছু মন্ত্র পড়ে সেই ছাই ছিটিয়ে দিল বুড়িটি। নিচু স্বরে বিড় বিড় করে আরো কী সব আওড়ে ছেলের মাথায় ফুঁ দিতে লাগল। এতক্ষণে খোলসা হলো। ওই বুড়িটি আসলে ওঝা। শিশুটির ওপর প্রেতের আছর পড়েছে। তাই প্রেত তাড়াতে মন্ত্র আওড়ে ঝাড়ফুঁক করছে সে। ততক্ষণে সোহম একপ্রকার ভিজে উঠেছে ঘটনার আকস্মিকতায়।

আজ পূর্ণিমা, জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না গলে চাদরে মাখামাখি। অনেক রাত অবধি বোর্ডারদের সাথে গল্প করে ওরা ঘুমলো। হঠাৎ

ভোর রাতের দিকে ঘুমটা আলগা হতেই উদ্বেগে ধরফরিয়ে বিছানায় উঠে বসে স্মৃতি

" শুনছো, ওঠ! রিয়া'কে বারান্দা, বাথরুম কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।"

সোহম ঘুম চোখেই ছুটে যায় কেয়ারটেকার, ম্যানেজারের কাছে। এই হোটেলের বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্মী। লোকটির নাকের গড়ন ও ভ্রুজোড়ায় এপিকানথিয়ান ছাপ দেখে এরা পাহাড়ি বোঝা যায়। ভদ্রলোক তৎপর হন খুঁজতে...

"না, স্যার বড় গেটতো বন্ধ আছে, পাঁচিল ভি অনেক উঁচু, রিয়া বেবী যায়েগা কাঁহা?" আধো ফোটা আলোতে চারপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজে পাশেই দেওয়াল ঘেঁষে ছাদে যাওয়ার ঘোরানো সিঁড়ি আবিষ্কার হলো। অবশেষে চাপা স্বর লক্ষ্য করে নিঃশব্দে সকলে পৌঁছে যায়। সেখানে চোখের অবিশ্বাস্য কোন নারকীয় নাটক যেন ঘটে চলেছে তখন!

দোকানদারের বারণ অগ্রাহ্য করে কেনা আঞ্চলিক সেই মুখোশটা মুখে আঁটা রিয়ার। হিংস্রতা সাথে জিঘাংসা ঝড়ছে নজরে। ঝকঝকে একপাটি দাঁত মুখের বাইরে বেরিয়ে। শনের মতো এলোচুল উড়ছে। চার হাতপায়ে হেঁটে চলেছে সে ছাদময়। মেয়ের অবস্থায় বুকের জল শুকিয়ে যাচ্ছে স্মৃতির। অস্বাভাবিক লম্বা নখরগুলো যেন প্রতীক্ষিত শিকারের অপেক্ষায়। সেগুলো দিয়ে মেঝেতে অদ্ভুত জ্যামিতিক নক্সা করছে, নক্সাবেয়ে ছড়াচ্ছে রক্তস্রোত। মুখে অপরিচিত জানোয়ারের আওয়াজ। তড়িৎ এ ছিঁড়ে কুটিকুটি করছে ফুলগুলো...কারও ডাকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তৃষ্ণার্ত জিভে চেটে খাচ্ছে রক্ত। কেমন শ্বাপদ মনে হচ্ছে। প্রেতের কবলে পরেছে বুঝে গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসেছে। বহু সংখ্যক গ্রাম্য ওঝারা তাদের বিশ্বাসাঅনুযায়ী প্রেত নিবারণ মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন। আতঙ্কে বুকের হৃদপিন্ডটা একলাফে গলায় এসে ঠেকেছে।

পূর্ণচন্দ্রিমার আলো সারা ছাদময়। মিষ্টি একটা গন্ধ। যেদিকটাতে আলো পৌঁছচ্ছেনা দূরে

বসে বিক্রেতা বুড়িটি! তার লোলচর্ম চেহারার জায়গায় শুধুই হাড়ের ওপর চামড়ার আস্তরণ। শয়তানের দৃষ্টিতে মিটিমিটি হাসছে। এগিয়ে আসছে।

এবার রিয়া পা ঝুলিয়ে পাঁচিলের ওপর বসে দুহাত আকাশের দিকে তুলে রয়েছে। সত্যি যেন কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তি ভর করেছে তার উপর। নিশাচর রাতপাখিগুলো ডেকে চলেছে সমানে। আতঙ্কে সোহম চিৎকার করে, ধরতে ছুটে যেতে রিয়া হাসতে হাসতে লাফ মারলো। হোটেল কাঁপানো আর্তচিৎকারে সকলের চোখের সামনে রিয়া নেই হয়ে গেল।

স্মৃতির মাথাটা বড্ড ভারী লাগছে! চোখের সামনে সব কালো হয়ে যাওয়ার আগে কানে ঘুরপাক খাচ্ছে কিছু শব্দ..."আমি বাঁচতে চাই মা...। "মা-আ-আ" ডাকটা তীক্ষ্ম ফলার মত শুধু বিঁধে রইলো স্মৃতির বুকে! থেঁতলে যাওয়া মাথাটার চারপাশে চাপ চাপ রক্ত..পায়ের সামনে পড়ে

তখনো সেই মুখোশ, শুধু ছিঁটে রক্তের দাগ তাতে ।

মটরডাল দিয়ে মোচার ঘন্ট

সুদীপা চৌধুরী

প্রতিদিনের বাঁধাধরা খাবার রুটিন থেকে বেরিয়ে নিজের স্বাদকোরক কে স্বস্তি দিতে চান অনেকেই !একঘেয়ে খাবার খেয়ে অরুচি হয়ে গেলে মন চায় নতুন কোন ভ্যারাইটির খাবার ট্রাই করতে।বিশেষ করে নিরামিষ এর দিন কি রান্না করব, এটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।কিন্তু অনেকেই মনে করে যে নতুন কিছু তৈরি করা অনেক ঝামেলার, তা কিন্তু একেবারেই নয়। ঘরে কিছু থাকা সামান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়ে যেতে পারে মটর ডাল দিয়ে মোচার ঘন্ট এবং তা খেতে স্বাদে অতুলনীয় এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর।মোচার মধ্যে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি রক্তাল্পতা, কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় ,হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি পূরণ করতেও জুড়ি মেলা ভার। তাই খেতে সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি এর স্বাস্থ্যগুণ ও অসামান্য।

এবার দেখে নেয়া যাক কিভাবে এই মোচার ঘন্ট তৈরি করব।

রেসিপি এবং উপকরণ:

*উপকরণ --
বড় আকারের মোচা একটি,
মটর ডাল বাটা,
হলুদ গুঁড়ো,
লঙ্কাগুঁড়ো
জিরে গুঁড়ো,
ধনে গুড়ো, তেজপাতা ,শুকনো লঙ্কা,গোটা গরম মশলা। লঙ্কা বাটা, আদা বাটা, দুধ ৩৫০মিলি লিটার, নারকেলকোরা আধমালা ,গোলমরিচ ও গরম মসলা গুড়ো, নুনু পরিমাণমতো, সরষের তেল এবং স্বাদের জন্য চিনি ও ঘি

*রন্ধন প্রণালী-- প্রথমে মোচা টি ভালোভাবে ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে খুব ছোট করে কুচিয়ে কেটে নিতে হবে এবং কেটে সঙ্গে সঙ্গেই নুন হলুদ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে।কাটা যত সুন্দর হবে রান্নার স্বাদ ততই ভালো হবে।

এবার ঐ নুন হলুদ জলে কাটা মোচা একটু সেদ্ধ করে নিতে হবে ।এরপর একটি পাত্রে মটর ডাল বাটা

নিয়ে তার মধ্যে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়া, পরিমাণমতো নুনএবং স্বাদমতো চিনি মিশিয়ে গরম তেলের মধ্যে ভালো মতো করে ভেজে নিতে হবে, ওটা অন্য পাত্রে উঠিয়ে রেখে, এরপর কড়াইতে পরিমাণমত সর্ষের তেল দিয়ে গরম করে তেজপাতা,

শুকনো লঙ্কা ,জিরা ফোঁড়ন দিতে হবে। ফোড়নের সুন্দর গন্ধ বের হলে তাতে আদা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ,জিরে গুড়ো দিয়ে ভালোমতো কষিয়ে নিতে হবে ।মশলা ভালো করে করিয়ে তেল ছাড়লে এরপর সিদ্ধ করে রাখা মোচা এর মধ্যে দিয়ে ভালোমতো নাড়াচাড়া করে তাতে সামান্য একটু জল ও নুন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে ।পাঁচ /সাত মিনিট পর ঢাকনা সরিয়ে তার মধ্যে দুধ ,চিনি ও নারকেল কোরা ও মটর ডালের মিশ্রণটি ঢেলে দিয়ে ভালোমতো নেড়ে

-চেড়ে রান্না করে পুনরায় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়ে মিনিট পাঁচেক পর নামানোর আগে খানিকটা ঘি ও গরম মসলা বাটা ছড়িয়ে দিয়ে চাপা দিয়ে দিতে হবে। ব্যস তৈরি হয়ে যাবে মটর ডাল দিয়ে মাখোমাখো মোচার ঘন্ট। গরম ভাতের সাথে লাজবাব।।

LITINFINITE JOURNAL
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR

Litinfinite Journal Is Indexed By MLA Directory Of Periodicals & MLA International Bibliography, DOAJ, EBSCO, ProQuest, SCILIT, Ulrichsweb & Ulrich's Periodicals Directory, ICI World Of Journals, J-Gate, JISC, ERIH PLUS & Other Major Indexing Services

www.litinfinite.com
Published by Penprints Publication

মুখোশের আড়ালে

প্রশস্তি পন্ডিত

কোচবিহারের রাজাভাতখাওয়ার এলাকার জঙ্গুলে পথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এক নবদম্পতির বিবাহিত জীবনের প্রথম উড়ান, মধুচন্দ্রিমার সফর। পারমিতা আর দিগন্ত নবদম্পতি দুজনেই আজ খুব খুশিয়াল, বহু ঝড় ঝাপটা গেছে দুজনের জীবনেই দু ভাবে। এই সফরে যেতে যেতে তাদের আজ অনেকটা হাল্কা ফুরফুরে মন। সবথেকে ফুরফুরে মনে আজ পারমিতা। গাড়ির হাওয়াতে তার কোঁকরা কালো চুল উড়ে এসে মুখে পরছে। কখন যেন তার হাতটাও জানলার বাইরে এসে গেছে মেলে দিয়েছে বাইরের মুক্ত প্রকৃতিতে। প্রাণ ভরে ঘ্রান নিচ্ছে জঙ্গুলে বাতাসের, চোখ মেলে উপভোগ করছে খোলা আকাশ।

হঠাৎ পাশ থেকে দিগন্ত বলে ওঠে, আহ মিতা, কি করছ, হাত বার করোনা, যদি লেগে যায়...।

পারমিতা দিগন্তের উৎকণ্ঠা দেখে মনে মনে হেসে পুলকিত হয়, এত ভালবেসে আমাকে দিগন্ত! মুখে শুধু একটা লাজুক হাসি হেসে বলে, আরে কিছু হবেনা।

দিগন্ত,পারমিতার সাদাসিধা নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎই ঝড় তুলেছিল। পারমিতার শৈশব কেটেছে এক অনাথ আশ্রমে। বাবা মা বা পৃথিবীতে কারুর কোন ভালবাসার স্পর্শ সে আজ অব্দি পায়নি। বন্ধুবান্ধব ও তেমন বিশেষ নেই, শুধু ওর কলেজের এক জুনিয়র ছাড়া। বিয়ের আশাও সে কোনদিন করেনি, তাদের মত মেয়েকে কেই বা ভালবাসবে, কেই বা বিয়ে করবে। কোনমতে কয়েকটা টিউশনি জুটিয়ে হস্টেলের রুম শেয়ার করে দিন চলছিল তার। ভাললাগার সাথী বলতে শুধু বই, তাই মাঝে মাঝেই চলে যেত কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ায়, সেইখানেই কাটিয়ে আসত বেশ কয়েক ঘন্টা। পুরোনো, নতুন বই ঘেঁটে বেশ তৃপ্তি পেত, অবসর বা আনন্দ যাপন বলতে তার শুধু এটুকুই।

সে চিরকালই লাজুক, তাই খুব একটা বন্ধু পরিবৃত নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হল মেধা। কলেজে আলাপ,

ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত চশমা পরা মেয়েটি একদিন নিজে যেচেই ক্যান্টিনে আলাপ করেছিল চুপচাপ বসে থাকা পারমিতার সাথে, হাই, আমি মেধা ১ম বর্ষ ক্রিমিনোলজি। তুমি? পারমিতা সাধারণত এড়িয়ে চলে এসব গায়ে পড়া অতিআধুনিক মেয়েদের, তার মনে হয় এদের পুরোটাই যেন মেকি শোকেসে মোড়া। পাশ কাটানোর মত হাল্কা উত্তর দেয়, পারমিতা, ২য় বর্ষ ইতিহাস। মেয়েটা ঝপাং করে পাশে বসে বলতে শুরু করে, ওয়াও হিস্ট্রি, আই লাভ হিস্ট্রি, ইউ নো, দেয়ার আর মেনি ইন্টারিলেশান্স বিটুইন দিস টু সাবজেক্টস। আমি কিন্তু তোমাকে প্রায়ই বিরক্ত করব, আর অত বড় নাম বলতে পারছিনা, ইউ আর মাই মিতা দি, ওকে? পারমিতা হয়ত কাটিয়েই দিত, কিন্ত এমন একটা আন্তরিকতা মেয়েটার মধ্যে ছিল যে সে আর না করতে পারেনি, তারপর থেকে, বই ছাড়া ঐ এখন পারমিতার একমাত্র বন্ধু।

বইপাড়াতেই একদিন দিগন্তর সাথে পারমিতার আলাপ। সেই আলাপ যে কখন ধীরে ধীরে ভালবাসার রূপ নিল, তারা নিজেরাও বোঝেনি। বইইয়ের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা পারমিতা হঠাৎই চমকে ওঠে একদিন

পাশ থেকে একজনের কথা শুনে, আপনিও বুঝি আমার মত বই পাগল? না মানে আমিও এখানে এই বইইয়ের খোঁজেই আসি, আপনাকে বেশ কয়েকদিন দেখেছি, তাই আর কি…। পারমিতা বুঝতেই পারেনি সেই ক্ষনিকের আলাপ কখন প্রতি সপ্তাহান্তের একান্ত আকাঙ্খিত মুহূর্ত হয়ে উঠল। বই পাড়া থেকে কফি হাউস, সেখান থেকে হাত ধরে হেদুয়া লেক, বাদাম ভাজার ঠোঙা ভাগ। একদিন যখন দিগন্ত তাকে তার ব্যর্থ প্রেম ও বিবাহের ব্যথা উগড়ে দিয়ে কাতর স্বরে বলল, আমাকে বিয়ে করবে মিতা, আমার অগছালো জীবন তোমার এই সুন্দর দুটো হাত দিয়ে সাজিয়ে দেবে, প্লিজ? পারমিতা গাল বেয়ে তখন জলের ধারা গড়াচ্ছে, দিগন্তের বুকে মুখ রেখে শুধু হাত ধরেছিল পরম ভালবাসায়। তারপর একরকম একমাসের মাথাতেই বিয়েটা হয়ে যায়, আর এখন তারা চলেছে রাজাভাতখাওয়ার দিকে, হানিমুনে। জায়গাটা দিগন্তেরই পছন্দের, আর পারমিতার বেড়াতে যাওয়া বলতে এই প্রথম, দুজনে মিলে বেড়িয়ে পড়েছে।

পারমিতার ঘোর ভাঙে দিগন্তের ডাকে, মিতা, জংগল আমার খুব পছন্দ, জান তো। আর ওখানে খুব বেশি

হোটেল না থাকলেও যে হোটেলটায় আমরা যাব সেটা ওখানে ব্রিটিশ আমল থেকে আছে, আর এখন পুরো মডার্ন ভাবে নিজেদের সাজিয়ে নিয়েছে, যারা জংগল ও নির্জনতা পছন্দ করে, ওখানেই থাকে, তোমার কোন অসুবিধা হবে না দেখ।

পারমিতা মনে মনে ভাবে আমার সুবিধা, অসুবিধা জিগ্যেস করার মত কোন লোকই এতদিন ছিলনা, তুমি যে আমাকে কতটা দিয়েছ দিগন্ত, তা তুমি নিজেও জাননা। মুখে বলে, কি দরকার ছিল শুধু শুধু এত গুলো টাকা খরচ করার।

দিগন্তঃ বউকে নিয়ে প্রথমবার আমি বেড়াতে যাচ্ছি , এটা শুধু শুধু!

মিতা হেসে বলে, বুঝলাম।

গাড়ি এগিয়ে চলে গন্তব্যের দিকে।

পৌঁছতে দুপুর হয়ে যায়। গাড়িটা বিশাল গেট পেরিয়ে যখন নুড়ি বিছানো পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, পারমিতা

মুগ্ধ হয়ে দেখে পাশের যত্ন করে সাজান বাগান, আর তার মাঝে সাদা ধবধবে ভিক্টোরিয়ান আদলের তৈরী হোটেল। নামটাও ভারি মিষ্টি, দ্য রিট্রেট। গাড়ি থেকে নামতেই একটি বয় এসে তাদের মালপত্র নিয়ে রিসেপসনে রাখল। হোটেল ম্যানেজার হাসি মুখে ওদের অভ্যর্থনা করে দিগন্তকে বলল, কেমন আছেন স্যার? আপনার পছন্দের রুম একেবারে রেডি করে রেখে দিয়েছি। এই কানু স্যারের মালপত্রগুলো ঘরে রেখে আয়।

হোটেলের রুমে ঢোকে পারমিতা ও দিগন্ত। খুব সুন্দর ছিমছাম ঘর, বারান্দা দিয়ে প্রকৃতি যেন, হাতছানি মেলে ডাকছে!

রুমবয় কানু এসে ওদের মালপত্র রেখে যাবার সময় দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলে, স্যার এবারে কিন্তু অনেকদিন পর এলেন, আগের বার ঐ...

দিগন্ত মাঝপথে কথা থামিয়ে কানুর হাতে মোটা বখশিস ধরিয়ে দিয়ে হেসে বলে, আজ লাঞ্চে কি আছে?

কানুঃ আজ লাঞ্চে স্যার, বিশেষ কিছু নেই তবে ডিম ভাত হয়ে যাবে, আসলে আপনারা আসবেন (পারমিতার দিকে একটা ফিচেল দৃষ্টি ছুড়ে) জানতামনা তো স্যার, এখন তো এমনিতে এদিকটায় বর্ষায় অফ সিসন তাই অবশ্য জানি আপনার এই সিসনটাই পছন্দ।

দিগন্ত আবার কথা থামিয়ে দিয়ে বলেঃ আছা ঠিক আছে তেমন অসুবিধা নেই, রাতে কিন্তু বনমুরগির ঝোল চাই সাথে রুটি।

কানুঃ হয়ে যাবে স্যার কোন চিন্তা করবেন না, বলে বেড়িয়ে গেল।

পারমিতার অনেকক্ষন থেকেই উশখুশ করছিল, কানু ছেলেটি বেড়িয়ে যেতেই সে দিগন্তকে জিগ্যেস করলঃ ও কি তোমাকে চেনে নাকি, বলল কতদিন পরে এলেন স্যার...

দিগন্ত হেসে বলেঃ ধুস এরা সবাইকেই এরকম বলে মোটা বখশিশের আশায়, দেখলে না বখশিশ পেয়েই কেমন টুক করে বনমুরগির ঝোলে রাজি হয়ে গেল।

পারমিতাঃ তা সে যাই বল ঐ রুম বয় টা আমার দিকে কিরকম বিশ্রীভাবে একটা তাকিয়ে হাসছিল।

দিগন্ত হেসে পারমিতার কাছে এসে ওর চিবুক নিজের মুখের কাছে ধরে বলেঃ ওর আর দোষ কি বল আমার বউ যা সুন্দরী ওকে ক্ষমা করে দাও

পারমিতা লজ্জায় রক্তিম হয় দিগন্তের হাত সরিয়ে বলেঃ ধুস তুমি না, আমি ফ্রেস হয়ে আসছি।

দিগন্ত হেসে সায় দেয়।

দুপুরের লাঞ্চটা ডিম ভাত হলেও ভালোই জমেছিল। খাবারের ঘরটা ছিল নিচে একতলায় বিশাল লম্বা একটা কাঠের টেবিল ও পাশ দিয়ে সারি করে রাখা কাঠের মোলায়েম গদির চেয়ার, দেওয়াল জুরে বড় বড় ওয়াল পেন্টিং, যেমন একটি আছে ওদের রুমেও।

সারা হোটেলটি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ব্রিটিশ আভিজাত্যের নিদর্শন। খাবার সময় আর কাউকে দেখতে না পেয়ে পারমিতা যে ছেলেটি ওদের পরিবেশন করছিল তাকে জিগ্যেস করল, বাকিদের কি খাওয়া হয়ে গেছে? ছেলেটি হেসে উত্তর দিল, এখন তো এদিকে বড় কেউ আসেনা, আপনারাই শুধু আছেন। দিগন্ত সাথে সাথে বলে, ভালই হল বেশ রাজকীয়ভাবে জমিয়ে খাওয়া যাবে, কি বল? সারাদিনের পর খুব তৃপ্তি করে ওরা খেল। আর রান্নাও চমৎকার।

খাওয়া দাওয়া সেরে পারমিতা আবদার করে জংগলটা একটু ঘুরে দেখার। দিগন্তও ভাবছিল বিকেলের দিকটা একটু দুরের ঐ নদীর পাড় থেকে ঘুরে আসতে পারলে ভালোই হয়, তবে হেঁটে গেলে ফিরতে আবার সন্ধে হয়ে যেতে পারে তাই দিগন্ত পারমিতাকে রেডি হতে বলে নিচে নেমে গেল জিপের ব্যবস্থা করতে।

দিগন্ত বেরিয়ে যাবার পর পারমিতা গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে আয়নার দিকে তাকিয়ে কানের দুল

পরছিল, হঠাত দেখে পিছনে একটা মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসছে।

পারমিতা এমনিতে শক্ত মেয়ে হলেও হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত কাউকে নিজের রুমে দেখে প্রচন্ড চমকে উঠে বলে, কে তুমি, কিভাবে ঢুকলে এই ঘরে?

আগন্তুক মেয়েটি একটা ব্যঙ্গের হাসি হেসে উত্তর দেয়, সে কি এটা তো আমারই ঘর!

পারমিতাঃ আপনার ঘর মানে, এই ঘর টা আমার হাসব্যান্ডের নামে বুক করা, নিশ্চয় ও যাবার সময় দরজাটা লক করতে ভুলে গেছে, আপনি রুমটায় ভুল করে ঢুকে পরেছেন।

আগন্তুকঃ লিপিকা সেনের অত সহজে ভুল হয়না। দিগন্ত বসাক তাহলে আবার বিয়ে করেছে!

এইবার রীতিমত থমকাল পারমিতা। সম্পূর্ণ অচেনা এক মহিলার মুখে তার স্বামীর নাম শুনে প্রচন্ড অবাক

হয়ে জানতে চাইল, আ-আপনি কি করে জানলেন আমার হাসব্যান্ডের নাম দিগন্ত বসাক।

লিপিকা নামক রহস্যময়ী মহিলাটি ওর উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করে বলল, নিশ্চয়ই বলেছে জংগল ওর খুব পছন্দ, আর এই হোটেলটাই এখানে সবথেকে নাম করা।

পারমিতা এত অবাক হয়ে গেছে যে ওর মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে বলল, এই আপনি কে বলুন তো আপনি এত কথা জানেনই বা কি করে কি মতলব আপনার? দাঁড়ান আমি এখুনি রিস্পসনে ফোন করছি।

লিপিকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পারমিতার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাল চাও তো পালিয়ে যাও এখনও সময় আছে!

পারমিতা উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে ওঠে, কি সব আবোল তাবোল বকছেন, কে আপনি? আমি এখুনি দিগন্তকে ফোন করছি। পিছন ফিরে মোবাইল ডায়াল করতে যাবে হঠাৎ ঘুরে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই।

প্রচণ্ড ভয়, উত্তেজনায় পারমিতা ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়ে।

মেধা নিজের ঘরে বসে বসে তার রিসার্চের লেটেস্ট আসাইনমেন্টের পেপারটা তৈরী করতে করতে হঠাৎই আনমনে পারমিতাদির কথা ভাবছিল। কেমন হুট করে মিতাদি আর দিগন্ত জিজুর বিয়েটা হয়ে গেল মাত্র দুমাসে। মিতাদি তো প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে ভুলেই গেছিল মেধার কথা। একেবারে বিয়ের নিমন্ত্রণ নিয়ে ফোন। অনুষ্ঠান বা রেজিস্ট্রেশন কিছুই হয়নি, জাস্ট মন্দিরে মালা পরান, সিঁদুর দান, আর জমিয়ে দামি এক রেস্তোঁরায় খাওয়া। অবশ্য রেজিস্ট্রিটা হবে, ওদের হানিমুন থেকে ফিরে, তাড়াহুড়োতে ডেট পায়নি তখন। পারমিতার তরফে তো কেউ নেই শুধু মেধা ছাড়া। আর দিগন্তের বাবা মা দুজনেই গত হয়েছেন। দিগন্ত একটা ওষুধ কোম্পানিতে কেমিস্টের কাজ করে। কেমিস্ট হলেও বইয়ের ওপর ভালোই টান, বিশেষত ক্রাইম থ্রিলার আর পারমিতার টান আধুনিক বাংলা কবিতা, এভাবেই বই পাড়াতেই দুজনের আলাপ। মিতাদির থেকেই শুনেছিল দিগন্ত জিজুর পাস্টে বিয়ে নিয়ে একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্সের কথা। তাই, বিয়ের

দিন রেস্তোঁরায় খেতে খেতে ভালই জেরা করেছিল জিজুকে, কবে, কাকে বিয়ে, কি বৃত্তান্ত, ডিভোর্স কবে হয়েছে এইসব। যদিও জিজু একটা কথারও কোন সঠিক জবাব দেয়নি, সবটাই পাশ কাটানো উত্তর। আর বেশ বিরক্ত ও হয়েছিল সেদিন মেধার ওপর। মেধা অবশ্য এসব ব্যাপারে বেশ চোখ কান কাটা। কিন্তু মুশকিলটা হল মিতাদিকে নিয়ে। মিতাদি এমনভাবে সব ব্যাপার আড়াল করছিল, আসলে মিতাদিকে দোষও দেওয়া যায়না। এতদিন পর সে নিজের ঘর, সংসার, নিজের মানুষ পেয়েছে, মেধা শুধু চায় খুব ভাল থাক দুজনে। এখন তো তারা রাজাভাতখাওয়া গেছে হানিমুনে। উফফ এই বর্ষার অফসিজনে কে যে জংগলে যায়! তা জিজুর আবার ভিড়ভাট্টা অপছন্দ, আর মিতাদি তো চিরকালই লোক এড়িয়ে চলে, একেবারে রাজযোটক, হাসে মেধা মনে মনে। আচ্ছা, এখন কি করছে মিতাদি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে, করবনা করবনা করেও ফোনটা করেই ফেলল মিতাদিকে...

ফোনের শব্দে চমকে উঠে কাঁপা হাতে ফোনটা রিসিভ করল পারমিতা। একটু আগের ঘটে যাওয়া ঘটনার

আকস্মিকতায় এখনও সে বাক্রুদ্ধ। সে এখনও বিছানা তেই বসে আছে।

ওপ্রান্ত থেকে চিরপরিচিত মেধার সেই খুশিয়াল গলাঃ কি ম্যাডাম খুব তো জংগলে হনিমুন কাটাচ্ছেন, ডিস্টার্ব করলাম নাকি নতুন কত্তা গিন্নি কে?

পারমিতা মেধার গলা শুনে যেন আবার বাস্তবে ফেরে। স্বাভাবিক হবার ভান করে বলেঃ আরে না না, আমরা তো আজই এলাম।

মেধার সজাগ কানে মিতাদির অসস্তিটা এড়ায় না, চিন্তিত স্বরে বলে, একি মিতা দি তোমার গলাটা কেমন যেন লাগছে কি হয়েছে, এনি প্রব্লেম?

পারমিতা তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলে, ও কিছু না, গলাটা একটু ধরেছে ঠান্ডা লেগে।

কি যে করনা, অজানা জায়গায় যেতে না যেতেই ঠান্ডা লাগালে, একটু সাবধানে থাকবে তো! জিজু কি করছে, বিয়ের দিন অত জেরা করে প্রশ্ন করেছি বলে এখনও

আমার ওপর খাপ্পা নাকি! তা আমার মিতা দির কার সাথে বিয়ে হচ্ছে একটু জেনে নেব না, তুমিও কি রাগ করেছ?কাঁচুমুচু মুখে প্রশ্ন করে মেধা।

পারমিতা এবার হেসে ফেলে বলে, আরে ধুর, তোর জিজু নিচে জীপের ব্যবস্থা করতে গেছে, জংগলে যাব বলে, রাতে ফোন করিস।

মেধাঃ ইসস তোমার লেট করিয়ে দিলাম কত, আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি এরপর আবার রাতে ফোন করব! যাওবা রাগ কমার ১০% চান্স থাকবে তখন সেটাও যাবে।

খুব ফাজিল হয়েছ, ওকে পরে কথা হবে, কপট রাগ দেখায় পারমিতা।

আচ্ছা তোমরা কোথায় উঠেছ, জায়গাটা কেমন? আমায় হোয়াটস্যাপে জানিও, এখন তাহলে রাখলাম, বাই।

মেধার ফোন ছাড়তেই দিগন্ত ঘরে এসে ঢুকে কাঁচুমাঁচু মুখে বলল, আজ অনেক চেষ্টা করেও গাড়ি জোগাড়

করতে পারলামনা গো। বেশি বখশিস দিয়েও রাজি হল না। তবে কালকের জন্য কথা পাকা করে এসেছি।

পারমিতা ঠিক সহজ হতে পারছেনা ঠিক আছে বলে এড়িয়ে গেল, বলল আমার এমনিতেও ভীষণ টায়ার্ড লাগছে, আমি শুয়ে পড়ছি। দিগন্ত একটু অবাক হলেও ভাবল সারাদিনের ধকল, আর কিছু না বলে নিচে ডিনারে গেল, তারও আজ বড় ক্লান্ত লাগছে। এটুকু নিশ্চিন্ত যে, জিপটা কাল জোগাড় হয়েছে, পারমিতাকে স্পেশাল সারপ্রাইস দেওয়া যাবে, তৃপ্তির হাসি হাসে দিগন্ত।

পরের দিন সকাল। পারমিতা দিগন্তকে কালকের ঘটনাটা বলব বলব করেও বলে উঠতে পারেনি, অনেকবার ভেবেছে বলবে, কিন্তু কোথাও ১টা বাধা ঠেকেছে, তাই একটু আনমনা হয়ে বাইরে তাকয়ে আছে।

স্নান সেরে দিগন্ত দেখে পারমিতা আনমনা হয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কাল ওদের আর বেরনো হয়নি, দিগন্ত ভাবছে হয়ত সে কারনে মন খারাপ।

দিগন্তঃ কি ব্যাপার মিতা? তোমার কি হয়েছে বলত? সেই কাল থেকে দেখছি ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে আছ, কিছু বলতে গিয়েও বলছ না, কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

দিগন্ত এসে পরম মমতায় মিতার হাত দুটি নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলে, কাল গাড়ি ঠিক করে বেরোতে পারিনি বলে রাগ করেছ? কাল তো সন্ধেও হয়ে যাচ্ছিল বল, আচ্ছা আমি তোমাকে অন্য একটা সারপ্রাইস দেব, ইউ উইল লাভ ইট।

পারমিতা শূন্য দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে যে এখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল শুরু হয়েছে, জোর করে সে সব ভাবনা মন থেকে সরিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল, কি সারপ্রাইস?

দিগন্তঃ উঁহু সেটা তো এখন বলা যাবে না, আগে চল রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ি, বেড়াতে এসে হোটেলের রুমে ভালোলাগে নাকি, তুমি স্নান সেরে রেডি হয়ে নাও, আমি গিয়ে কালকের কথা বলে আসা জীপটাকে ডেকে

আনি, আজকে অনেক সময় আছে, তুমি আসতে আসতে রেডি হয়ে নিচে এস, কোন তাড়া নেই।

পারমিতা বেশ বলে স্নানে ঢুকল, আর দিগন্ত গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল।

পারমিতা রেডি হয়ে নিচে নামল। খুব সুন্দর সেজেছে আজ ও। ঘন জংগলা রঙের শাড়ি আর ম্যাচিং হারে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। দিগন্ত এখনও ফেরেনি, ও হোটেলের লনটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। হোটেলের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে পারমিতা মুগ্ধ হয়ে গেল, সবুজ গালিচার লনের পাশে যত্ন করে সাজানো অপূর্ব ফুলের বাগান, দেখতে দেখতে পারমিতা ভুলেই গেল কালকের হোটেলের রুমে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার কথা।

পারমিতা বাগানের একটা ফুলের গাছের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে, একটা মেয়ে তার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে হাসছে।

মেয়েটি পারমিতাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে, দিগন্ত তাহলে আবার ফিরে এসেছে?

পারমিতা চমকাতে গিয়েও এবার নিজেকে সামলে নিয়ে স্পষ্ট ভাবে বলে, হ্যাঁ, ফিরে এসেছে আর আবার বিয়েও করেছে, তো? আপনার পরের প্রশ্নটার উত্তর আগেই দিয়ে দিলাম। এই আপনারা কারা বলুন তো, কাল একজন এসেছিলেন, আজ আর একজন, কি মতলব আপনাদের? টাকা চান? নাকি অন্য কিছু? এই ধরনের ফালতু রসিকতা কিন্তু আমি একদম ভাললাগেনা।

পারমিতার কথা শুনে হা হা করে হেসে উঠল মেয়েটি, তুমি দেখছি আমার মতই বোকা আর প্রেমে অন্ধ!

পারমিতা খুব অবাক ও অসহায় গলায় এবার জানতে চাইল, তার মানে? তুমি কে প্লিজ আমাকে বলবে… আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।

মেয়েটি বলে, আমি বৈদেহী দত্ত, তা দিগন্ত কবে তোমায় তার ‘স্পেশাল সারপ্রাইস’ টা দিতে চলেছে?

এবার প্রচন্ড চমকাল পারমিতা, কোনমতে জানতে চাইল, ও আমাকে সারপ্রাইস দেবে, তুমি কি করে জানলে?

বৈদেহী নামক মেয়েটি অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলে, বাঃ; আমি জানব না, আমাকেও যে দিয়েছিল 'স্পেশাল সারপ্রাইস' ! আমি এও বলে দিচ্ছি সারপ্রাইসটা হল রাতে জংগলে বনফায়ার, শুধু তোমরা দুজন থাকবে, এরকম একটা নির্জন জায়গায়, ওহ আর সাথে বন মুরগির রোস্টের সাথে চিল্ড বিয়ারের ও ব্যবস্থা থাকবে।

পারমিতা আর পারছেনা, প্রচন্ড অবিশ্বাস, হতাশা ও ব্যর্থতায় সে ভেঙে পড়ছে ধীরে ধীরে।

বৈদেহী নামক মেয়েটি বলে চলে, আমি কিভাবে এতকিছু জানি, সেটা বোধহয় তোমার না জানাই ভালো, এখনও সময় আছে। পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও...

পারমিতা কিছু বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ দিগন্তের ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে আবার ঘুরে তাকাতেই দেখে, মেয়েটি নেই, সেই আগের মেয়েটির মতই যেন বেমালুম বেপাত্তা হয়ে গেছে।

দিগন্ত কাছে এসে বলে, ম্যাডাম আপনার জীপ গেটে অপেক্ষা করছে, চলুন। আরও কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, সাথে 'স্পেশাল সারপ্রাইস' টারও ব্যবস্থা করে এলাম, রাতে আমি তোমাকে জংগলের একটা দারুন জায়গায় নিয়ে যাব, নদীর ধারে বন ফায়ার করতে, কানুটাকে বলে রেখেছি ঝাল ঝাল করে বনমুরগির রোষ্ট করে দেবে, আর সাথে চিল্ড বিয়ারও থাকবে, জানি তুমি এসব খাও না, বাট একটা দিন তো, জংগলে দেখবে রাতের একটা অন্য মাদকতা, অন্য রূপ...

দিগন্তর শেষের কথা গুলো পারমিতার কানে আর ঢোকেনি, সে জ্ঞান হারাল।

সন্ধেবেলা পারমিতা চোখ খুলে দেখে উদ্বিগ্ন মুখে দিগন্ত ওর দিকে চেয়ে বসে আছে, ও ওঠার চেষ্টা করতেই ওকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে বলে উঠল, উঠতে যেও না, ডাক্তার দেখে গেছেন, বললেন, ভীষণ স্ট্রেস ও শকে তোমার হঠাৎ নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে, কি ব্যাপার মিতা? কি নিয়ে তুমি এত ভাবছ? কি হয়েছে তোমার?

পারমিতা মাথাটা ধরে বলল, না আসলে মাথাটা এত ভারি লাগছে, আগে কখনও অচেনা জায়গায় আসিনি তো, তাই হয়ত...

দিগন্তঃ উফফ, ভেবছিলাম আজই তোমায় 'স্পেশাল সারপ্রাইস' টা দেব, কি যে করনা, যাকগে তুমি রেস্ট নাও আমি নিচে গিয়ে তোমার জন্য একটু গরম দুধের ব্যবস্থা করে আসি বলে দিগন্ত বেরিয়ে যায়।

পারমিতা ভাল করে দেখে নিয়ে ঝটপট মোবাইলে ডায়াল করে মেধার নাম্বার।

মেধাঃ (নাম্বারে চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসে ফোন রিসিভ করল) কি হানিমুনে গিয়েও মেধাকে মিস করছ?

পারমিতা কোনমতে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলে, মেধা আমার মনে হয় কোন বিপদ আসতে চলেছে, যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা কি করে তোকে বলব।

মেধা প্রচন্ড অবাক হয়ে জানতে চায়, বিপদ! তার মানে! কি ব্যাপার একটু খুলে বলবে প্লিজ।

পারমিতাঃ আমি নিজেও ঠিক সিউর নই, তোকে কাল হোটেলের যে অ্যাড্রেস পাঠালাম, এখানে প্লিজ একটু চলে আসতে পারবি, আর শোন, তোকে দুটো নাম বলছি একটু নোট কর, এদের ব্যাপারে একটু খোঁজ নিস তো, লিপিকা সেন আর বৈদেহী দত্ত, এই হোটেল আর দিগন্ত...হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজ হতেই পারমিতা বলে, আচ্ছা শোন, তোকে আবার পরে ফোন করব, কাল বা পরশু পারলে প্লিজ চলে আসিস, এখন রাখছি।

মেধাঃ হ্যালো, কাল কি করে যাব, মানে কি ব্যাপার একটু খুলে বল, লিপিকা সেন, বৈদেহী দত্ত এরা কারা? তার সাথে জিজুরই বা কি সম্পর্ক আমি কিছু বুঝতে পারছিনা, পুরোটাই ঘেঁটে যাচ্ছে! হ্যালো? একি যাঃ ফোনটা কেটে দিল…! প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে মেধা লেগে পড়ে মিতা দির দেওয়া নাম গুলো ওর ডায়রিতে নোট করতে, কিছু তো একটা সিরিয়াস ব্যাপার আছেই, নাহলে মিতাদি এভাবে তাকে ফোন করতনা।

মাঝের দিন পারমিতা পুরোই ঘরে শুয়ে কাটিয়েছে, হোটেল থেকে কোথাও বেরোয়নি। দিগন্ত ও মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বুঝতে পারছেনা কি হল পারমিতার। পরের দিন সকালে, দিগন্ত পারমিতার মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে চায়, আজ কেমন লাগছে মিতা? কাল তো সারাদিন শুয়ে রইলে, কোথাও বেরলে না, আজ আর কোন কথা শুনবনা, আজ তোমায় বেরতেই হবে, সারাদিন এভাবে রুমে শুয়ে থাকলে আরও শরীর খারাপ করবে যে। কিছুই তো ঘুরলেনা আর কাল চেক আউট, আজকে আর না করনা প্লিজ…

পারমিতা কি বলবে ভেবে না পেয়ে ইতস্তত করছে, হঠাৎ দরজায় নক।

দিগন্তঃ নির্ঘাত রুম সার্ভিসের ছেলেটা, বলে দরজা খুলে প্রচণ্ড অবাক ও বিরক্তি মুখে নিয়ে বলল, একি? তুমি এখানে?

দরজার ওপ্রান্ত থেকে মেধা বলে উঠল, হ্যাঁ আমাকে যে আসতেই হল, এসে খুব অসুবিধায় ফেলে দিলাম মনে হচ্ছে?

দিগন্তঃ হ্যাঁ, তো যে কোন স্বাভাবিক রুচি সম্পন্ন মানুষ তো আর নবদম্পতির হানিমুনে এসে হানা দেয় না। অবশ্য তোমার মত নির্লজ্জ মেয়ের থেকে সেটা আশা করাটাই ভুল।

মেধাঃ একদম ঠিক বলেছে মিস্টার বসাক, আমার মত বেহায়া মেয়েরা তো আর আপনাদের মেকি প্রেমের জালে জড়ায়না, তাই এসব মেটিরিয়ালকে ঠিক ডাইজেস্ট করতে পারেননা, তাই তো?

প্রচন্ড রেগে গিয়ে দিগন্ত বলে উঠল, কিসব আবোল তাবোল বকছ! মিতা এসব কি ব্যাপার?

মেধার গলা শুনে পারমিতা খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বলে উঠল, মেধা তুই এসে গেছিস?

মেধাঃ হ্যাঁ, মিতা দি তোমার কোন চিন্তা নেই, এই বলে মেধা একরকম দিগন্তকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢোকে, তার পিছনে লোকাল থানার ইনচার্জ। দিগন্তর দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় সে বলে উঠল, হ্যাঁ আমি তো আবোল তাবোলই বকছি, ঠিক যেমন বকেছিল লিপিকা সেন ও বৈদেহী দত্ত?

নাম দুটো শুনে ও সাথে পুলিশ দেখে প্রচন্ড চমকে ওঠে দিগন্ত, যদিও তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠে, কে? এরা কারা?

মেধাঃ আপনার মিথ্যা আর প্রেমের অভিনয়ে কোন খুঁত নেই কিন্তু এই চমকানোর অ্যাক্টিং এ যে পুরোই ধ্যাড়ালেন। পরশু রাতে আমি মিতা দির থেকে দুটো নাম জেনেই প্রথমে ক্রিমিনোলজির হিস্ট্রি রেকর্ড সার্চ

করি, কিন্তু এদের কোন ট্রেস পাইনা। মিতাদির শেষের ছাড়া ছাড়া কথাগুলো দিয়ে জোড়ার চেস্টা করি আপনার সাথে এদের নাম। সেখানে আপনার কলেজ বা কর্মক্ষেত্র কোথাও এমন কোন নামের খোঁজ না পেলেও আপনার কলেজ ও কর্মক্ষেত্র থেকে উঠে আসে কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য! কলেজে আপনি ছিলেন প্রচন্ড মুখচোরা এবং কারোর সাথেই সেভাবে কথা বলতেন না, রিসা নামের একটি মেয়েকে প্রেম নিবদন করে প্রত্যাখ্যাত হবার পর আপনার মেকি পুরুষত্বে খুব ঘা লাগে এবং আপনি প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতে থাকেন। একদিন সুযোগ বুঝে জলের গ্লাসে ড্রাগের ডোজ দিয়ে সর্বনাশ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অন্য বন্ধুরা চলে আসায় আপনার সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি, তবে আপনাকে রাস্টিকেট করা হয়, আর বাকি পড়াশুনাটা আপনি প্রাইভেটে করেন, সেই থেকেই মেয়ে জাতটার প্রতি আপনার ভারি রাগ! কি ঠিক বলছি তো?

দিগন্ত মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, সে সব অনেক আগের কথা, ছোট বয়সের ভুল, তুমি এসব কথা বলে এখন কি প্রমাণ করতে চাও? পারমিতার কাছে গিয়ে, দিগন্ত

তার হাত ধরে বলে ওঠে, বিশ্বাস কর মিতা আমি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছি!

মেধাঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই বদলে তো আপনি গেছেনই, রেপিস্ট থেকে খুনি হয়েছেন। অফিসের কারোর সাথে তো আপনার কোন বনিবনা নেই, কিন্ত প্রতি দু বছর অন্তর যে ঠিক এই বর্ষার সময় ছুটি নেন, সে খবর কিন্তু আপনার কলিগ মিঃ আগরওয়াল আমায় দিয়েছেন, এই অফ সিজনে আসতেই আপনার ভাললাগে, তাই না, সব কাজ বেশ নির্বিঘ্নে সাড়া যায়।

দিগন্তঃ দিস ইস অ্যাবসার্ড! ছুটি নেওয়া নিশ্চয়ই কোন অপরাধ নয়, আমার লোকজন বেশি পছন্দ নয়, তাই আমি এই সময় আসি।

মেধাঃ উঁহু একটু যে ভুল বললেন, লোকজন পছন্দ নয়, কিন্তু অনাথ মেয়েদের যাদের তিন কুলে কেউ নেই, হারিয়ে গেলে কেউ খুঁজেও দেখবেনা বা থানাতেও ডায়রি করবেনা, এসব মেয়েদের তো আপনার খুব পছন্দ। যে কোন মেয়েই তো আপনাকে আপনার সেই কলেজ লাইফের প্রত্যাখ্যানের কথা মনে

করিয়ে দেয়। তাই তাদের খুন করেই আপনি এক বিকৃত তৃপ্তি পান।

একটু থেমে আবার শুরু করল মেধা।

লিপিকা সেন বা বৈদেহী দত্ত কে যখন আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনা, হঠাৎই আমার মিতাদির কথা মনে হল। আমি অনাথ আশ্রমের দিকে খোঁজ করলাম এবং অদ্ভুত ব্যাপার তখনি আমার হাতে প্রথম তথ্য এল, এরা দুজনেই কোলকাতার দুটো আলাদা জায়গায় অনাথ আশ্রমে থেকে বড় হয়েছে। ক্রিমিনোলজি নিয়ে হায়ার স্টাডিস করার জন্য আমাকে প্রায়ই বিভিন্ন কারনে বিভিন্ন পুলিশ ডিপার্ট্মেন্টে ভিসিট করতে হয়, সে সুত্রে চেনাজানাও অনেক সে কারনে এসব তথ্য যোগাড় করতে আমার কোন অসুবিধাই হয়নি। তবে সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল লিপিকা সেন ছয় বছর আগে আগস্ট মাস থেকে নিখোঁজ আর বৈদেহী দত্ত চার বছর আগের আগস্ট মাস থেকে নিখোঁজ। বৈদেহী যে মেসে থাকত সেখানকার রান্নার মাসিকে সে জানিয়েছিল তার আগস্টে বিয়ে আর পরের দিনই তারা হানিমুনে যাচ্ছে, কোথায় বলুন তো? ঠিক এই রাজাভাতখাওয়ায়। কি

অদ্ভুত না! আর তারপর থেকে সে আর তার একমাত্র গল্প করার সঙ্গী রান্নার মাসির সাথে কোন যোগাযোগ করেনি, তার ফোন ও নট রিচেবল, মাসির দুঃখ হলেও ভেবেছে এতদিনে মেয়েটার ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে তাই হয়ত আগের কথা ভুলে থাকতে চায়। তাই আর তিনি খোঁজ নেননি, কিন্তু তিনি তো আর জানেননা যে সে আর যোগাযোগ করার অবস্থাতেই নেই!

দিগন্ত তেড়িয়া হয়ে বলে উঠল, তো আমি তাতে কি করব?? আমার একার হানিমুন ডেস্টিনেশানই তো আর রাজাভাতখাওয়া নয়, অনেকরই ডিফারেন্ট চয়েস হতে পারে।

মেধাঃ হ্যাঁ সে তো হতেই পারে। কিন্তু সেই একই সময় আপনার অফিস থেকে ছুটি নেওয়াটা আবার বড্ড বেশি কাকাতালিয় যে! আপনার সাধের কানুকে কিন্তু দু তিন বার ধমক দিতেই সে সবটা উগড়ে দিয়েছে। আপনার আগে এখানে আসা, দুজন আলাদা আলাদা ম্যাডামের সাথে... যারা চেকইন করলেও চেক আউট করেননি কোনদিনই, সে কথাও সে জানিয়েছে। ম্যানেজার ও কানুকে মোটা বখশিস দিয়ে হাতে রাখা।

হোটেলের ভেতরে যতক্ষণ কিছু না হচ্ছে তাদেরও কোন দায় নেই।

এই অঞ্চলে সি সি টি ভি না থাকায় আপনার আরওই সুবিধা! তবে একটু ভুল করে ফেলেছেন যে, আজ তাড়াহুড়োতে সকাল বেলায় আবার বন ফায়ারের জায়গাটা দেখতে গিয়ে গাড়ির ড্রাইভারকে সাথে নিয়েই চলে গেছিলেন, সাধারণত যেটা আপনি গাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজেই ড্রাইভ করে যেতেন। তিনি তো জায়গাটা চিনিয়ে দিয়েছেন এখন ঐ জায়গাটা লোকাল থানার লোক খুঁড়ে দেখছে। দুজনের মৃতদেহই হয়ত পাওয়া যাবে। 'স্পেশাল সারপ্রাইজ' দেবার নাম করে বিয়ারে ওষুধ মিশিয়ে মাতাল করে নির্ম্মমভাবে গলা টিপে হত্যা করেননি ঐ দুজনকে? উত্তর দিন? মেধার ক্ষীপ্ত দৃঢ় কন্ঠে দিগন্ত পুরো নার্ভাস হয়ে গেছে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে, দিগন্ত আমতা আমতা করে বলে, কি-কি সব বলে চলেছেন, এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। আপনি আমাকে ফাঁসাতে চাইছেন, বেশ বুঝতে পারছি।

মেধাঃ বাঃ, এই তো তুমি থেকে বেশ আপনিতে উঠে এসছেন দেখছি! তবে আসল ট্যুয়িস্ট তো এখনও বাকি, এবার আসি এই হোটেলের কথায়। এই হোটেলের নাম দিয়ে সার্চ করতেই আমি চমকে উঠি। এই হোটেলে আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে ব্রিটিশ আমলের তিন তিন জন মহিলা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। কেসটা আরকাইভ থেকে নিয়ে স্টাডি করে জানতে পারি, প্রথম নিখোঁজ মহিলা যার নাম ছিল মেরী সে এখানকার এক ম্যানেজার দুলালকে তার কোন অশালীন ব্যবহারের জন্য বিশ্রী ভাবে অপমান করে। সে নাকি মেরীকে প্রেম নিবেদন করে বসেছিল! আর মেরী ও তার সাথীরা তাকে নেটিভ, আনকালচারড বলে যথেচ্ছ অপমান ও তার এরকম আনপ্রফেশনাল ব্যবহারের জন্য যারপনাই হেনস্থা করে, তার চাকরি তো যায়ই, সাথে মলেস্টেশানের চার্জে তাকে কিছুদিন জেলেও কাটাতে হয়। সেই থেকেই রাগে অপমানে ফুঁসছিল দুলাল। তার দুদিন পরই মেরীর লাশ পাওয়া যায় জংগলের মুখে। পুলিশ দুলালকে তুলে নিয়ে অনেকভাবে জেরা করেও তখন কিছু প্রমাণ পায়না। বেশ কয়েকদিন হাজতে রেখে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। দুলাল আবার

তার চাকরিও ফিরে পায় যদিও ম্যানেজার নয়, হোটেল সহকারির পদে এবার নিযুক্ত হয় সে। এরপর ঠিক দুবছরের ব্যবধানে আরও এক মহিলা নিখোঁজ হয়ে যায় এই হোটেল থেকে, তার লাশ পাওয়া যায়নি, আবার দুবছরের ব্যবধানে আরও একজন। পরপর এই নিঁখোজের ঘটনায় টনক নড়ে ব্রিটিশ সরকারের। তদানিন্তন দুঁদে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার থমাস এডকিন্স তদন্ত করে দুলালকে গ্রেপ্তার করে এবং দুলাল তার অপরাধ স্বীকার করে জানায় প্রথম খুনটা সে প্রতিশোধ নেবার জন্য করে থাকলেও পরে ধরা না পড়ায় তার সাহস বেড়ে যায় এবং ম্যাডামদের এক্সক্লুসিভ নাইট সাফারির কথা বলে দুলাল তাদের রাতে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে হত্যা করত এবং প্রতিটা হত্যার পর সে এক পৈশাচিক তৃপ্তি পেত। বডি গুলো সে মাটি খুঁড়ে চাপা দিয়ে দিত। সেই একই প্যাটার্নে খুন করেন তারই আর এক বংশধর দুলাল বসাকের গ্রেট গ্র্যান্ডসন মিস্টার দিগন্ত বসাক!

ঘরে একটা আলপিন পড়লেও বোধহয় এখন শব্দ হবে।

মেধা বলে চলে, ফাঁসির আগে জেলে বসে লেখা তার ডাইরি তো আপনাদের বাড়িতেই ফেরত দেওয়া হয়। খুনের রক্ত ও সেই প্রবণতা আপনার মধ্যে আগে থেকেই একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছিল, তবে সম্প্রতি বোধহয় সেই ডায়রি আপনার হাতে আসে আর তাতে আপনি আরও অনুপ্রাণিত হয়ে এই জায়গা, ও এই হোটেলকেই আপনার হত্যার ষড়যন্ত্র ভূমি বানান, কি ঠিক বলছি তো?

দিগন্ত দাঁতে দাঁত চিপে বললঃ হ্যাঁ, আমি, আমিই খুন করেছি, এই সবকটা খুন আমি করেছি। এই মেয়েদের বেঁচে থাকার কোন আধিকার নেই। অহংকারি, বেইমান সবকটা। ভালবাসার মর্ম বোঝে না। ভালবাসার জন্য আমার কলেজ লাইফটা পুরো শেষ হয়ে গেল। শুধু আমার নয়, আমার গ্রেট গ্রান্ডফাদারের সাথেও এই এক জিনিস। তার জীবনটাও জেলে শেষ হয়েগেছিল। অপরাধ? সেই একি! একজন ইন্ডিয়ান হয়ে এক বিদেশিনিকে প্রেম নিবেদন করতে যাওয়া! কি না কি বলে অপমান করেছিল, নেটিভ ব্লাডি ইন্ডিয়ান, সাথে বিনা কারণে মলেস্টেশানের চার্জে জেলেও ঢুকিয়েছিল। বেশ করেছিল খুন করে, আমিও বেশ করেছি, আবার

করব। যখন ভালবাসা বোঝার কোন মন এদের নেই, শুধু অপমান আর প্রত্যাখ্যান, তখন এদের বেঁচে থাকারও কোন অধিকার নেই। কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণ কি করে করবে শয়তানি হাসি হাসে দিগন্ত।

মেধাঃ ভাল যদি সত্যিই বাসতেন মিস্টার বসাক, তাহলে তাদের ডিসিশনকেও সম্মান করতেন, প্রত্যাখ্যাত হবার জন্য তার সর্বনাশ করতে চাইতেন না, ঠিক যেভাবে চেয়েছিল আপনার গ্রেট গ্রান্ডফাদার। আর প্রমাণ? এই রুমে ঢোকার পর থেকে আমার রেকর্ডার অন ছিল, আপনার পুরো কনফেশানটাই এখন এই ফোনে রেকর্ডেড। আর আপনার সেই বন ফায়ারের জায়গাটিও এতক্ষণে খুঁড়ে নিশ্চয়ই অনেক কিছু পাওয়া গেছে, আর বাকিটা লোকাল থানার ইনচার্জ মিঃ দীক্ষিতই সামলে নিতে পারবেন।

দিগন্ত রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, তোকে আমি ছাড়ব না।

মেধা বরফকাটা ছুরির মত ধারালো গলায় বলে উঠল, এই তো মুখোশের আড়াল থেকে এবার কুৎসিত

চেহারাটা বেরিয়ে আসছে। আগে দু দুটো খুনের সাজা খেটে জেল থেকে তো বেরোন, তারপর এসব ভাববেন। পুরো হোটেলটাই এখন পুলিশ ঘিরে রেখছে, কানু ও হোটেল ম্যানেজার দুজনেই আপনার বিরূদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজি হয়েছে। মিঃ দীক্ষিত আসুন।

মিঃ দীক্ষিত দিগন্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, সাথে মেধাকে এই অল্প বয়সে এমন একটা ক্রিটিক্যাল সিরিয়াল কিলিং এর কেস সলভ করার জন্য অকুন্ঠ অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

মেধা এবার পারমিতার দিকে ফিরে বলে, তবে মিতাদি একটা জিনিস কিছুতেই ক্লিয়ার হচ্ছেনা এই দুটো মেয়ের নাম তুমি কি করে জানলে বলত? দিগন্ত তো রেজিস্টারে নিজের নামেই বুকিং করেছে আগের দুটোর মত এবারেও, তাহলে…?

পারমিতা এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসেছিল। বিশ্বাস করতে পারছিল না তার এত ভালবাসার মানুষ দিগন্ত এরকম একটা সাঙ্ঘাতিক ঠান্ডা মাথার খুনি! দুহাতে মাথা ধরে সে বলে উঠল, আমার কাছেও তো পুরোটা

এখন হেঁয়ালি লাগছে, সব গুলিয়ে যাচ্ছে, তারা যদি মৃত হয়, তাহলে আমি তাদের কিকরে দেখলাম? তারাই তো আমাকে সব বলল, বারবার পালাতেও বলছিল!

মেধাঃ কি বলছ? তা কি করে সম্ভব? এই দেখ ওদের ছবি আমি জোগাড় করেছি, বলে মেধা মোবাইলটা দেখায়। চমকে উঠে পারমিতা বলে, এরাই তো! এ হল লিপিকা আর পরের জন বৈদেহী, এরাই তো এসেছিল এই রুমে, বাগানে, আমাকে বারবার সাবধান করছিল, পালিয়ে যেতে বলছিল!

মেধাঃ কি বলছ, যদিও এসব আমি বিশ্বাস করিনা তবে হয়ত সত্যিই কিছু আছে যা আমাদের সাধারন যুক্তিবুদ্ধির অতীত! আমি কথা দিচ্ছি তাদের মৃত্যুর যাতে সঠিক বিচার হয়, সে ব্যাপারে আমি শেষ অবধি লড়ব।

পারমিতা হঠাৎ প্রচন্ড ইমোশনাল হয়ে মেধার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, তোর জন্য আজ আমি বেঁচে

গেলাম রে মেধা, নাহলে আজই ঐ শয়তানটা আমায় খুন করে দিত জংগলে নিয়ে গিয়ে।

মেধাঃ হুঁ, অতই সোজা মেধা থাকতে তার মিতাদিকে কেউ কিচ্ছু করতে পারবেনা। বিয়ের আগে এই খোঁজটা ঐ শয়তানের জানা থাকলে সে আর এগতো না। এখন চল তো আমরা বেড়িয়ে পড়ি জংগলসাফারিতে। এখানে এসে এত সুন্দর প্রকৃতি উপভোগ না করেই চলে যাব!

পারমিতা মেধাকে জড়িয়ে ধরে জানলা দিয়ে জংগলের দিকে আবার চোখ রাখল। জংগলের সবুজ সজীবতাকে সে যেন আবার নতুন করে ভালবাসতে পারছে।

সেই চিঠি

প্রদীপ্ত তেওয়ারি

(এক দিদির তার বোনকে লেখা একখানি পত্র)

প্রিয়

মিলি,

কাল বিকেলের ডাকে তোর চিঠি এলরে সোমদৃপ্তাদের বাড়ির ঠিকানায় । আজ ভোর ভোর সেই চিঠি পেলাম, ওই দিয়ে গেল। সত্যিই চৈত্রের শেষবেলায় লেখা তোর চিঠিটা এসে পৌঁছোতে বৈশাখের প্রায় মাঝামাঝি হয়ে গেল । কি আর করবি বল বর্তমান ডাকবিভাগের অবস্থা যে কি তা তো আর তোর অজানা নয় । বেশ কিছুদিন ধরেই তোর চিঠির অপেক্ষায় ছিলামরে । তোদের কোনো খবর না পেয়ে একটু চিন্তিতই ছিলাম, যাই হোক শেষমেষ তোর কুশল মঙ্গল চিঠি হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল । তোরাও নিশ্চই আমার চিঠির অপেক্ষায় ছিলি, কিন্তু কদিন অফিসের কাজের চাপে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে লিখব, লিখব করেও আর লেখা হয়ে ওঠেনি ।

আমি এখানে ভালো আছিরে । সেই আগের মতই বাড়ি-অফিস, অফিস-বাড়ি এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে সপ্তাহের পাঁচটা দিন । আর উইকেন্ড গুলো কাটাচ্ছি বই পড়ে আর লেখালেখি করে । রিশেন্ট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ,"ক্ষীরের পুতুল" পড়লাম । অনেকদিন থেকেই পড়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলামনারে শেষমেষ কোথায় পাওয়া গেল জানিস____ আমার পুরোনো বইপত্রের ভীড়ে । পড়ে বেশ ভালো লাগলো । বইটা বাবা আমায় দিয়েছিলেন আমার আঠেরো বছরের জন্মদিনে, মনে আছে তোর ? আর এই বইটাই ছিল আমার সেবছরের জন্মদিনের সেরা উপহার । তখন পড়া হয়নিরে আসলে তখন এসবের মূল্যই বুঝতামনা । পড়ার বইয়ের বাহিরে কোনোদিন কিছু পড়তে হয় এটাই জানা ছিলনা । সত্যিই যত দিন যায় ততই মানুষের পছন্দ,অপছন্দগুলো কিরকম বদলে যেতে থাকে বল ? একসময় যে আমার আর বইয়ের মধ্যে একসমুদ্র ব্যাবধান ছিল সেই বইই এখন আমার অবসর সময়ের নিত্যসঙ্গীরে । জানিস এখন আবার আগের মত লেখালেখিতে মন দিয়েছিরে । এই নিয়ে একবছরে

গল্প, উপন্যাস মিলিয়ে প্রায় সতেরো আঠেরো খানা লেখা হয়ে গেল । অফিসের অনেকেই এখন আমার লেখার গুনমুগ্ধ পাঠক বলতে পারিস । এরমধ্যে একটা পত্রিকার সাথেও আমার বেশ ভালো যোগাযোগ হয়ে গিয়েছেরে, তারা তাদের এবছরের নববর্ষ সংখ্যায় আমার লেখা উপন্যাস 'ব্যর্থপ্রেমিক'কে সেরা ২১ এর মধ্যে স্থান দিয়েছে । এটা আমার কাছে এক বিরাট পাওনা বলতে পারিস । একসময় কলেজ পত্রিকার জন্যতো কম কলম ধরিনি কিন্তু পুরো কলেজলাইফ জুড়ে একটাই আফশোষ থেকে গেল কোনোদিন একটা লেখাও প্রকাশ পেলনা । তখন মনে হত আমি হয়তো নিছকই রাজনীতির স্বীকার । এমনটা মনে হওয়ার পেছনে একটাই কারন ছিল, সেসময় বন্ধুমহলে আমার লেখার যথেষ্ট কদর ছিল । আজ এত বছর পর এসে মনে হয় হয়তো সেভাবে কোনোদিন লিখতেই পারতাম না, ওরা সব বাড়িয়েই বলত ।

জানিস অফিসে আমার লেখার গুনমুগ্ধ পাঠকদের মধ্যে একজন হলেন সোনালী দি (মিসেস সোনালী সাধুখা) । উনি নিজেও একজন সুলেখিকারে । একসময় খুব ভালো কবিতা লিখতেন । তবে এখন সময়ের অভাবে

আর সেভাবে লিখে উঠতে পারেন না । ওই মাঝে মধ্যে ফাঁকা সময়ে একটু আধটু লেখেন আরকি । এর মধ্যেই আমি ওনার লেখার বড় ফেন হয়ে গিয়েছিরে । উনি আমায় প্রায়ই বলেন কবিতা লেখার জন্য কিন্তু সমস্যাটা তো ওখানেই কবিতাটা আমার আবার ঠিকঠাক আসেনা । ভাবছি এবার চেষ্টা করে দেখব যদি কোনোদিন লিখতে পারি দুটো একটা তাহলে মন্দ হয়না । মিসেস সাধুখার মতে কবিতা লেখা নাকি খুবই সহজ ব্যাপার গল্প, উপন্যাসের থেকে, যে কেও চাইলেই লিখতে পারে । আবার আমি মনে করি কবিতা থেকে গল্প, উপন্যাস লেখাটা তুলনামুলক অনেক সহজ । ছন্দের মিল ঘটিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে কবিতা লেখা খুব সহজ কথা নয় । যাই হোক এটা একান্তই মনের ব্যাপাররে, কে ঠিক,কে ভুল সেই দ্বন্দ্বে না যাওয়াই ভালো ।

তিন মাস হয়ে গেলরে সোমদৃপ্তাদের দমদমের বাড়ি ছেড়ে বেহালার এই ভাড়া বাড়িতে আমার চলে আসাটা । ওই জোগাড় করে দিল, ওর কোন এক বন্ধুর বাড়ি এটা । প্রথম প্রথম জানিস বেশ খারাপ লেগেছিল ওদের বাড়িটা ছেড়ে আসতে । অনেকদিন ছিলামতো

তার ওপর প্রিয়বান্ধবীর বলে কথা । তবে জানিস ঘরটা আমি বেশ ভালোই পেয়েছি, ঠিক আমার মনের মত । দক্ষিণে খোলা জানালা, আর তাই দিয়ে ফাগুনের হাওয়া এসে মাঝে মধ্যেই আমার মনকে দোলা দিয়ে যায়রে । আর জানিস এই ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট ব্যালকোণিও আছে যেখান থেকে দাঁড়িয়ে খুব ভালো কোলকাতার রাস্তাঘাট দেখা যায় । এই কদিনে এই বাড়িতে এসে একজন মনের মত বন্ধুও জুটিয়ে নিয়েছিরে । সুচরিতা দি (সুচরিতা স্যান্নাল), ভদ্রমহিলা ব্যাঙ্কে সার্ভিস করেন । বেশ ভালো, খোলামেলা মনের মানুষ, চারতলায় আমার পাশের রুমেই থাকেন । ওরও এখানে একাকিত্বের জীবনরে । পরিবার পরিজন ছেড়ে এখানে একা থাকতে হয়েছে শুধুমাত্র চাকরির জন্য । বাড়ি সেভাবে যেতে পারেননা বললেই চলে অবশ্য কোনো কোনো উইকেণ্ডে সুযোগ পেলে একদিনের জন্য যান । এর মধ্যে দুএকবার আমাকেও নিয়ে গিয়েছেন ওর ব্যাণ্ডেলের বাড়িতে ।

জানিস,এই কয়েকমাসে কোলকাতা আমার খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছেরে, যদিও সেই কোন ছেলেবেলা থেকেই একটা আলাদা ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল এই শহরটার

প্রতি যখন আমরা মাসিমণিদের ভবানীপুরের বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসতাম । কিন্তু তা হলেও এখন কর্মসুত্রে এখানে থাকতে থাকতে সেই ভালোলাগাটা আরও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছেরে । তোর মনে আছে প্রথমবার আমাদের কোলকাতা আসাটা । তুই তখন অনেকটাই ছোটো ওই ছ-সাতবছর বয়স হবে তোর । আর আমি দশের দোরগোড়ায় । সত্যি দিনগুলো কি ভালো ছিল বল ? কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই কোলকাতা শহরকে নিয়ে । তারপর একসময় মাসিমণিরাও ওদের ভবানীপুরের বাড়ি বিক্রি করে পার্মানেন্টলি দিল্লীতে সিফ্ট করল, আর সেই থেকে আমাদেরও কোলকাতার সঙ্গে যোগাযোগটা কিরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ।

কিন্তু সবকিছুর পরেও জামশেদপুরকে এখনও খুব মিস করিরে । শহরটাকে, শহরের রাস্তাঘাট, রাতের শহরের ফাঁকা রাস্তায় মাইলের পর মাইল হেঁটেবেড়ানো এই সব কিছুকে, আর তার সাথে আমাদের বিরসা নগরের বাড়িটাকে ।

বাড়িটা এখন আগের মত আছেরে নাকি এই একবছরে অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে বাড়ির ছবিটা? আগের সেই পিঙ্ক কালারটাই এখনও আছে যেটা আমার ভীষন পছন্দের ছিল, নাকি তার ওপর অন্য কোনো রঙ করা হয়েছে ? এই নিয়ে একসময় দাদাভাইয়ের সাথে আমার ঝামেলার শেষ ছিলনা বল, মনে পড়ে তোর? সে ওর কি জিদ ------ ওর পছন্দের সবুজ রঙটাই করতে হবে । শেষমেষ অবশ্য আমারই জয় হয়েছিল । সে ওর কি রাগ আমার ওপর, সাতদিন আমার সাথে একটা কথাও বলেনি । সেই দিনগুলোতে আমরা কত ঝামেলা করেছি, আজ সেগুলো মনে পড়লে ভীষন হাসি পায় । আর আমাদের এই ঝামেলায় বাবা, মা ছিলেন নীরব দর্শক । আসলে তাদের কাওকেই কিছু বলার সাহস ছিলনা, কারন তারা ভালোমতই জানতেন তাদের সব ছেলেমেয়েরা কিরকম । অবশ্য সব ছেলেমেয়ে বললে ভুল হবে তুই আমাদের দলে কোনোদিনই ছিলিনা । তুই বরাবরই খুব ভালো ছিলিরে, আর এখনও আছিস । বাবা, মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলতে তুই ই । আচ্ছা আমার লাগিয়ে আসা সেই কৃষ্ণচুড়া গাছটাও নিশ্চয়ই এই একবছরে অনেকটাই বড় হয়ে গেছে বল ? আর আমার পছন্দ

করে আসা টাইলস্ গুলো ঠাকুরঘরে কিরকম মানিয়েছেরে? খুব দেখতে ইচ্ছে করছে জানিস । দাদাভাইকে বলিসতো কয়েকটা ফটো তুলে একদিন পাঠিয়ে দিতে আমার এই বেহালার বাড়ির ঠিকানায় ।

53 1, Roy Bahadur road, Behala 700034. আমার নতূন ঠিকানারে । এবার থেকে এই ঠিকানাতেই চিঠি দিস । আবার ইচ্ছে হলে আমার কসবার অফিসের এডরেসেও লিখতে পারিস । ঠিকানাটাতো তোর কাছে আছেই । দিনের বেশিরভাগ সময়টাতো ওখানেই কেটে যায় । আস্তে আস্তে ওটাও এখন আমার একটা ঘরে পরিনত হয়েছেরে । সেকেণ্ডহোম বলতে পারিস ।

এখন জীবনটা আর দশটা পাঁচটার ছকে বাঁধা নেইরে । যেমন নতূন কোম্পানি তেমন কাজের প্রেসারও অনেক । জানিস অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাতটা - সাড়েসাতটা হয়ে যায়রে, কোনো কোনো দিনতো কাজের প্রেসার থাকলে আরো দেরি হয়, আর মাসের শেষ এলে তো বলারই নয় । শেষদিন ওই ক্লোজিং করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ঘড়ির কাঁটা যে

কখন দুটো অতিক্রম করে বোঝাই যায়না । একাউন্টসে আছিতো সেই কারনেই, অবশ্য সেল্স,সার্ভিসদেরও প্রচণ্ড চাপ থাকে ওই দিনটাতে

বিশেষ করে সেল্সদের । তবে পার্টস ডিপার্টমেন্টের সারাবছরই সেরকম প্রেসার থাকেনা বললেই চলে । একবার করে মনে হয় পার্টসে জয়েন করি । মজার ছলে কখনও কখনও আমাদের জোনাল পার্টস ম্যানেজার মিস্টার দেবাংশু মিত্র কে বলিও _____নিয়ে নিননা আমাকে আপনাদের পার্টস ডিপার্টমেন্টে ।

এখন এই কোম্পানিতে অনেক কিছু নতূন করে শিখতে হচ্ছেরে । যেমন আগের কোম্পানির ইয়ার-এন্ডিং থেকে বেরিয়ে কখন যে আস্তে আস্তে মন্থ-এন্ড এ অভ্যস্ত হয়ে গেছি বুঝতেই পারিনি । আরও অনেক কিছুরে । জানিস কোম্পানিটা এমনিতে ভালোই । সেলারি প্যাকেজও ঠিকঠাক, অনেক সুযোগ সুবিধেও আছে, তবে বেশ অর্থোডক্স টাইপের ।

গত সপ্তাহে চেন্নাই থেকে ফিরলামরে । অফিসের কাজে পাঁচ দিনের টুরে হেডঅফিস যেতে হয়েছিল ।

বিরাট অফিস, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতনা । অবশ্য বিরাট তো হবেই বল Ashok Leyland এর অফিস বলে কথা । তাহলেও আমাদের কোলকাতার জোনাল অফিসও কিছু কম নয়, বেশ ঝকঝকে,সাজানো গোছানো, অনেকটাই বড় । তবে একটাই অসুবিধে আটতলায়, লিফ্ট যদি একবার জবাব দিয়ে দেয় তাহলে যে কি অবস্থা হয় সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা ।

জানিস, এবার অফিসের কাজে চেন্নাই গিয়ে যেমন আমাদের হেডঅফিস দেখে আসা হল তেমনি আর একটা এক্সট্রা পাওনাও হলরে, Marina beatch ঘুরে এলাম । অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল যাওয়ার, এতদিনে সেটা পুরণ হল । তবে এর ফুল ক্রেডিটটা কিন্তু একজনেরই আমার নতুন বস মিস্টার অতনু ঘোষ দস্তিদারের । আমাদের জেনারেশেনেরই মানুষ, খুবই মাইডিয়ার মেন । এতবড় কোম্পানির একজন জেড.এম দেখে কেও বলবেই না । চারমাস হল উনি আমাদের অফিসে এসেছেন, আর এই কদিনে আমার সাথে ওনার বন্ডিংটাও বেশ ভালোরকম গড়ে উঠেছে । আমার কাজের প্রতিও উনি বেশ সেটিসফায়েড ।

জানিস জামশেদপুরের সাথেও ওনার একটা বিশেষ কানেকশন আছে, আদিত্যপুরে ওনার ছোটো শ্যালিকা থাকেন । সেই সুত্রে অনেকবারই গিয়েছেন জামশেদপুর । এবার গেলে আমাদের বাড়িও যাবেন বলেছেন ।

জানিস, Marina beach দেখার এক্সপিরিয়ন্সটা কিন্তু দারুন । বিশেষ করে রাতের ভিউটা খুব সুন্দর । আমরা যেদিন কলকাতা ফিরব তার আগের দিন দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত সি বিচেই ছিলাম । এখানে সানসেট দেখার ফিলিংসটাই একেবারে অন্যরকম । জানিস বেশ গরম ছিল সেদিন ওখানে, কিন্তু সি বিচে ছিলাম বলে একটুও বুঝতেই পারিনি । গরমের হাত থেকে ওখানকার স্থানীয় মানুষদের রেহাই পাওয়ার এই সি বিচ এক প্রধান জায়গা । এখানে সমুদ্র প্রচণ্ড রুক্ষ প্রকৃতির আর তরঙ্গ ততটাই শক্তিশালী ।

যাই হোক তোর তো আর পরীক্ষার বেশি দেরি নেই, তা প্রিপারেশন কিরকম ? বি.এ ফাইনেল ইয়ার ইংলিশ অনার্স বলে কথা, ঠিকমত পড়ছিসতো নাকি ওই অপেক্ষা করে বসে আছিস লাস্টমিনিট সাজেশেনের আশায় ? ওটা হলে কিন্তু একদমই চলবে না,কারন

তুই জানিসই যে বি.এ তে ভালো মার্ক্স না থাকলে কোলকাতার কলেজে মাস্টার্সে চান্স পাওয়াটা কতটা ডিফিকাল্ট । তাই তোর স্বপ্ন বাবা,মার ইচ্ছে, কলকাতার কলেজে ভর্তি হতে চাইলে পড়াশোনাটা একটু মন দিয়ে করিস ।

দাদাভাই এর কাজকর্ম কি রকম চলছেরে ? আশাকরি অফিসের ঝামেলাটা এতদিনে মিটে গেছে । মায়ের হাঁটুর ব্যাথাটা এতদিনে পুরোপুরি সেরে গেছে শুনে খুব ভালো লাগলরে । আর বাবাকে বলিস তার পছন্দের "ভ্রান্তিবিলাস"এখন ____আউট অফ স্টক । বইটা কলেজস্ট্রীটের কোনো দোকানে পাইনি । পাওয়া মাত্রই তোদের পাঠিয়ে দেবরে । আশা করছি দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাব ।

আজ একবছর হয়ে গেলরে তোদের দেখিনি । খুব দেখতে ইচ্ছে করছে জানিস । কিন্তু যাবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই । সামনেই আমাদের Ashok Leyland এর সেভেন্টি ইয়ার্স সেলিব্রেশেন, তাতে মাস্টলি প্রেজেন্ট থাকতেই হবে, বসের কড়া নির্দেশ ।

কারন ওই দিন এম.ডি স্বয়ং আসছেন চেন্নাই হয়ে আমাদের কোলকাতার অফিসে ।

তবে আশাকরি এই প্রোগ্রামটার পর খানিকটা ফ্রি হব তখন এক সপ্তাহের জন্য যাব তোদের কাছে । এই একবছরে অনেকগুলো ছুটিই পাওনা আছে আমার । তবে ওই সব কিছু চুকতে চুকতে মনে হচ্ছে মে র লাস্ট উইক হয়ে যাবে । মানে এখনও প্রায় একমাস দেরিরে । এই একমাস যে কিকরে কাটবে বুঝতে পারছিনা । মনে হচ্ছে কালই চলে যেতে পারতাম তোদের কাছে, তাহলে কি ভালো হত বল ? এখন থেকে রোজ ক্ল্যালেন্ডারের একটা করে তারিখ কেটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেইরে ।

জামশেদপুরে এবছর গরম কিরকমরে? কলকাতায়তো বেশ কিছুদিন হল প্রচুর গরম পড়েছে । শুনছি টানা সাত - আট বছরে কলকাতা শহরে নাকি এরকম গরম দেখা যায়নি । আর বৃষ্টিরও নাম, গন্ধ নেই । তবে গতকাল রাত থেকে কলকাতার আকাশ বেশ মেঘলা, মনে হয় এবার বৃষ্টি হবে, দেখা যাক ।

জানিস সেদিন ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম বারান্দায় একটা বুলবুল পাখি বাঁসা বেঁধেছে । জানিস, হঠাৎ করে তোর সেই 'হলুদপাখি' র কথা মনে পড়ে গেলরে । মনে আছে তোর, পাখিটার কথা ? একদিন আমাদের বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে সে তার ছোট্ট বাঁসা বেঁধেছিল । তুই যাকে ভালোবেসে 'হলুদপাখি' বলে ডাকতি । তারপর একদিন সে কোথায় হারিয়ে গেল বল, কোন এক অজানা ঠিকানায় । তোর শৈশবের কিছু সকাল জুড়ে তারও ডাকাডাকি কিছু কম ছিলনা রে আমাদের চিলেকোঠার ঘরের জানালায় বসে । বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছিল বল, ওর ওপর, কিন্তু ও আর ফিরলনা । এও একদিন হয়তো হারিয়ে যাবে ওরই মত, আকাশের বুকে কোনো এক অজানা ঠিকানায় ।

আজ এ পর্যন্তই রে, আকাশের অবস্থা ভালো নয়, যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে । যাই ছাতে কিছু কাপড় মেলা আছে নিয়ে আসি যেয়ে । তোরা সব ভালো থাকিস । বাবা, মাকে আমার প্রণাম জানাস, দাদাভাই ও তুই আমার ভালোবাসা নিস । আমার

চিঠির প্রত্যুত্তর চিঠি লিখতে ভুলিসনা যেন । তোর চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি তোর আদরের দিভাই

লিলি

দর্পণে প্রতিবিম্ব

পারমিতা রাহা হালদার (বিজয়া)

চোদ্দ'বছরের কারাবাসের শেষদিন আজ। বন্দিদশার বাইরের জগতে শৌভিকের নিজের বলতে কেউই নেই,নিজের হাতেই বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিয়েছে । হত্যার জন্য কোনোরকম আক্ষেপও নেই শৌভিকের।

জেলারের ঘরে ডাক পড়ল শৌভিকের। শৌভিক দেখে সামনে দাঁড়িয়ে তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি চোদ্দ বছরের ছোট শৌভিক,পাশে বন্ধু নীলাদ্রি। অপরাধ বোধে মাথাটা ঘুরিয়ে চোখ কালো হয়ে এলো শৌভিকের।

চোদ্দবছর বছর আগে মহুয়া সদ্যোজাত কিংশুককে কোলে নিয়ে দুর্যোগের এক সন্ধ্যায় শৌভিকের সামনে এসে দাঁড়ায়,পাশে নীলাদ্রি। ব্যালকনিতে তখন ইজিচেয়ারে বসে পেপার পড়ছে শৌভিক। জোরে মিউজিক বাজছে। মহুয়া 'হোম-থিয়েটার' বন্ধ করে বলে, "ছুটি হবে জানার পরেও নার্সিংহোম থেকে আনতে গেলেনা কেন?"

পেপারটা ছুঁড়ে ফেলে শৌভিক বলে, "নীলাদ্রির প্রয়োজন আমার থেকেও বেশী ছিল,তাই।"

"কি বলছো, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?"
মহুয়াকে উত্তেজিত দেখে নীলাদ্রি মহুয়াকে ফ্রেস হতে বলে চ'লে গেল। মহুয়া ডিনারের পর্ব মিটিয়ে শুয়ে পড়ল।

দুবছরের বৈবাহিক জীবন। বসন্ত উৎসবের সময় শৌভিক নীলাদ্রীর সাথে আলাপ করিয়ে মহুয়াকে বলেছিল আমার একাকিত্ব জীবনের বাল্যবন্ধু নীলাদ্রি,বন্ধুত্বের টানে অবশেষে আমরা একই শহরে আশ্রিত। নীলাদ্রি,মহুয়ার বন্ধুত্ব গাঢ় হলো এরপর। এই বন্ধুত্বই আস্তে আস্তে সন্দেহে প্রকাশিত হয় শৌভিকের মনে।

রাত প্রায় দুটো, অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। শৌভিক ছাদে ডাকলো ঘুমন্ত মহুয়াকে। মহুয়া ছাদে যেতেই অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে ধরলো শৌভিক। ঘন কালো চুল সরিয়ে লম্বা দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিল শৌভিক,

মহুয়া চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বৃষ্টির জলের সাথে ভেসে যাচ্ছে তাজারক্ত। ধারালো অস্ত্র মহুয়ার পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে শৌভিক, অন্তরঙ্গতার অছিলায়।

নীলাদ্রির ফোনটা বাজলো। অপরপ্রান্ত থেকে শৌভিক জানালো, "মহুয়াকে বিশ্বাসঘাতকতা করার শাস্তি দিলাম, এসে দেখে যাস।" পুলিশকেও খবর দিয়েছি। নীলাদ্রি ছুটে আসে, দুই বন্ধু বাকরুদ্ধ!

আজ জেলারের ঘরে জ্ঞান হারায় শৌভিক, চোখ খুলে দেখে নিজের বিছানায় শুয়ে । বিধাতার বিচারে আজ শৌভিক নিজের অন্যায়ে লজ্জিত। হুবহু তারই প্রতিচ্ছবি কিংশুক যে তারই সন্তান, আর সন্দেহ নেই। নীলাদ্রি'র প্রতি সন্দেহ কাঁটায় নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অবিচারের বিবেক দংশন খোঁচা মারছে বড্ড বেশী। চিঠিতে নিজের করা ভুল স্বীকার করে বৃষ্টি ভেজা এই রাতে নিরুদ্দেশে পাড়ি দেয় শৌভিক প্রায়শ্চিত্তের অনুসন্ধানে!!

কৃপালি সংহৃতি

সঞ্চারী ভট্টাচার্য

পর্ব – ১

সেদিন রাতটা মমাটপুরের ইতিহাসে এমন এক রাত ছিল যা অন্ধকারের চেয়েও গভীর, নিকষ কালো । দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সকলে একটি গুহার দিকে । গুহার ভিতর থেকে ভেসে আসছিল এক ভয়ঙ্কর আর্তনাদ । গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলেন,

“শেষ করে ফেলো ঐ পিশাচটাকে । বাচ্চাদের বলি দিয়ে ও সর্বশক্তিমান হতে চাইছে । গ্রামের সব শিশুর জীবন নিয়েছে ওইই । ওকে কোনভাবেই ছেড়োনা । কিছুতেই না । “

গ্রামবাসীরা মশাল হাতে এগোতে শুরু করলেন ।

“গুহার দরজা বন্ধ করে দাও । তাড়াতাড়ি আর দেরী করোনা ।"

“কিন্তু ভিতরে যে এখনও বাচ্চাদের কলরব শুনতে পাচ্ছি পুরোহিত মশাই । ওদের যে উদ্ধার করা হলনা।"

“কিছু করার নেই । আমাদের হাতে আর সময় নেই। এখনই যদি গুহার মুখ বন্ধ না করা হয় তবে ঐ পিশাচ বাইরে বেরিয়ে আসবে । একবার যদি সে মুক্ত হয়ে যায়, আর তাঁকে বাঁধা সম্ভব হবেনা । আমার সে ক্ষমতা নেই । সে মহাশক্তিশালী হয়ে উঠবে । নাও, নাও আর দেরী করোনা । যা ক্ষতি হওয়ার তো হয়েই গেছে ।"

বাচ্চাগুলির আত্মার উদ্দেশ্যে সকলে প্রার্থনা করে ধীরে ধীরে গুহার মুখটি বন্ধ করে দিতে লাগলেন । ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর এক চিৎকারের শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল । সেই আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল । সেটি কোন সাধারণ কণ্ঠস্বর ছিলনা । এক মৃতপ্রায় তান্ত্রিকের শেষ ইচ্ছে ছিল । তাঁর সেই

কথাগুলির মধ্যে বেদনার পাশাপাশি মিশে ছিল এক তীব্র উন্মত্ততা , যা যে কোন শক্তিকে হার মানিয়ে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর রাস্তা ঠিকই খুঁজে বার করতে সক্ষম এমন , দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সেই কণ্ঠের শব্দ ধ্বনিত হতে লাগল চতুর্দিকে ।

"ফিরব আমি । এইই শুনছিস সবাই, জেনে রাখ ফিরব আমি । সবাইকে শেষ করে ফেলব । যেভাবে জ্যান্ত সমাধিস্ত করলি তোরা আমায় , ঐ একইভাবে তোদেরও সমাধিস্ত করব আমি । এই জঙ্গলের প্রতিটি আনাচে কানাচে মিশে থাকব আমি । পারবিনা তোরা আমাকে শেষ করতে । আমি আমার উদ্দেশ্য সফল করেই ছাড়ব । আমাকে মুক্ত হতেই হবে একদিন । তোরা যতই বেঁধে ফেলার চেষ্টা করিস না কেন ! সব বাঁধা পেরিয়ে আমি মুক্ত হবই । এই কৃপালি মুক্ত হবেইইইই।"

কণ্ঠস্বরটা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল । বাইরে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় দিক বিদিক নিজের ছন্দে এলোমেলো হয়ে উঠল । শনশন শব্দের মধ্যেও আরেকটি আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে মানুষের অন্তর স্পর্শ

করতে লাগল । হেঁইয়ো হেঁইয়ো শব্দে শক্ত পাথরের চাইটাকে ধীরে ধীরে গ্রামবাসীরা এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন সেই গুহার দিকে । তান্ত্রিক তখনও বাঁচার শেষ চেষ্টা করেই চলেছেন । পৈশাচিক মন্ত্রপাঠের শব্দটা তখনও স্পষ্ট ।

“নমঃ, ত্রাইয়িকি , পিশাচনামা সনামি । ওম পিশাচ মন্ত্রনামায় নমঃ রুদ্র ওম ।"

হাহাহাহা হাসির শব্দটা যেন আরও প্রখর থেকে প্রখরতর হয়ে উঠতে লাগল । পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল দরজার দিকে । কেউ দৌড়ে আসতে চাইছিল সেদিকেই । তাঁকে যে মুক্ত হতে হবেই । বিভীষিকার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ যে সেও । সে আসছে, গতি আরও তরান্বিত হল ।

কিন্তু শেষ চেষ্টা সফল হলনা । প্রায় পনেরো জন মিলে পাথরের সেই চাইটিকে গুহার প্রধান প্রবেশদ্বার বরাবর নিক্ষেপ করলেন । একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সকলেই একে অপরের মুখের দিকে তাকালেন । অন্যদিকে মেঘের গর্জন বাঁধ মানতেই চাইছিল না । তাঁর সাথে

ধ্বনিত হয়ে চলেছিল সজোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ । কেউ যেন তমসার কালো ঘেরাটোপের অন্দর থেকে বারেবারে নিজের ফিরে আসার মুক্ত প্রস্তাব রাখতে চাইছিল সকলের সামনে । আসতে আসতে সেই শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠল । না , আর নেই । কিছুই নেই । সব শেষ । তান্ত্রিকের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেলো মমাটপুরের গ্রাম ।

পর্ব – দুই

পুরোহিত মশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "দীর্ঘ চার বছর ধরে আমাদের গ্রামেরই একটি ছেলে তন্ত্র সাধনা করে চলেছিল । একের পর এক নিরীহ শিশুর বলি দিয়ে তাঁকে উল্টো করে গুহার বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছিল । এগুলো তোমারা জানা সত্তেও কোনদিন আমাকে জানাওনি । এত বড় বিপদের হাত থেকে এই গ্রামকে রক্ষা করার কাজ ছিল একপ্রকার দুঃসাধ্য । তবুও আমি চেষ্টা করেছি । আগামী বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এই স্থান সুরক্ষিতই থাকবে । এই মন্ত্রপূত ত্রিশুল এই স্থানটিকে সুরক্ষিত রাখবে । আমি এটিকে ফটকের ঠিক সামনের অংশে পুঁতে দিয়েছি । "

গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকেই একজন জিজ্ঞাসা করলেন," আচ্ছা, যদি কেউ কোনদিন এই ত্রিশূলটিকে এখান থেকে উপড়ে ফেলে ? তখন কি হবে?"

প্রশ্নটি শেষ হওয়ার আগেই আবারও একবার মেঘ গর্জন করে উঠল ।

পুরোহিত মশাই কাঁপতে কাঁপতে বললেন , "মৃত্যুর পরে কোন পিশাচ তান্ত্রিক কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন সে ধারণা তোমাদের কারুর নেই । তাই হয়ত এত সহজে এই কথাটি বলে দিতে পারলে । সে মারা গেছে । আর একজন মৃত তান্ত্রিক নিজেকে শেষ করে ফেললেও নিজের ক্ষমতাকে কোনদিন নিজের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেন না । এই ত্রিশূল যদি সরানো হয় তবে তাঁর আত্মা এই সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডটি সরিয়ে অচিরেই মুক্ত হয়ে যাবে । তারপর শুরু হবে সেই মৃত্যুযজ্ঞ , যা হয়ত তোমরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারবেনা । সে আগের থেকে আরও নৃশংস হয়ে উঠবে । প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলবে আরও অনেক বেশি সন্তর্পণে । সে গ্রাস করতে থাকবে একাই ।

সবকিছুর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মাবে । আর জন্ম নেবে এমন এক ভয়ানক মূর্তির যাকে দেখে মানুষের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে । বাঁচার সবরকমের চেষ্টাই বিফল করে দেবে সে । হ্যাঁ , সে হয়ে উঠবে এতটাই শক্তিশালী । কৃপালি সব শেষ করে দেবে । তাই এই ত্রিশূলটি এখানে থাকাটা ততোটাই প্রয়োজনীয় যতটা একটি মানব শরীরে প্রাণ। ত্রিশূল সরলেই প্রাণের মায়াও কেটে যাবে , কাটিয়ে ফেলতেই হবে । শেষটা তো সেইই করবে !"

বৃষ্টির প্রকোপ ক্রমাগতভাবে কমে এলো । বজ্রের ধ্বনিও । মানুষ তখন বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঐ তান্ত্রিকের দিকে । সকলে হাতজোড় করে তান্ত্রিকের আত্মার মুক্তির প্রার্থনা করতে লাগলেন । তাঁরা জানতেন তাঁরা কত বড় ঝুঁকি নিয়েছেন । আগামী প্রজন্মও যে এই নিয়মগুলি মানতে বাধ্য সেটি গুহার বাইরে একটি ফলকে লিখে দেওয়া হল । পুরোহিত বললেন,

"সময়ের সাথে সাথে হয়ত এই সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে যাবে । আমরা যে শাপকে এই গুহার অন্দরে

আটকে রেখেছি তাও হয়ত আগামী প্রজন্মের কাছে ভুয়ো, অযৌক্তিক বলে মনে হবে । কিন্তু তবুও আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতেই হবে । এই ফলকটি দেখেই সকলে বুঝতে পারবেন আর হয়ত পিছিয়েও যাবেন । আমার বিশ্বাস কোন মূর্খই হয়ত এটি পড়া সত্ত্বেও বিপদ ডেকে আনবেন । কারণ এই ত্রিশূলটি সরানোর অর্থই হল নিজের মৃত্যুকে নিজের হাতে আহ্বান জানানো । "

আকাশ পরিষ্কার হল । চাঁদ আবার নিজের স্থান গ্রহণ করল । কিন্তু কালিমা ঘেরা সেই অতীতের হাত থেকে বাঁচতে পারলো না মমাটপুর । সময়ের সাথে সাথে সব বদলে গেলো । এক প্রজন্মের পরে এলো আরেক প্রজন্ম । এই ঘটনার রেশ চিরতরে মুছে গেলো ঐ অঞ্চলের মানুষের মন থেকে । ঘন জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্থানটি পরিবর্তিত হয়ে অন্য দিকে চলে যাওয়ায় , এই জঙ্গলটি একা এই অভিশাপকে বহন করতে লাগল । সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে যেতে লাগল । আর ঐ প্রজন্মের কেউই জীবিত না থাকায় সেই ইতিহাসকে মনে রাখবার লিপ্সাও চলে গেলো । মানুষের কাছে তখন ঐ ইতিহাসটি একটি

ভয়ঙ্কর অভিশাপের দলিল হয়ে থেকে গেছিল । প্রত্যেকেই জঙ্গলটিকে একটু এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করতেন । কিন্তু কথায় আছে , কোন কোন কালো শক্তির ঘের এতটা প্রখর হয় , যা থেকে মুক্তির উপায় স্বয়ং সেই শক্তিরও জানা থাকেনা।

এই ঘটনার পর কেটে গেছিল প্রায় পঞ্চাশটা বছর ।

ক্রমশঃ

পর্ব – তিন

তখন ১৯৭৫ সাল । একটি স্কুলবাস এগিয়ে চলেছে নিজের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে । শীতকাল । পিকনিকের জন্য এক মনোরম পরিবেশ । বাসটিতে রয়েছেন একজন মহিলা দিদিমনি ও আরেকটি স্যার । আর তাঁর পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন বয়েসের কিছু স্কুল পড়ুয়ারা । খোশ মেজাজে গান গাইতে গাইতে তাঁরা উপভোগ করছিল নিজেদের ট্রিপটিকে । এমনিতেই স্কুল থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিলনা । কিন্তু এই মহিলা দিদিমণিটি জয়েন করার পর থেকেই স্কুলের দমবন্ধ করা পরিবেশটা অচিরেই প্রাণ ফিরে পেয়েছিল

। বাসটা ধীর গতিতে হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল । এমন সময় হঠাৎ ড্রাইভারটি সজোরে ব্রেক কষে বললেন,

“আসলে একটা ব্যাপার হয়েছে নীলিমা ম্যাডাম। এরপরে যাওয়াটা উচিৎ হবেনা । আমি আপনার কথা শুনে এদিকে চলে এলাম ঠিকই কিন্তু এখানে আসাটা একেবারেই উচিৎ ছিলনা। “

বাচ্চাগুলি নিজেদের গান থামিয়ে ড্রাইভারের দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল । তারপরেই তাঁদের চোখ পড়ল নীলিমার দিকে । উৎকণ্ঠায় তিনিও বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেছিলেন । সিট ছেড়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ,

“কেন ? এদিক দিয়ে যাওয়া যাবেনা কেন? এমনিতেই সন্ধ্যে হতে যায় । তারপর আবার জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ি রাস্তা । এরপর আসতে আসতে রাত নামবে । তখন তো এই পথ দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়া আরও অনেকখানি ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে । তাহলে?

আর এছাড়া এতগুলো বাচ্চার দায়িত্ব রয়েছে আমার উপরে । কি প্রকাশ বাবু? কিছু ভুল বললাম ?”

প্রকাশ সমাদ্দার । তিনি জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক । ঐ স্কুলে প্রায় দশ বছর চাকরি করছেন । তিনিও ওদের সাথেই একটু আউটিং এ বেরিয়ে পড়েছিলেন । কিন্তু ঐ রাস্তায় কি বিপদ ছিল সে বিষয়ে ওনার তেমন কোন ধারণাই ছিলনা ।

বাসের পিছনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন , “কোই রাস্তাটা তো বেশ নিস্তব্ধ বলেই মনে হচ্ছে । এখানে তো তেমন কাউকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলেও বা ক্ষতি কি ? হাইওয়ে তো এরকমই হয় । মাঝেমধ্যে দু একটা গাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া এটা তো সর্টকার্ট । এখান দিয়ে গেলে তো তাড়াতাড়ি মেন রোডে উঠতেও পারব । তাছাড়া অন্য রাস্তা দিয়ে আসলে জ্যামেও পড়তে হত । কিন্তু এই লোকটা গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিল কেন?”

প্রকাশ উঠে এলেন । সাথে নীলিমাও ।

ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলেন ।তারপর তাঁর দিকে কিছুটা ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"দেখুন কোন সমস্যা থাকলে বলুন । পিছনে বাচ্চারা রয়েছে । এমনিও ওরা এ বিষয়ে কিছুই জানেনা । যদিও সেটা অনেক পুরনো ঘটনা কিন্তু আপনি সেটা নিয়েই ভয় পাচ্ছেন কিনা আমরা জানিনা । আপনি নিশ্চিন্তে গাড়ি চালিয়ে এগোন । আমরা তো রয়েছিই । বাচ্চাগুলোর কানে একথা যেন না যায় । একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই কিন্তু আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে। "

ড্রাইভারটি ভীত হয়ে বললেন , "আপনারাও তারমানে বিষয়টা জানেন , অথচ আমাকে একবারের জন্যেও জানাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি । এই পরিস্থিতিতে আমাকে একা এই রাস্তা ধরে যেতে হবে । কিছু হয়ে গেলে আমি তো মারা যাবোই সাথে আপনারাও কিন্তু কেউ জীবিত ফিরতে পারবেন না জেনে রাখুন । এখানকার ইতিহাস সম্পর্কে আমি অনেক কথাই শুনেছি । সেগুলো আপনাদের কাছে

গল্পকথা বলে মনে হতেই পারে কিন্তু আমার কাছে নয়। আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছি ম্যাডাম । বড়জোর কি হবে? আরও কিছুটা সময় বেশী লাগতে পারে । কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর চোটে যদি প্রাণটাই চলে যায় ! তখন কে দেখবে বলতে পারেন ?”

নীলিমা বললেন , “কিছু হবে না । বললাম তো । সেসব অনেক আগের ঘটনা । এছাড়া ঐ জঙ্গলের মধ্যে কোথায় সেসবের অস্তিত্ব আছে তাও কারুর জানা নেই । পঞ্চাশ বছর আগে কোথায় কি ঘটেছিল , সেসব কথা মাটি চাপা পড়ে গেছে । এখন আর কেউ সেসব নিয়ে ভাবেননা । এদিকে গ্রামটাও আর আগের জায়গায় নেই । অনেকটাই পিছিয়ে গেছে শুনলাম । এখন গ্রামবাসীরা কেউ এদিকটায় থাকেনও না । যদি এখানে কেউ থাকতেন তাহলে নয় কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যেত । কিন্তু এখন তো এখানে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না ? আমাদের তো পৌঁছতে হবে । আর শুধু পৌঁছলেই চলবে না , আমাদের সুরক্ষিতভাবেই পৌঁছতে হবে । “

প্রকাশ বাবু বললেন ,"নিন , আর দেরী করবেন না । গাড়িটা স্টার্ট দিন । অনেকখানি পথ । মাথায় রাখুন যাইই হয়ে যাক , আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে । কোন অচেনা মানুষ হাত দেখালেও গাড়িটা দয়া করে থামাবেন না । ভূতের চেয়েও ভয়ঙ্কর আজকের যুগের মানুষেরা । জায়গাটা ফাঁকা পেয়ে অনেকেই চুরি ছিনতাইয়ের মানসিকতা সাজিয়ে রাখতেই পারেন । আজকাল তো চলন্ত বাস থামিয়ে লুঠপাটের খবর আয়াদিন খবর কাগজ খুললেই চোখে পড়ে । কাজেই যেটা বললাম সেটা মাথায় রাখবেন । বুঝলেন ?"

ড্রাইভারটিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানো গেলো । তিনি গাড়ি স্টার্ট দিলেন । বাচ্চাগুলি আবার হইহই করে উঠল ।

নীলিমা নিজের সিটে এসে বসার আগে হাত দেখিয়ে সকলকে চুপ করতে বললেন ।প্রকাশ বাবুও নিজের স্থানে এসে জানলার ধার ঘেঁষে বসে পড়লেন । বিপদ যেন স্পর্শ না করতে পারে, তেমনটাই মনে মনে বলতে লাগলেন । বাস এগিয়ে যেতে লাগল । নিস্তব্ধ

রাস্তায় কোন জনপ্রাণী ছিলনা । মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাক ভেসে আসছিল । ডিজেলের গন্ধটা নাকের কাছে এসে আবার বাতাসে মিশে যাচ্ছিল ।গতিবেগ থামালে চলবে না । তাই সজোরে এগোতে থাকল বাসটি ।

পর্ব – চার

কিছুদূর যাবার পরেই হঠাৎ আকাশটা কালো হয়ে এলো । মেঘের গর্জনের শব্দ কানে আসতেই সকলে ঘাবড়ে গেলেন । নীলিমা বলে উঠলেন ,

"যাইই হয়ে যাক দাদা , বাস থামাবেন না । এটাই এখন একমাত্র ভরসা । আমাদের যে করেই হোক বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছতেই হবে । "

ড্রাইভার গাড়িটি এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন । কিছুটা দূরে যাওয়ার পরেই একটা অদ্ভুত ছায়ামূর্তি বাসের সামনের রাস্তাটি অবরোধ করে দাঁড়াল । ড্রাইভারটি গাড়িটিকে রক্ষা করতে গিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাতেই পাশের একটি গাছের ডাল এসে ঢুকে গেলো তাঁর বুকে । গলগল করে রক্তপাত হতে শুরু করল ।

বাকিরা কিছু বোঝার আগেই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরও কিছুটা ঘন জঙ্গলের রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল । সামনে একটি বড় পাথরে এসে ধাক্কা খেতেই অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন । বিছিন্নভাবে সকলে এদিকে ওদিকে পড়ে রইলেন । হাত পা কেটে যাওয়ায় গোঙানির শব্দ ভেসে আসতে লাগল । বাসের অন্দরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। নীলিমা দেবী কোনরকমে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ালেন । প্রকাশ বাবুর উদ্দেশ্যে যেতে গিয়ে দেখলেন তাঁর মাথাটি সামনের রডের সাথে লেগে রয়েছে । সামান্য একটু ঠেলা দিতেই রক্তাক্ত কপালটা চুয়ে চাপচাপ রক্ত ঝরতে লাগল । মানুষটা যে আর নেই তাঁর জন্য এই অভিব্যক্তিটুকুই ছিল যথেষ্ট ।

নীলিমা দেবী হাঁপাতে লাগলেন । ডান দিকের জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখলেন বাসের সামনের চাকা দুটো কাদার মধ্যে ঢুকে গেছে । সেখান থেকে বার করার লোকও আর জীবিত নেই । প্রকাশ বাবু ড্রাইভিং একটু আধটু জানতেন ঠিকই কিন্তু সে আশাও আর রইল না । নীলিমা দেবী তখনও ড্রাইভারের বলা কথাগুলিই ভেবে চলেছেন ।

“এখানে সেই ইতিহাস আজও জীবিত হয়ে রয়েছে ম্যাডাম । আপনি ভাবছেন নিস্তার লাভ সম্ভব । প্রতিটি পদক্ষেপে সে সকলের পিছু করে বেড়াচ্ছে । বলির কাজ যে অসম্পূর্ণই রয়ে গেছিল । এত সহজে আমরা এখান থেকে বেরোতে পারব না । সে প্রকৃতিকেও টলিয়ে দিতে পারে । “

ড্রাইভারের শরীরে গাছের ডালটা বিঁধে রয়েছে । রক্তাক্ত জামাটি সবকটা সত্যিকে লিখিত বয়ানের মত তুলে ধরতে চাইছিল নীলিমার সামনে । কিন্তু এত মৃতদেহের ভিড়ে তিনি নিজেকে একা মনে করতে পারলেন না ।

“আমার উপরে এই বাচ্চাগুলোর দায়িত্ব রয়েছে যে । কিইই বা বয়েস এদের? হে ঈশ্বর কেন তখন ড্রাইভারের কথা শুনলাম না । প্রকাশ বাবুর কথায় বিশ্বাস করে ভেবেছিলাম এই রাস্তা ধরে সহজে কম সময়ে পৌঁছে যেতে পারব । কিন্তু ...কিন্তু হঠাৎ এই বজ্রপাত, এই বৃষ্টি , আর এই ...এই ভয়ঙ্কর সব মৃত্যু।

এগুলি তো সবই অনিশ্চিত ছিল । তবে নিশ্চিত কি? কোনটা?”

পর্ব – পাঁচ

বাসের ভিতরে থাকা বাচ্চাগুলি ভয়ে চিৎকার করতে লাগল । নীলিমা এগিয়ে এলেন,

“চুপ করো তোমরা, দয়া করে স্তব্ধ হও । এমনিতেই আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি । এখান থেকে বেরোনোর পথ কারুর জানা নেই । এদিকে চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার । কিছুই বুঝতে পারছিনা । আজকে আবার অমাবস্যা । চাঁদের লেশটুকুও নেই । তোমরা বাসের ভিতরেই থাকো । আমি একটু ওদিকটা দেখে আসছি । আর শোনো , আমি না ফেরা পর্যন্ত কিন্তু কেউ এখান থেকে এক পাও বাইরে রাখবেনা । “

“আপনি কোথায় যাচ্ছেন ম্যাম । আমাদের একা ভীষণ ভয় করবে যে!”

"আমি কাছেই থাকব । চিন্তা করোনা । যদি আশেপাশে কোন গ্রামের সন্ধান পাই তাহলে সকলে আজকের রাতটা কোনরকমে সেখানে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে কালকে সকালে রওনা হয়ে যাবো । তবে হ্যাঁ আমার আসতে হয়ত একটু দেরী হতে পারে । তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা কোরো কিন্তু । "

নীলিমা বাসের দরজাটা খুলতেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে পাশের গাছের ডালটা নুইয়ে পড়ল তাঁর দিকে। একটা পেঁচা অন্ধকারে ডেকে উঠতেই ওর শিরদাঁড়া বেয়ে রক্তের হিমেল স্রোত বয়ে গেলো । নিজের হৃৎস্পন্দনটিও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি । সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ছিল না । তবুও যে এগোতে হতই । নাহলে যে এতগুলো প্রাণ শেষ হয়ে যাবে । তাঁরই ভুলের মাশুল গুণতে হয়েছে যে সকলকে । কিছুটা দূরেই একটা ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পেলেন তিনি ।কারুর গলার স্বর যেন পাহাড়ের ঢালে বাঁধা পড়ে আবার তাঁর দিকে ফিরে আসছিল । এত

নিস্তব্ধতা যে ফিসফিসানির শব্দটুকুও পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল ।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল একলা থাকার কথা । কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল কেউ যেন আসছে তাঁর পিছনে । তাঁকে এক বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই তাঁর আগমন । কিন্তু নীলিমা তখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না । অমাবস্যার সেই কালো রাতটা যেন সেদিন আরও ঘন কালো আকার ধারণ করেছিল । ক্রমে প্রভাব বিস্তার করছিল তাঁর উপরে । তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজের সাথে বেঁধে ফেলতে চাইছিল । সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের তমসাবৃত সারিগুলিকে ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার কাজ এতটাও সহজ ছিলনা । লতাগুল্মের সারি বারবার তাঁর পা দুখানা আটকে ফেলতে চাইছিল । তারাও যে চাইছিল না প্রাণটা অকালে যাক , দপ করে নিভে যাক সেই জলন্ত শিখা । মনের মধ্যে সাহস এনে এগোতে থাকলেন নীলিমা ।

বুনো শিয়ালের ডাকটা কানে আসতেই আবার ঢোক গিলে থমকে দাঁড়ালেন তিনি । তাঁর চারিপাশ দিয়ে কারুর নিঃশ্বাসের শব্দটা আরও প্রতীয়মান হয়ে উঠতে লাগল । কেউ খুব কাছ থেকেই যেন ভবিষ্যতের বিভীষিকার আভাস দিয়ে যেতে চাইছিল তাঁকে । পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলেন সীমাহীন গাছের সারি দানা বেঁধে রয়েছে । সামান্য ছিদ্রটুকুও নেই । দূরের দিকে তাকিয়ে দেখার ইচ্ছেটিও এভাবেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে গেলো ।

"আমি তাহলে কোথায় ? বাসটাকেও তো আর দেখতে পাচ্ছিনা ! তাহলে কি রাস্তা ভুল করে ফেললাম । কিন্তু একটা গন্ধ , একটা অদ্ভুত গন্ধ আমাকে এতদূর পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে এলো ।কিন্তু সেটি কি ? আমিও বা কিসের জন্য এদিকটায় চলে এলাম । এদিকটা যেন আরও শান্ত, আরও বিপদসংকুল । "

সামনের অংশে কিছুই তেমনভাবে নজরে পড়ছিল না নীলিমার । হঠাৎ একটি ছোট পাথরে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি । ডান হাতের কব্জিতে

প্রচণ্ড জোরে আঘাত লাগায় একবার সজোরে "মাআআআআ" – বলে চিৎকার হয়ে উঠলেন । নিঃশ্বাসের শব্দটিও আরও তীব্রতর হয়ে উঠল । কিছুক্ষণ ঐভাবেই ঘাসের মধ্যে পড়ে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন তিনি । আশেপাশের কিছু পাথরে হেলান দিয়ে আবারও হাঁপাতে লাগলেন । এরপর সামনে বেষ্টিত একটি পাথরকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগলেন । পাথরের কাছে আসার পরেই হঠাৎ মনে হল শাড়ির আঁচলটা কোন একটি ধারালো কিছুর সাথে আটকে গেছে । বেশ কিছুটা অংশ পিঁজে গেছে । ডান হাতে চোট লাগায় , বাম হাত দিয়ে আঁচলটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি । কিন্তু ধারালো জিনিসটির থেকে মুক্তি পাওয়ার কাজ এতটাও সহজ ছিলনা । সে যে কোন সাধারণ ফাঁদ ছিলইনা ।

ক্রমশঃ

পর্ব – ছয়

নীলিমা আরও একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করলেন একটি ফলার মত কিছু একটা বেরিয়ে রয়েছে । যেটি সরাসরি এসে বিঁধেছে তাঁর আঁচলে । একটু জোরে

টান দিতেই একটি ত্রিশূল মাটি থেকে উপড়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল । সেই আওয়াজে চোখ পড়তেই তিনি দেখলেন ত্রিশুলের গায়ে লাল তিলক কাটা ছিল আর সেইসাথে একটি পুরনো হয়ে যাওয়া লাল কাপড় তাঁর সাথে বাঁধা ছিল । বিষয়টি দেখামাত্রই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন তিনি । ভালো করে বিষয়টি লক্ষ্য করতে লাগলেন । তারপর ত্রিশুলের ফলা থেকে ধীরে ধীরে ছিঁড়ে যাওয়া আঁচলের অংশটা সরিয়ে নিলেন । এরপর আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন । এমন সময় মনে হল তাঁর পাটা কিছুর সাথে আটকে গেছে । এমন কিছুর সাথে যে বেষ্টনী কাটিয়ে বেরনো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ।

পিছনের দিকে তাকাতেই নীলিমার নজরে পড়ল এক ভয়ঙ্কর চেহারা । দুটো লাল চোখ তাঁর দিকে তাকিয়েছিল । গলায় কাটা আঙুলের মালা । জীর্ণকায় চেহারার এক তান্ত্রিক । সারা শরীরে ছাই মাখা । দাঁতগুলো করাতের আকারে বেরিয়ে রয়েছে । বর্ধিষ্ণু কেশরাশি ঢেকে ফেলেছে তাঁর গোটা শরীরটিকে । হাতের নখগুলি কালো হয়ে গেছে । পায়ের পাতাগুলি উল্টে রয়েছে ।

নীলিমার দিকে তাকিয়ে তারস্বরে হাসতে লাগলেন তিনি । নীলিমার কথা বলার শক্তিটুকুও লোপ পেলো । তিনি ঐ স্থান ত্যাগের আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন । তান্ত্রিক দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন ,

"তোর হাতেই আমার মুক্তি লেখা ছিল । আঃ , কি শান্তি । এতদিন বাদে মুক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে আসতে পেরেছি । এতদিন পর্যন্ত ঐ বদ্ধ গুহার তলায় চাপা পড়ে ছিলাম । ওরা সকলে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । সবাই আমার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল । কিন্তু এত সহজে কি ওদের সকলকে মুক্তি দিতে পারতাম বল ? আর মাত্র দুটো বলি বাকি ছিল । তাহলেই আমি পিশাচ সিদ্ধ হয়ে যেতাম । যত শক্তি আছে সবটা কাজে লাগিয়ে এই গোটা পৃথিবীকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারতাম । কিন্তু না , ঐ ধূর্ত গ্রামবাসীরা আমাকে ফাঁদে ফেলে গুহার দরজাটা আমার মুখের উপরে বন্ধ করে দিলেন । আমি মন্ত্রোচ্চারণ করছিলাম । ওদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করবার জন্য গুহার দিকে দৌড়ে আসতে লাগলাম । কিন্তু না , আমি আসার আগেই

ওরা সকলে মিলে গুহার মুখটা আটকে দিল । জ্যান্ত সমাধি দিয়ে দিল আর এই ত্রিশূলটিকে এখানে পুঁতে দিয়ে ভেবেছিল এটিকে কোনদিনই কেউ সরাতে আসবেনা । আমার শরীরটাকে ওরা গুহার ভিতরে আটকে রাখলেও আত্মাটিকে আটকে রাখতে পারেনি । আমি মুক্তির আশায় ঘুরে বেরিয়েছি আজ দীর্ঘ এতগুলি বছর । তোর জন্য আবার আমি শরীর দখল করতে পেরেছি । এবার আমি মুক্ত । হ্যাঁ , এবার আমি আগের চেয়েও বেশী শক্তিশালী । আমি এও জানি তোর কোন দোষ নেই । কিন্তু তুই যে বাচ্চাগুলোকে এনেছিস ওদের আমার খুব প্রয়োজন যে ! ওদের দিয়েই তো আমি আমার কার্যসিদ্ধি ঘটাবো । "

নীলিমা পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন ।হাতজোড় করে বললেন ,

"আমি আপনার দুটি পায়ে পড়ি । ওদের কোন দোষ নেই । ঐ নিরীহ প্রাণগুলির বলি আপনি কিছুতেই চড়াতে পারেননা । আপনি এ কাজ কিভাবে করতে পারেন ?"

তান্ত্রিক নীলিমার কথাগুলি সহ্য করতে পারলেন না ।

ধেয়ে এলেন তাঁর দিকে । তাঁর ধারালো নখের সাহায্যে নীলিমার গলাটা শক্ত করে চেপে ধরলেন । এরপর ধীরে ধীরে গলার মাংসপেশি ভেদ করে তাঁর হাতটা ঢুকে গেলো । নীলিমা চিৎকার করতে লাগলেন । তাঁর গলাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলো নিমিষেই । নীলিমার ছিন্ন বিছিন্ন শরীরটিকে সামনের গাছটিতে উল্টে টাঙিয়ে রাখলেন কৃপালি । আর শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া মাথাটিকে গাছের এক পাশ থেকে বেরিয়ে আসা ডালের সাথে ঝুলিয়ে দিলেন । ফোঁটা ফোঁটা রক্ত নীচে পড়ে থাকা ভাঙা কলসির ভিতরে পড়তে শুরু করল । তান্ত্রিক সামনের দিকে তাকালেন ।

"হাহাহাহাহা , আমার পথে যে আসবে তাঁকে এভাবেই খতম করবো আমি । কোন বাঁধা বিপত্তি আর মানবনা । সেদিন তোরা আমার চিৎকারের দাম দিয়েছিলিস ? এবার তোদের চিৎকারের শব্দ শুনে

আমি আমার প্রাণ জোড়াব ! আমি আসছি , আসছি আমি । “

নীলিমার মৃত শরীরটি ঐভাবেই গাছের সাথে ঝুলতে লাগল । পাষাণের সাথে ধাক্কা খেয়ে ত্রিশূলটা পাহাড়ের কোলে গায়েব হয়ে গেলো । তান্ত্রিক সেটিকে চিরকালের জন্য ছুঁড়ে ফেলে দিলেন । এরপর ঐ জঙ্গলের পথ ধরে এগোতে শুরু করলেন ।

পর্ব – সাত

নীলিমা দেবী আর ফিরলেন না দেখে বাসে উপস্থিত সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আরও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল । দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় তারা আর অপেক্ষা করতে না পেরে বাস থেকে নেমে পড়লেন । শুধুমাত্র একজনকেই বাসে রেখে যাওয়া হল । ছোট্ট অর্ণব । ক্লাস থ্রি এর স্টুডেন্ট । ভূত আর জঙ্গলে সবথেকে বেশী ভয় থাকায় তাঁকে কেউই নামতে দিলনা ।

ওদের মধ্যে থেকেই একজন এগিয়ে এসে বলল , “শোন অর্ণব , আমরা একটু ওদিকটায় যাচ্ছি ।

আমাদের ফিরতে ফিরতে বেশ অনেকটা সময় লেগে যেতে পারে । নীলিমা ম্যাডামকেও কোথাও দেখতে পাচ্ছিনা । কাজেই তুই এই মুহূর্তে কোথাও যাস না । এই বাসের মধ্যেই থাকিস।

অর্ণব হাত দেখিয়ে প্রকাশ বাবু আর ড্রাইভারের মৃতদেহটির দিকে তাক করতেই ওরা সকলেই আরও একবার ঘাবড়ে গেলো ।

"আচ্ছা এখানে থাকলে তো ও আরও ভয় পাবে । এরা দুজনের কেউই আর জীবিত নেই । এই মরা মানুষদের আশ্রয়ে ওকে ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে ? এছাড়া আমাদের ফিরতে ফিরতেও বেশ অনেকটাই সময় লেগে যাবে হয়ত । কিন্তু ? আর তো কোন উপায়ও নেই । তাহলে ?"

ওদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে অর্ণবের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল , "দেখ অর্ণব আমরা বুঝতে পারছি । কিন্তু এরা তো কিছু করবেনা । এদের শরীরে প্রাণ নেই । এরা যেভাবে রয়েছে সেভাবেই থাকবে । দিদিমণি কে খুঁজে না পেলে এদের ব্যবস্থাও

করতে পারবোনা । এছাড়া জঙ্গলের মধ্যে যদি তুই কোথাও হারিয়ে যাস তাহলে খুঁজে পেতে আমাদের দম বেরিয়ে যাবে । আমরা এখানকার কিছুই চিনিনা । প্রকাশ স্যার এদিকটার সম্পর্কে অনেককিছুই জানতেন । মাঝে মাঝে আমাদের গল্পও বলতেন । কিন্তু সেখানে এসেই যে এভাবে গাড়ি খারাপ হয়ে যাবে সেটা কেইই বা জানত ? যাক শোন , আমরা একটু নীলিমা ম্যাডামকে খুঁজে আনার চেষ্টা করছি । উনি না ফিরলে আমাদের এখান থেকে বেরনো কোনভাবেই সম্ভব হবেনা । এছাড়া এখন বেশ রাত গভীর । ঘড়ির কাঁটা বারোটায় । মধ্যরাত । আমাদের নিজেদেরই বলতে গেলে গা ছমছম করছে কিন্তু তবুও নিজেদের প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে । শোন , কোন অপিরিচিত লোকও যদি তোকে এসে ডাকে , তাহলেও বাইরে খবরদার বেরবি না । বলে দিলাম কিন্তু !”

অর্ণব কিছু না বুঝেই অবাক দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আলত করে ঘাড়টা নামিয়ে সম্মতি দিল । এরপর ওরা সকলেই একে একে বাস থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে এগোতে শুরু করল । অর্ণব জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ সেই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য অর্জন

করলেও খানিকক্ষণ পরেই ওদের শরীরগুলোকে জঙ্গলে দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলি গ্রাস করে ফেলল ।

পর্ব – আট

সামনে কিছুটা এগোতেই তারা দেখতে পেলো গুহার আদলে নির্মিত রয়েছে একটি স্থান । যার চারিপাশ দিয়ে লতাপাতা বেষ্টিত রয়েছে । একে অপরের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যেন কতদিনের পরিচয় । বহু শতাব্দী আগে থেকেই নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ তারা । আরও কিছুটা সামনের দিকে এগোতেই অন্ধকারটা যেন আরও ঘন হয়ে তাঁদের চোখমুখ একেবারে ঢেকে ফেলল ।স্পষ্ট হল এমন কিছু যা দেখে সকলের শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেলো । তারা লক্ষ্য করল কিছু ঝুলন্ত গলাকাটা দেহ , যেগুলিকে ঐ লোহার রডের মধ্যে গিঁথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল । প্রতিটি দেহ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছিল কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল সেগুলি কোন মানব শরীরই।দেহগুলিতে পচন ধরলেও শুঁটকো পচা গন্ধটা হাওয়ার সাথে তাঁদের দিকেই ভেসে আসছিল । প্রতিটি দেহকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা

হয়েছিল । তাঁদের মুণ্ডুগুলিকে বাঁশের কঞ্চির উর্দ্ধদেশের সাথে আটকে রাখা হয়েছিল । প্রতিটি মুণ্ডুর নীচে রাখা ছিল একটি করে পাত্র । তাঁর মধ্যে রক্ত শুকিয়ে ছিল । একসময় যে এই পাত্রগুলি তাঁদের রক্তেই পূর্ণ হয়েছিল সেটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ।

পেঁচার ডাকটা আরও তীব্রতর হয়ে উঠল । পায়ের আওয়াজটা আরও প্রখর হল ।

"কেউ এদিকে আসছে রে ! আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আর এ কোন সাধারণ পদধ্বনি নয় । মনে আছে প্রকাশ স্যার আমাদের এরকমই একটা জায়গার কথা গল্পে বলেছিলেন । কিন্তু সেটা যে বাস্তবেও এভাবে দেখতে পাবো , সেটা কোনদিনও ভাবতে পারিনি । "

মেয়েটি কথাটি শেষ করা মাত্রই সকলের মুখে , হাতে পায়ে রক্ত ছিটে গেলো । ওরা ক্ষণিকের জন্য চকিত হয়ে গেলেও এরপর ধীরে ধীরে সেদিকে তাকাতেই আবারও আতঙ্কে সারা শরীর শিরশির করে উঠল । সেই বিশালকায় চেহারাটি দেখামাত্রই সকলে কাঁপতে

শুরু করল ।কৃপালির ডান হাতে তখন ঐ মেয়েটির কাটা মুণ্ডু । শরীরটা সদ্য ধর থেকে আলাদা হয়ে পাশে পড়ে কাঁপছিল । কিছুক্ষণ ওইভাবে ছটফট করার পর ওদের চোখের সামনেই শেষ হয়ে গেলো ।ওরা হাতজোড় করে তান্ত্রিকের কাছে নিজেদের প্রাণভিক্ষা করতে লাগল ।

তান্ত্রিক ঐ নুইয়ে পড়া সদ্য মৃত দেহটির থেকে হাতের আঙুলগুলি ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে একে একে কাটতে লাগলেন । ওরা নির্বাক হয়ে সেই নৃশংসতা লক্ষ্য করতে লাগল । নিরুপায় চেহারাগুলি তখন প্রাণহীন দৃষ্টি নিয়ে নিজেদের আত্মপলব্ধির জবানবন্দীতে ব্যস্ত । তান্ত্রিক সেই আঙুলগুলিকে একত্রিত করে মালায় গেঁথে নিতে থাকলেন । তারপর কড়ে আঙুলটা মুখে পুড়ে কড়মড় শব্দ কড়ে চিবোতে চিবোতে বললেন ,

"আহ , কতদিন বাদে কাঁচা রক্তের স্বাদ পেলাম । হাড়টাও বেশ সুস্বাদু । দিব্যি জমে গেছে । তোরা দেখতে চাইছিলিস না তোদের শোনা গল্পের সাথে সত্যি সত্যি এই জায়গাটির কোথাও মিল আছে কিনা ?

তাই তোদের মিল দেখিয়ে দিলাম ! এবার বিশ্বাস হল তো ? একদিকে ভালোই হয়েছে তোরা নিজেরাই আমার আস্তানায় চলে এসেছিস , নাহলে আমাকে আবার এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে তোদের খুঁজতে যেতে হত । আমার তো শুধু দুজনকে প্রয়োজন ছিল । কিন্তু এখন তো দেখছি পিশাচ দেবতা আমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে সারা বছরের বলির খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন । হিহিহিহিহাহাহাহাহাহাহাহাহাহা। “

ভয়ঙ্কর সেই হাসির শব্দটি গোটা জঙ্গলের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল । জঙ্গলটি যেন তাঁদের সকলকে গিলে খেতে আসছিল । তান্ত্রিক মৃত মেয়েটির শরীরটিকে হাতের ধারালো অস্ত্রটির সাহায্যে দু টুকরো করে দিলেন । আরও কিছুটা রক্ত বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে গেলো । তারপর তিনি ওদের দিকে এগোতে শুরু করলেন । প্রত্যেকেই চিৎকার করতে শুরু করলেন । যে যেদিকে পারলেন ছুটে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাইলেন । কিন্তু কোন ফল হলনা সেদিন । তান্ত্রিকের কাছে ছিল অসীম শক্তি । তিনি যত্রতত্র সর্বত্র মুক্ত বিচরণ করতে পারতেন । সেই ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কারুর পায়ের একাংশ বাদ পড়ল তো

কারুর হাত । তবুও বিদ্ধস্ত শরীরগুলি নিজেদের শেষরক্ষার জন্য দৌড়তে শুরু করল ।

ক্রমশঃ

পর্ব – নয়

অন্ধকারের বুক চিরে তারা একটি মুক্ত আশ্রয়ের খোঁজে ধাবিত হতে থাকল । পিছনের হুঙ্কারটি যে একেবারেই বৃথা নয় , সে বিষয়টি কমবেশি সকলেই ধারণা করতে পারছিল । ওদের মধ্যে কিছু জঙ্গলের পূর্ব সীমান্ত বরাবর দৌড়ে গেলো আর কিছু পশ্চিমে । প্রত্যেকেই সীমাহীন অরণ্যানী ভেদ করে নিজেদের রক্ষার কাজে তৎপর হয়ে ধাবিত হতে শুরু করেছিল । চারজনের দল এসে দাঁড়াল একটি গাছের কোটরকে আশ্রয় করে ।

"আমরা এখানেই থাকি । এই জায়গাটা একটু আলাদা । অন্যান্য জায়গায় লুকোনোর চেষ্টা করলেও সেটা বৃথাই হত । তবে এই জায়গাটা অনেকটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়েও রয়েছে । কাজেই তেমন

একটা বিপদ হবেনা মনে হয় । কিন্তু একেবারে আসতে । সামান্যতম নিঃশ্বাসের শব্দটাও যেন বাইরে না যায় । দমবন্ধ করে বসে থাকতে পারলেও ভালো হয় । আমার যতদূর মনে হয় তান্ত্রিক এদিকেই আসছিলেন । আমি তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম । এখান থেকে উদ্ধারের আর কোন পথ নেই । ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত আমাদের এখানেই অপেক্ষা করা উচিৎ হবে । “

“কিন্তু আমাদের বাকি বন্ধুরা তো পশ্চিমের দিকে এগিয়েছে । ওরা তো ওদিককার রাস্তাই চেনেনা । তাহলে ওরা কোনভাবেই নিরাপদ নয়। “

“মনে করে দেখ প্রকাশ স্যার আমাদের একবার এ বিষয়ে জানিয়েছিলেন । উনি বলেছিলেন এই জঙ্গলের পূর্বদিকে একটা বড় গাছ রয়েছে । যেটা ভীষণই অদ্ভুত । জঙ্গলের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সেটিকে দেখতে অনেকটা মানুষের মত । আমাদের মনে হয় আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যাবো । শুনেছি সেটি নাকি খুব জাগ্রত । ঐ গাছটিকে পবিত্র

মনে করে গ্রামবাসীরা বহুকাল পূর্বে পূজা করতেন । সেখানে আজও হয়ত সেই দেবী শক্তির আভাস স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । যেমন তান্ত্রিক মৃত্যুর পরেও নিজের শক্তি হারিয়ে ফেলেননি । তেমনই ঐ দৈব বৃক্ষও হয়ত নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেনি । “

“কিন্তু আমরা কোথায় খুঁজব ? পূর্বদিক বরাবরই আসতে বলেছিল স্যার । কিন্তু এখন তো দেখছি জঙ্গলের সবদিকই প্রায় সমান । যেদিকে যাচ্ছি সেখানেই মনে হচ্ছে আগেও একবার এসেছি । এভাবে চলতে থাকলে তো আমরা একই জায়গায় বারবার পাক খেতে থাকব । আমরা এই এলাকা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারবোনা । “

হঠাৎ খুকখুকে কাশির শব্দ হতেই তারা ডানদিকে তাকাল ।

“একি , এই লোকটা আবার কোথা থেকে এলেন ?“

“লোকটিকে দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে । দেখনা মনে হয় কোন মন্দিরের পুরোহিত । কিন্তু এত রাতে এখানে কি করছেন ?”

“দাঁড়া , দাঁড়া , এভাবে যাকে তাঁকে বিশ্বাস করতে যাওয়াটাও ঠিক নয় । “

“কিন্তু আমাদের হাতে আর সময় নেই । যেভাবেই হোক এখান থেকে মুক্তির একটা পথ বার করতেই হবে , আর সেটা যদি নাও হয় তবে অন্ততপক্ষে ভোর হওয়া পর্যন্ত নিজেদের নিরাপদে রাখতে হবে । “

ওদের মধ্যে থেকে একজন সাহস করে বেরিয়ে সেই ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল ,”আচ্ছা আপনি কে? আর এখানেই বা কি করছেন ?”

“আমি এই গ্রামেই থাকি । এখানে একটা জাগ্রত মন্দির আছে । আর তাঁর পাশেই আছে সেই দৈব বৃক্ষ। আমি সেখানেই যাচ্ছি । “

"কিন্তু এত রাতে আপনি সেখানে কি করতে যাচ্ছেন?"

"আসলে আজকে অমাবস্যা । এইদিন দেবীর পূজা করলে ভালো ফললাভ এর সম্ভাবনা থাকে । আমি সেই কারণেই ওদিকে যাচ্ছি । ঘাবড়ানোর কিছু নেই । তোমরা আমার সাথে আসতেই পারো । আসুবিধার কিছু নেই । এছাড়া আমি তোমাদের বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি । চলো , যেতে যেতে না হয় তোমাদের অতীতের কিছু ঘটনার কোথা বলব । তোমাদেরও তো জানা উচিৎ এখানকার ইতিহাসটা ! কি তাইতো ?"

"কিন্তু আমরা এভাবে আপনার সাথে ! এছাড়া ঐ ভয়ানক তান্ত্রিক আমাদের পিছু করছেন ! যে কোন মুহূর্তে আপনার উপরেও বিপদ আসতে পারে । আজকের দিনটা না হয় আপনি সেখানে নাইই গেলেন। অন্য কোনদিন না হয় !"

ওদের কথা শুনে লোকটি বেশ কিছুটা রেগে গেলেন ।

"দেখো আসতে হয় এসো । নাহলে এখানেই পড়ে থাকো । তান্ত্রিকের খাদ্যে পরিণত হওয়ার খুব সখ দেখছি তোমাদের । বেশ , আজকাল মানুষের যেচে উপকার করতেই নেই । এরকমই হয় ।যাক আমার সময়ের দাম আছে । এছাড়া তিথি চলে গেলে অন্য সময়ে পূজা করে আর কোন লাভ হয়না । শেষ বারের মত জিজ্ঞাসা করছি তোমরা যাবে কি ?"

ওরা সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লোকটিকে অনুসরণ করতে লাগলেন ।

কিছুটা রাস্তা এগোনোর পরেই লোকটি অতীতের সেই ইতিহাসের কথা অব্যক্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন ।

পর্ব – দশ

"এই গ্রামের জমির মত উর্বর জমি আমি খুব কমই দেখেছি । কিন্তু একটা সময় গ্রামের সকলের মাঝে এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল । কৃপালি নামক একটি ছেলে নিজেকে কালো শক্তির অধিপতির কাছে সঁপে

দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে শুরু করেছিলেন । গ্রামের প্রতিটি আনাচে কানাচে খবর ছড়িয়ে পড়ায় সকলেই নিজেদেরকে কৃপালির থেকে দূরে সরিয়ে ফেলার চেষ্টায় ব্রতী হন । কিন্তু কৃপালি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেকোনো রকমের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন । গ্রামে মধ্যে এক তরাসের সৃষ্টি হয় । কৃপালি এক সাধারণ চাষির কনিষ্ঠতম সন্তান ছিলেন । পরিবারের তরফে তাঁকে কোনদিনই তেমন যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি । লোকে বলত ছোটবেলা থেকেই নাকি সে নিজেকে পিশাচের সন্তান মনে করত । অনেকেই তাঁকে কাঁচা মাংস খেতেও দেখেছিল । এছাড়াও পশুদের শিকারের পাশাপাশি একটা সময়ে সে মানুষের মাংসও ভক্ষণ করতে শুরু করেছিল । এই বিষয়টি যখন গ্রামের সকলের কাছে জানাজানি হয়েছিল , তখন অনেকটাই দেরী হয়ে যাওয়ায় কৃপালিকে রোধ করা আর কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিলনা । একটা দিন সে নিখোঁজ হয়ে যায় । গ্রামের সর্বত্র খোঁজ করেও তাঁর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি । সে নিজেকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল সেই হদিস কারুর কাছেই ছিলনা । গ্রামে অনেক খোঁজ লাগিয়েও যখন তাঁকে পাওয়া গেলনা তখন গ্রামের মানুষ তাঁকে মৃত বলে

ঘোষণা অরে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । কেউ ভেবেছিল তাঁকে বাঘে খেয়েছে , আবার কেউ ভেবেছিল তাঁকে পিশাচে তুলে নিয়ে গেছে । কিন্তু কেউই প্রকৃষ্ট সত্যতা সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি । এভাবে প্রায় তিনমাস অতবাহিত হয়ে গেছিল । এই গ্রামে জাতপাতের বিষয়ে তেমন কোন বিধিনিষেধ না থাকায় বিবাহের ক্ষেত্রেও তেমন কোন অসুবিধা হতনা । একদিন গ্রামে ব্রাখন সম্প্রদায়ের একটি ছেলের সাথে যখন শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত একটি মেয়ের বিবাহের অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছিল ঠিক সেইসময় হঠাৎ এক হট্টগোলের আওয়াজে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন । সেদিনও এরকমই এক অমাবস্যার রাত ছিল । নিচু সম্প্রদায়ে বিবাহ হলে নাকি ঐ দিনটিকেই পবিত্র মনে করা হয় । সেদিন ঐ দৈব বৃক্ষের সামনেই ছাগ বলি দিতে হত । তারপরেই বিবাহের কারজ সম্পাদিত হত । কিন্তু সেবার ঘোর অঘটন ঘটল । গ্রামে একটিও ছাগ মজুত ছিলনা । বিবাহের লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছিল । এই অবস্থায় কুসঙ্কারাছন্ন গ্রামবাসীরা একটি সন্তান সম্ভবাকে বলি দিয়ে বিবাহের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন । এই কাজ ছিল একেবারেই ঘৃণ্য । কিন্তু সেদিন পঞ্চায়েত প্রধান বড়

পক্ষের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে এই কুকাজে অংশ নিতেও দ্বিধাবোধ করেননি । কিন্তু এর ফল ছিল মারাত্মক । কোন জীবনের পরিবর্তে কোন জীবন প্রাপ্তির মধ্যে শুভ অশুভের বৈষম্য যেমন লুকিয়ে ছিল , তাঁর পাশাপাশি ছিল এক আতঙ্কের বিস্তারও ।

জীবের পরিবর্তে হল মানুষের বলি । সাথে সাথে সেই দৈব বৃক্ষের সমস্ত শুভ ক্ষমতা লোপ পেলো । সেখানে শয়তানের আবির্ভাব হল । গাছটি ডালপালা বিস্তার করে ওখানে উপস্থিত সকলকেই নিজের গর্ভে ঢুকিয়ে নিলেন । খুব সামান্য মানুষই এই বিভীষিকার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল । গ্রামে শয়তানের উপদ্রব বৃদ্ধি পেলো । বাকিরা সেদিন রাতে কোথাও একটা আশ্রয় নিয়েছিলেন । তবে ঐদিন রাতে এক জটাধারী ব্যক্তিকে ঐ গাছটির কাছে এসে মাটি থেকে রক্ত চেটে খেতে দেখা গেছিল । শয়তানের শরীর নিঃসৃত সেই রক্তের স্বাদ গ্রহণের অর্থ ছিল পিশাচের কাছে পুরোপুরিভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়া । সেই লোকটি ছিলেন নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কৃপালিই । এতদিন তিনি জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন । সেদিন শয়তানের করুণা বর্ষিত

হয়েছিল তাঁর উপরে । এরপর থেকেই নিয়ম করে প্রতি অমাবস্যায় গ্রামের একটি করে শিশু গায়েব হতে শুরু করেছিল । গ্রামবাসীরা বিষয়টি বোঝার আগেই একে একে বহু শিশুর কাঁটা মুণ্ডু এবং ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া শরীরগুলিকে গ্রামের সীমান্তে অবস্থিত গুহার বাইরে উল্টো করে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যেত ।আর এই কাজ যে কৃপালি ছাড়া আর কারুর নয় সেটি বুঝতেও গ্রামবাসীদের তেমন কোন অসুবিধা ছিলনা । “

ওদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞসা করলেন ,”আচ্ছা পুরোহিত মশাই ঐ যে দূরে যে গাছটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেটিই কি ঐ অভিশপ্ত বৃক্ষ ? “

“হ্যাঁ “

“তাহলে আপনি এখানে কেন নিয়ে এলেন আমাদেরকে ? আপনি তো বললেন এখনও নাকি সেখানে পূজা হয় । এখনও নাকি তাঁর শুভ শক্তির প্রভাব গ্রামের সর্বত্রই বিদ্যমান ! এছাড়া কৃপালি নাকি মহাশক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন । এরপর তিনি

নরবলিও দিতেন । তাহলে তো এই গাছটির আর কোন অস্তিত্ব থাকারই কথা নয় !”

পর্ব – এগারো

ওরা সকলে লক্ষ্য করলেন পুরোহিতের বেশভূষা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে । সদন্ত বেরিয়ে আসছে । শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যেও এক আমূল পরিবর্তন ঘটে চলেছে । কেশরাশি গোটা শরীরটিকে ঢেকে ফেলছে । হাত ও পায়ের নখগুলিও আসতে আসতে বৃদ্ধি পাচ্ছে । তারপরেই তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেই মূর্তি যা মৃত হয়েও জীবিত । যা বিভীষিকার শেষ কথা !

সকলেই অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে লাগলেন ।

“কৃ…পা……লি?”

“হাহাহাহাহাহাহাহ , আবার কি , মূর্খের দল । তোরা চিরকালই আমার শক্তির কাছে পরাস্ত হয়েছিস । আজও হবি এমনকি আগামীতেও ।যতবার তোরা

আমার কাছে আসবি , ততবারই একইভাবেই শেষ হবি । বাকিটা শুনবি না ? কিরে ? ওমা ঐ দেখো পালাতে চাইছে ! আরে বাকিদের তো শেষ করেই এসেছি । বাকি ছিলিস তোরা । তা তোদেরকে এভাবে না মেরে ভাবলাম অতীতের কাহিনীটা কিছুটা শুনিয়েই বরং মারি । এভাবে মারতে আরও ভালো লাগবে যে ,হাহাহাহাহা। ঐ যে গ্রামবাসীগুলো সেদিন আমায় বোকা বানাল । আমার আর দুটো বলির কাজ বাকি ছিল । সেদিন ঐ দুই বলির কাজ সম্পন্ন করে দিতে পারলেই আমি আমার সাধনায় চিরতরে সিদ্ধিলাভ করে যেতাম । কিন্তু ওদের আমার সুখ সহ্য হলনা । ওরা একে একে আমার সাজানো সংসারটাকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগলেন । “

কথাগুলি বলতে বলতে কৃপালি ওদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন । হাতের ধারালো অস্ত্রটা ওদের মাথা বরাবর চালাতে লাগলেন । একটা একটা করে মাথা ধর থেকে আলদা হয়ে যেতে লাগল । সেই সাথেই তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল ।

"হ্যাঁ এভাবেই , এভাবেই তো শেষ করতে চেয়েছিলাম তাদেরকেও কিন্তু পারলাম কোই । আমার চোখের সামনে আমার উন্মুক্তির দ্বারটাকে বন্ধ করে দিতে থাকল ওরা । আর আমি একা একা চিৎকার করতে লাগলাম । দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল আমার। পালানোর কোন পথ না পেয়ে শ্বাস বন্ধ করে সেখানে কয়েক ঘণ্টা ঐভাবেই পড়ে রইলাম । কিন্তু সেদিন কেউ বাঁচাতে এলনা । আমার সাধনার যে আরও কিছুটা সময় বাকি ছিল । "

তান্ত্রিকের নজর এড়িয়ে একজন সেখান থেকে পালিয়ে গেলো । চারিদিকে তখন শুধু রক্তের খেলা । তিনটি শরীরকে ইতিমধ্যেই ধর থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন তিনি ।

"কোথায় পালাবি ? তোদের তো শেষ হতেই হবে । তোদের কাঁচা রক্তে স্নান করবে এই কৃপালি । তবেই তো আমার হাড় জুড়বে । এতদিনের তৃষ্ণা নিবারণ করবি না ? কিরে ? আরে ঐ ! হাহাহাহাহা?"

হাসির শব্দটা আরও তীব্র গতিতে এদিকে ওদিকে বিস্তারলাভ করতে লাগল । কিছুদূর যাবার পরেই মেয়েটি একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো । সামনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে । নীলিমার কাটা মুণ্ডুটা তাঁর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিল ।

"চলে যাও , এখান থেকে চলে যাও । সে আমাকেও শেষ করেছে । আমি জানি তোমরা আমার খোঁজেই এসেছ ! কিন্তু এখান থেকে পালানোর আর কোন পথ নেই । সে যে এখন সম্পূর্ণ মুক্ত । আর এই জঙ্গল তাঁরই । আমিও আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিলাম , কিন্তু সে বেশ ধরে আমার সামনে এসেছিল । আমি বুঝতেও পারিনি । যে ত্রিশূলটি গুহার পার্শ্বে পোঁতা ছিল সেটি কোনকারণে আমার হাত লেগে উপড়ে যাওয়ায়ই এই বিপত্তি । আমিই তাঁকে ভুলবশত মুক্ত করে ফেলেছি । আমি জানিনা তোমাদের সকলের কি হবে ! তবে আমার আর সে ক্ষমতা নেই তোমাদের বাঁচানোর । কারণ আমি নিজেই অপঘাতে মারা গেছি। এরপরেই প্রেতে পরিণত হয়েছি । আমায় ক্ষমা করে দিও । "

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল ,” এতে আপনার কোন দোষ নেই ম্যাডাম। আপনি তো আমাদেরকেই……”

কথাটা অন্তিমবারের মতই উচ্চারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল । এরপরেই সবকিছু শেষ । তান্ত্রিক অস্ত্রের আঘাতে মেয়েটিরও শিরচ্ছেদ করে দিলেন । নীলিমার দিকে তাকিয়ে বললেন ,

“শেষ প্রদীপটাকেও নিভিয়ে দিলাম । কেউ এখান থেকে বেঁচে বেরোতে পারলিনা । তুই তো সারাজীবন প্রেত হয়েই এই গাছে ঝুলবি । মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করবি আর আমি তোর চোখের সামনেই সকলকে এভাবেই শেষ করব । দেখব তুই কিভাবে এদেরকে রক্ষাকরতে পারিস ।হাহাহাহাহাহ। “

তান্ত্রিক গায়েব হয়ে গেলেন ।

ক্রমশঃ
পর্ব – বারো

গোটা জায়গাটি রক্তে ভেসে যাচ্ছিল । কোন শরীর আর অবশিষ্ট ছিলনা । কিন্তু তান্ত্রিকের প্রয়োজন ছিল একটি বাচ্চাকে । তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন তিনি। তাঁর আত্মা জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ে বেড়াতে লাগল ।

সেই ভয়ঙ্কর মন্ত্রটি উচ্চারিত হতে লাগল । আবার হাওয়ার বেগ বৃদ্ধি পেলো । আকাশে মেঘের গর্জন শুরু হল । পৃথিবীর বুকে সেদিনের রাতটি ছিল এক মহাবিস্ময়ের রাত । আকাশে বাতাসে সেদিন কেবল মৃত্যুঘণ্টা বাজছিল । তাঁর সাথে সাথে হাওয়ার গতিবেগের সাথে আন্দোলিত হয়ে চলেছিল সেই পিশাচ মন্ত্র

“ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী , “ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী, অম্নগ রুথিরিয়ায় হেম্নাস্তায় পিশাচায় চতুর্ভুজায় হিং ক্লিং ছট স্বাহা “

“ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী , “ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায়

নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী, অম্নগ রুথিরিয়ায় হেম্নাস্তায় পিশাচায় চতুর্ভুজায় হিং ক্লিং ছট স্বাহা "............

মন্ত্রের তীব্রতা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকল । গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করল । তারা সেই মন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েই চিৎকার করে উঠলেন ।

"শুনতে পাচ্ছ সকলে ? সে যে আসছে ! সে যে এদিকেই আসছে ! সে এত বছর বাদে মুক্ত হয়ে গেছে। এখন তাঁকে বেঁধে রাখা আর কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। সে নিজের বদলা নেওয়ার অভিপ্রায়ে এই গ্রামকেও ছারখার করে দেবে । আমাদের আগুন জ্বালতে হবে । মশাল নিয়ে প্রস্তুত থাকো সকলে । নাহলে আমরা হয়ত আজকের রাত কাবারের আগেই শেষ হয়ে যাবো। "

গ্রামের বর্তমান পুরোহিত এগিয়ে এলেন ।

"শুনুন ,আপনারা দয়া করে একটু শান্ত হন । এভাবে হঠকারিতায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ হবেনা । আমরা কেউ ঐ জঙ্গলের রাস্তা চিনি পর্যন্ত না । এছাড়া দীর্ঘদিন ঐ পথে কেউ না যাওয়ায় জায়গাটা সম্পূর্ণরূপে আটকে গেছে । বড় বড় পাথরের চাই পড়ে জায়গাটিকে একেবারে যাতায়াতের অযোগ্য করে তুলেছে । আমাদের পশ্চিমের রাস্তা ধরেই এগোতে হবে । যাবার সময় মন্দিরের ফুল আর মায়ের হাতের ত্রিশূলটা ওটি অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে । আমার ঠাকুরদা নিজের হাতে গ্রামবাসীদের নিয়ে সেই গুহার প্রবেশদ্বার বন্ধ করে ত্রিশূলটিকে ইশান কোন বরাবর জমির সাথে পুঁতে দিয়েছিলেন । সেই মারণ বাণ মন্ত্র মৃত্যুর পূর্বে উনি আমাকে কানে কানে বলে দিয়ে গেছিলেন । আজকে আবার সেই মন্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতেই হবে । নাহলে কোন মূল্যেই আমাদের প্রাণে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয় । অতঃপর আমাদের ধীরগতিতে এগোনো উচিৎ । ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই । তাঁর আগেই আমাদেরকে এই শুভ মন্ত্রের উচ্চারণের দ্বারা ঐ গুহায় আবার তান্ত্রিকের আত্মাকে বশীভূত করে চিরকালের জন্য আটক করে দিতে হবে । তারপর

আমরা সেই ত্রিশুলের সাহায্যে জায়গাটিকে বেষ্টন করে দেব । এরপর সমস্ত মৃত শরীরগুলিতে অগ্নি নিক্ষেপ করতে পারলেই তান্ত্রিকের আত্মা আর কোনদিন মুক্ত হতে পারবে না । আমার ঠাকুরদা এই ক্রিয়া সম্পাদিত করতে পারেননি । প্রথম স্তরে এই কাজ অনেকটাই কঠিন হওয়ায় তিনি পিছিয়ে গেছিলেন । কিন্তু আজ আর এই ভুল করলে কিছুতেই চলবে না । চলো সবাই। “

ওরা সকলেই একে একে পাহাড় চড়তে লাগলেন । পাথুরে রাস্তা পেরিয়ে এগোতে থাকলেন গুহার দিকে ।

অন্যদিকে অর্ণব তখনও বাসের মধ্যে একা বসে তাঁর বন্ধুদের আসার অপেক্ষা করছিল । জায়গাটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হওয়ায় তাঁর গোটা শরীর ভয়ে কাঁপছিল । কিছুক্ষণ বাদেই গোটা বাসটিকে ঘিরে এক অদ্ভুত মন্ত্রের ধ্বনি কানে আসতে লাগল তাঁর । সেই মন্ত্রটি বারেবারে ধ্বনিত হয়েই চলেছিল ।

“ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী , “ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায়

নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী, অম্নগ রুথিরিয়ায় হেম্নাস্তায় পিশাচায় চতুর্ভুজায় হিং ক্লিং ছট স্বাহা “-“ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী , “ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী, অম্নগ রুথিরিয়ায় হেম্নাস্তায় পিশাচায় চতুর্ভুজায় হিং ক্লিং ছট স্বাহা “-

কিছুক্ষণ বাদে মন্ত্রোচ্চারণ স্তব্ধ হওয়া মাত্রই সে লক্ষ্য করল বাসের হেড লাইটটা আপনা থেকেই জ্বলে উঠেছে । সে সিট ছেড়ে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে গোটা বিষয়টা ভালো করে দেখতে লাগল । এক ধোঁয়া বাসটির সামনের অংশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বারেবারে ওঠানামা করতে লাগল । এরপর আসতে আসতে সেটি একটি অবয়বে রূপান্তরিত হতে শুরু করল । তান্ত্রিকের সেই ভয়ানক চেহারাটির উপরে বাসের আলোটা গিয়ে পড়তেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো অর্ণব । হাত দিয়ে শক্ত করে মুখটা চেপে এসে আবার নিজের সিটেরন্ধকার কোণাটা ঘেঁসে লুকিয়ে হাঁপাতে শুরু করল ।

বাইরে তখনও একি মাত্রায় সেই ভয়ঙ্কর মন্ত্র উচ্চারিত হয়েই চলেছে ,

"ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী , "ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী, অম্নগ রুথিরিয়ায় হেম্নাস্তায় পিশাচায় চতুর্ভুজায় হিং ক্লিং ছট স্বাহা "-

বাসের সামনের সিটে নজর পড়তেই সে আরও আচম্বিত হয়ে উঠল ।

নীলিমার কাটা মুণ্ডুটি সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সাবধান হওয়ার বিষয়টি মুহূর্ত অন্তর স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছিল ।

"এক পাও বেরিওনা অর্ণব । সে তোমারই সন্ধানে এসেছে । সে নরবলি চায় । তোমার বলি দিলেই সে মহাশক্তিশালী হয়ে যাবে । অমর । এরপর আর কোনকিছুর দ্বারাই তাঁকে শেষ করা যাবেনা । আমরা কেউ জীবিত নেই । শুধু তুমিই আছো । এখান থেকে

ভোর হওয়ার আগে এক পাও বেরিওনা । গ্রামবাসীরা হয়ত আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এদিকে আসবেন । তারা কিছু ক্রিয়া সম্পন্ন করেই তোমাকে উদ্ধার করতে আসবেন । তুমি তাঁদের কাছে সুরক্ষিত যেন । তাঁর পূর্বে এই স্থান ত্যাগ করোনা । তা জানবে মৃত্যুসম । “

অর্ণবের চোখের সামনেই নীলিমার কাটা মুণ্ডটি গায়েব হয়ে গেলো । ভয়ে , আতঙ্কে জর্জরিত হয়ে সে কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলল । ঐভাবেই অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল ।

বাইরের মন্ত্রোচ্চারণের শব্দটা তখন অনেকটাই কমে এসেছিল । ধীরে ধীরে তা একেবারে গায়েব হয়ে গেলো । যাবার সময় একটা দমকা হাওয়ার রেশ যেন গোটা জায়গাটিকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে দিয়ে গেলো ।

গ্রামবাসীরা অনেক কষ্টে সেই গুহার কাছে পৌঁছালেন। তাঁদের পদধ্বনি টের পেতে কৃপালিকে খুব একটা বেশী সময় অতিবাহিত করতেও হলনা । তবে

ততক্ষণে তারা সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করেই এনেছিল । তান্ত্রিকের আত্মা রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে ধাবিত হতে শুরু করল । গ্রামবাসীরা দেবীকবচম মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে ত্রিশূলের গায়ে লাল রঙের ধাগাটি বাঁধতে শুরু করলেন । তান্ত্রিকের আত্মা কিছুক্ষণের জন্য শক্তিহীন হয়ে পড়ল । দেবী শক্তির বশবর্তী হয়ে পড়ায় সেই আত্মার শক্তি ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল । সেই সময়ে পূর্ব স্থানে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় অবশিষ্ট রইল না।

তান্ত্রিকের আত্মা গুহার মধ্যে প্রবেশের সাথে সাথেই তারা পুনরায় গুহার দরজাটি বন্ধ করে দিতে লাগলেন । ত্রিশূলটিকে গুহার ঠিক সামনের অংশে বিঁধে দেওয়া হল । এক উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হওয়ার সাথে সাথে গোটা জায়গাটিতে একটি সুরক্ষা চক্র তৈরি হয়ে গেলো । এরপর গ্রামবাসীরা সকলে একে একে মশালের সাহায্যে সেই মৃত বাচ্চাদের শরীরগুলিতে অগ্নি নিক্ষেপ করতে লাগলেন । দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল গোটা জায়গাটি । একটি ভয়ঙ্কর আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল গুহাগর্ভ থেকে ।

কিছুক্ষণ বাদে সবকিছুই শান্ত হয়ে গেলো । ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই মৃতদেহের ছাইগুলি হাওয়ায় বিলীন হয়ে গেলো । এছাড়া জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকা বাকিদের দেহগুলিও মাটির সাথে বিলীন হয়ে গেলো । নীলিমার আত্মাও শেষবারের মত দেখা দিয়ে আবার গায়েব হয়ে গেলো সেই বৃক্ষের কোটরেই।

পুরোহিতের এই অসাধ্য সাধন কোন সাধারণ কাজ ছিলনা ।

গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন বড় রাস্তার দিকে । রাস্তার ধারে একটি স্কুল বাসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা এগিয়ে গেলেন । বাসের কাছে গিয়ে চারিদিকটা ভালো করে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন । ড্রাইভারের পাশাপাশি প্রকাশ বাবুর মৃতদেহটিকেও নজরে পড়ল ।

"এখানে মনে হয় আর কেউই জীবিত নেই ।এদের সকলকেই সেই তান্ত্রিক নিজদের গ্রাসে পরিণত করেছে । চলো তাহলে যাওয়া যাক ।"

এমন সময় তাঁদের মধ্যে থেকেই একজন বলে উঠলেন,"বাসের ভিতরটা একবার দেখলে হয়না ! যদি এখনও কেউ জীবিত থাকেন । "

সকলেই তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেলেন । এরপর বাসের ভিতরে প্রবেশ করলেন সকলে । চারিদিকটা ভালো করে দেখতে লাগলেন । এমন সময় সিটের কোণায় একটি বাচ্চার হাত সামান্য উঠে থাকতে দেখলেন । তাঁর গোটা শরীরটাই সিটের নীচে ছিল । ওরা কাছে যেতেই অর্ণব ওদের মুখের দিকে তাকাল ।

"একি , এই দেখুন পুরোহিত মশাই ভাগ্যিস আমি একবার এদিকে আসতে অনুরোধ করলাম সকলকে । নাহলে এই শিশুটি এখানে পড়ে থেকে থেকেই হয়ত মারা যেত । "

অর্ণবকে অনেককিছু জিজ্ঞাসা করা সত্তেও সে কিছুই বলতে পারল না । ওর কথা বলার শক্তিটা পুরোপুরি চলে গেছিল । শুধু মনে ছিল সেই কাটা মুণ্ডটির কথা।

"গ্রামবাসীরা আসবে । তোমাকে ঠিক রক্ষা করবে । তুমি ওদের সাথেই চলে যেও । "

সেই যাত্রায় শুধুমাত্র অর্ণবই রক্ষা পেয়েছিল । তবে কথায় বলে কিছু অভিশাপের কোন শেষ হয়না । অন্তই আবার আরম্ভের সূত্রপাত ঘটায় ।

পরিশিষ্ট –

এই ঘটনার পরে আরও বারোটা বছর শান্তিপূর্ণভাবেই কেটে গেছিল । অর্ণবকে গ্রামবাসীরা নিজের সন্তানের মতই পালন করেছিলেন ।পুরোহিত মশাই মৃত্যুর সময় সমস্ত মন্ত্র তাঁকে শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন ।

একদিন একটি গাড়ি ঐ জঙ্গলের পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিল । ঐ পথ পেরোনোর সময় ঠিক গুহার

পাশটাতেই এসে গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় সকলেই গাড়ি থেকে নেমে আশ্রয় খোঁজার জন্য জঙ্গলের গভীরে অগ্রসর হতে থাকেন । এরপর তারা গুহার কাছে গিয়ে পৌঁছান । আধুনিক ভাবধারায় বিশ্বাসী মানুষের কাছে পৈশাচিক কোনকিছুই তেমনভাবে মান্যতা পায়না । তারা গুহাটিতেই আশ্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন । ত্রিশূলটিকে সজোরে ঐ স্থান থেকে সরানোর পরেই তারা গুহার দরজাটিকে খুলে ফেলেন । গুহায় প্রবেশের পরেই তাঁদের হাতে আসে একটি পুঁথি । যেখানে সেই মন্ত্রগুলি লেখা ছিল । পৈশাচিক সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে পড়তে থাকেন তারা সকলে ।

“ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী , “ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী, অম্নগ রুথিরিয়ায় হেম্নাস্তায় পিশাচায় চতুর্ভুজায় হিং ক্লিং ছট স্বাহা “…………

মন্ত্রটি দুবার উচ্চারিত হওয়ার পরেই একটি ছাইয়ের গাদা ধীরে ধীরে মানব শরীরের আকার ধারণ করতে

থাকে । তারপরেই আবার ফিরে আসে হাহহাহাহাহাহাহাহা

বাতাসে পুনরায় ধ্বনিত হতে থাকে সেই মন্ত্র ।

"ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী , "ওম পিশাচায় নম প্রাকদবিব্বায় নম শোকনাথায় কৃপালি ছট চতুর্বেদী, অম্নগ রুথিরিয়ায় হেম্নাস্তায় পিশাচায় চতুর্ভুজায় হিং ক্লিং ছট স্বাহা "............

এবারের বিভীষিকার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি আদৌ কারুর জানা ছিল ? বিভীষিকার এই ব্রতচ্চারনের খেলা অবিরতই থেকে গেলো ।

Silent Love

Samiran Sarkar

A few minutes back they have left the place by Taxi.Dipali has closed the main door.They have gone for a courtesy visit to the house of elder sister of 'Ginnima'.They will come back in the evening.

Till then there is none in this house excepting Dipali herself and 'Sandhya masi',the cook.'Sandhya masi'(Sandhya auntie)has been suffering from fever since yesterday.She has already informed Dipali that she will take nothing today.She has also requested Dipali for self cooking for today.

A few years back Dipali was appointed as a house maid of this house.Sandhya masi helped her to come here.Sandhya masi and Dipali belong to a same village of Birbhum district.From her childhood Dipali came to know that Sandhya masi ,a closed friend of her

mother ,was engaged as a cook in the house of Baboos in Kolkata.As and when Sandhya masi visited their house ,Dipali had tried to compare Sandhya masi with her mother.

Both were of same age.But there was a remarkable difference between the two friends.Sandhya masi has put on brilliantly white sarees ,has dressed hair using sweet scented oil.She is chewing betel nut,Jarda etc.She is healthy and attractive too.On the otherhand her mother has put on a dirty and tattered cloth.Her long hairs have become almost matted for want of oil and timely combing.Her skin is giving off dry dirt as as and when rubbed.Her body is haggard looking for want of two meals a day.

Dipali had heard then the names of many good food and drink items from Sandhya masi.But they usually did not get two meals a day.They then could arrange only rice and edible herbs and creepers or worthless vegetables and that too without edible oil.Dipa started to

dream a dream of going to Kolkata with Sandhya masi and work in Baboos' house,putting on good dresses thereat.

Suddenly one day Sandhya masi gave that proposal.She told to Dipali's mother one day,"Your daughter has grown up.Let her go with me to Kolkata and stay with me there at Baboos' house and as a house- maid.Baboos are in a dire need of a whole timer 'KAJER LOK'.
Dipali's mother did not agree with the proposal.But, at the request of Sandhya masi and Dipali both,she agreed at last.

When Dipali came at Baboos' house ,she was then only thirteen years old.At that time a change was slowly coming in her body.Dipali felt that.But she noticed that ,Sonali,the only daughter of 'Kattababu'(the house master),who was older than Dipali ,was still behaving like a child at that time.She was then reading at a school.'Barda'(the elder soon of the house)had then only joined Government service.'Chhorda'(the younger son of the house) was then a college

student.'Kattababu' was then a pension holder.

Seven years elapsed.Now,Dipali is twenty.Kattababu had expiered three years back.Barda is married now.Chhorda has completed his education after waiting thee years joined in a Private Company in a supervisory post.Chhordi,Sonali ,after completing her school education,has entered in college now.'Baraboudi',(wife of Barda) has given birth to a male child,Pintu.

During last seven years Dipali has also changed hesrlf.She is now developed,both physically and mentally.She is now a healthy,beautiful and a smart girl of twenty.Now,she can speak gently and behaves politely.She can now read newspaper.She can now keep accounts.She can sing also.For all her changes she is indebted to 'Chhorda' and 'Chhordi' both.

Though 'Chhordi' is hard to please, but her mind is soft.Now,standing in

Chhordi's room,in front of her mirror,wearing her modern dress,using her lipstick etc,Dipali thinks that, if Chhordi commes suddenly and finds Dipali right now what she can do.At first pulling her hairs,she will take Dipali either to Ginnima's room or Baraboudi's room for punishment.While taking there,she may not also miss to slap Dipali.

Wearing Chhordi's dress,Dipali tries to copy Chhordi's voice and utter sweetly,"Oh Sandhya masi,please arrange food for me,I will go to college.Hurry up,please!

Suddenly Sandhya masi replied,"What are you saying Dipa?Do you need anything?
----No no masi,I need nothing.Are you feeling well now?
----A little better.

Dipali starts laughing.She enters the room of Barda.

There are a good no of porcelain dolls kept in a wall-almirah nicely.There is a wooden toy horse onthe floor.It is Pintu's hot favourite.A small toy cycle and many other toys of Pintu are scattered in the room.Before leaving room Pintu was playing with these.There is a Alna (stand)in the room for keeping clothes.A few shirts ,trousers etc. of Barda,sharee,blouse,bra etc. of Baraboudi,shirts and pants of Pintu are kept there in a indecent manner.There is a T.V set at western side of the room,kepton a wooden table.There is a nice Dressing Table beside the that.A joint photograph of Barda and Baraboudi is kept in a Photostand there.Dipali looks at the Photo.She speaks in a low voice, "No no,Baraboudi is not beautiful.She is mismatch to Barda.How Ginnima choose her for Barda,God knows.

Dipali has heard from Sandhya masi that,Baraboudi has come from a rich family and her family offered a big 'Dowry' and valuable gifts during marriage.Baraboudi is not only bad

looking ,her behavior is not good also.Starting from the morning to late night ,she always makes faces at Dipali.

She says,"Dipali,clean the room quickly."Before cleaning the room,she again orders,"Dipa, wash the clothes of your Barda and Pintu.Before completing that work,she again says," Dipa,give me a cup of tea quickly."Dipa,do this now.""Dipa,do that quickly." etc. etc. etc.

On the other hand,Barda is a nice gentleman.He seldom orders her to do anywork.Looking at the joint picture of Barda and Baraboudi,Dipali thinks that after her marriage she will keep a joint photograph of herself and her husband in her bedroom.But who,who will arrange her marriage ?Her mother has expired long long ago.

Dipali starts thinking about her future husband.Whether he will looking like Barda or Ashokda,the private tutor of Chhorda or like Chhorda!

Chhorda,Prakash,how nice he is!Dipali enters the room of Chhorda on small steps.A big photograph of Chhorda is hanging from the wall.Many many books are visible through the glass door of the wall almirah.There is a chair and a table placed near the window at the eastern side of the room.Sitting on that chair 'Chhorda' writes poems.A beutifully decorated flower vase with a bunch of Tuberose is kept on the table.The bedstead of Chhorda is near the south facing window of the room.A beautiful bedspread is there.Dipali goes there step by step and lies down on the bed slowly.She takes breath putting her nose closed to the bed.She gets the body odour of Chhorda.She gets same smell when she washes the shirts and trousers of Chhorda.

Dipali turns turtle.She looks at the photo of Chhorda.Chhorda is looking at her from the photo.Dipali imagines Chhorda will speak soon, "Wah!Dipa,you are looking nice with the dress of Sonali."

During the early days here,Dipali had played Ludo with Chhorda and Chhordi .At that time Chhorda was a college student.After completing his studies Chhorda was unemployed for about two years.During those days Chhorda usef to write something regularly in a big Khata.One day Dipali asked Chhorda,"What do you write regularly?"

-----Poems.Do you know Dipa many of my
poems have been published in magazines?

Chhorda showed her a few magazines where poems of Chhorda have been published.Dipali heard al,but could not understand what was the utility of publishing poems..But she understood that writing and publishing poems Chhorda was very happy.So,she also became happy.

Lying on the bed of Chhorda,Dipali can now remember the incident of another day.On that day Chhorda's liking

touched her heart.She also liked the incident very much.

On that day,starting from the morning the sky was cloudy . It was drizzling from time to time.Dipali took her bath in the moning.Her long hairs were ruffled then.She was plucking flower from the garden for daily religious activities of Ginnima.She was humming.Suddenly she noticed that Chhorda ,with a pen in his hand,was gazing at her.When she looked at Chhorda,he suddenly turned his face.Dipali also turned his face out of countenance.

After some time Dipali entered Chhorda's room with a cup of tea .She kept that on the table.Chhorda was writing something.But she did not leave the room.After a few moments,Chhorda asked,"Do you like to say somethig Dipa?"

Dipa did not reply.She was only rubbing her left great toe on the floor of the room.

Suddenly Chhorda told,"Dipa,while you were plucking flower today,you were looking very nice.Raindrops were coming down from your forehead and chick.At that time you were looking like a stick of Tuberose soaked in rain.Dipali could not hear more.When she heard these words from her Chhorda,she left the place quickly.

Today after a long gap of few months,Dipali stood in the room facing the photo of her Chhorda and whispered,"You are handsome Prakash,you are too handsome!

Dipali passed the whole day in obsession .At last evening came crawling.Suddenly the doorbell rang.Dipali quickly put offthe Maxi of Chhordi and wore her own dress.As soon as she opened thedoor,Baraboudi shouted "Why are you so late?Did you sleep the whole day? She handed over sleeping Pintu to Dipali and ordered loudly,"Keep Pintu on his bed immediayely.Don't miss to rig upmosquiyo curtain."

Chhordi told,"Dipa,give me a cup of tea quickly.I am suffering from bad headache for want of tea in time.

Ginnima told,"Dipa,come to my room quickly with lukewarm oil; rheumatic pain on my right knee has suddenly increased.Quick Dipa,quick.

Barda told gently ,"Dipa,wash my shirt,please.Pintu has vomitted on my shirt.

Dipa was kept silent.She looked at Chhorda quickly who was looking at her.

While opening the door,Dipali was eager to know the story of their whole day tour.But now ,she is not thinking so.
Dipali remembers she is only a house-maid here.All the dreams she dreamt the whole day were frittering away now.She is not dreaming now to wear good dresses,to take good food,to take a rest under the pacca roof .Rather she is now thinking about to return to her own

village,to catch fish,Oyster etc. from a pond,a marsh there,collects mangoes after the North-Wester,collects Water lilly from pond.She is now dreaming to swim like a Goose in the Dighi(a big lond) there.

But............Chhorda......??????
Only......Only for Chhorda.....!!!!!

Ahsaan

Sanhita Banerjee

It was one of those autumn morns when Ahsaan chose to call herself Shabnam may be ! Dew drenched grass squashed below her dainty feet revealed sublime surrender effortlessly as she glided over the fields to reach the tree. There was only one wishful thinking tree in this garden ! .Only one ! Her feet left blood red alta prints on the grass blades as she hastily tried to reach her branches . She was heaving to her eager arms trying to access the farthest flowering glory .She shook the tree to and fro , and in seconds the grassland was covered by withering shiwli bloom....It was mahalaya ! The love letter of autumn had arrived ! and who could read it better than Ahsaan did ! She did not know why ! an unfathomable bliss and unearthly joy overwhelmed her during this time , since her childhood ! Her father Ramjan Mianh was a matter of fact , small scale , clothes

dealer for whom , this was a busy season here in Bengal. In a family of five children, crowding in one room , where she had struggled , to mother her siblings since her mothers demise , such emotional luxury was unthinkable. Ahsaan carefully picked up each flower and gathered in her anchal .Her fingers quivered in sheer ecstasy as she picked them off the ground . She was Shabnam now . Named and renamed at her own will she knew , she would be Khowaish at the moment , the sun would rise when she , would make a garland out of them to adore her unruly locks , after a shower! She would be Ahsaan again by day! Abbu would call her to make chapatis for the family and vaji with tea . Her younger two brothers Rahim and Shahzada would go to work in the nearby zari emporium while her sis Manzil would fiddle with the doll , she has inherited from her foofis daughter Zarina recently .Zarina is in school .they are rich.

Ahsaan' s elder sister Nazneen is in dubai .No one knows how , but she manages to

send dollars to the family once in a while . Shabnam knows , Nazneen was married off to a buisnessman there as Abbu said . She cant recollect seeing her though ever. .Abbu says , Ahsaan should also get ready for her nikah next year . She would go to Dubai too. Ahsaan does not like the idea. Is there such autumn in Dubai ? Are there wishful shiuli trees out there ?

She does not know. Abbus friend Nishikant dada as she calls him , and Karim vai makes clay idols here . She has seen making and breaking of the "Durga "with them . Ahsaan knows not why, the sky summons her ! She will be Khoaish soon ! And it is a matter of seven days when she will be Durga ! " Shamsheree" can they call her then ? Ranjan , her buddy was saying the other day ! Ahsaan loves Durga ! And the transformation ...it is happening ..

She hardly could drape her saree well even last year , . But rest of it , she had in her being .! Her soul from the inception carried the essence of the attire being

wind around her unearthly aura , like the psyche of a woman in love , by the tender perception , of her sensuality in love ! Ahsaan knew not , why such metamorphosis kept happening ,within her ! Like the sky looking bluer everyday ; with clouds grazing lazily, as though, in the meadow of the azure , like the rains suddenly rushing in and out of the scape filled with mirth and delicate glory , she spontaneously swayed like unblemished white kash plumes , in the light breeze along the grassland below .

The tree was waving at her , with its branches adorned by the unblemished white and orange starlets all over ! Some , like tear drops on the cheek of a little girl , were rolling down on the downy grassland below ! As she was collecting them , Ahsaan remembered Manzil ! Her cute little sis , who could never walk .Right from her birth , she was disabled and would haplessly cry at the sight of others of her age playing in the courtyard right before their house in the basti . Ahsaan heaved a deep compassionate

sigh for a moment ! She always wanted to see Manzil happy !
It was first light kissing her hair , when she was done . Her anchal overflowing with shiuli blooms she looked up at the sky ! Her eye lashes were long and curled upwards giving her the beauty urging people to look on , while her eyes glittered naughtily with childish gleam of dreamy gaze all-around .The crimson ball had just popped out on the blue sky ! Oh she was Khowaish now !
" Ahsaan beta " it was her father looking for her . .She was busy threading the flowers into a garland sitting on the verandah.
."wait a while Khowaish !I will just be back ..."
She muttered to herself as she caressed the unfinished garland lovingly before rushing to the kitchen .She had to prepare tea for Abbu with ginger to his liking now and later for her brothers when they woke up .
"Beta , Nasser chacha will be joining us for breakfast today . Paratha banana " her father ,was not oblivious of his daughter

pacing fast towards woman hood , hence had called Nasser to discuss her nikkah issues . Ahsaan knew . She could not stand the sight of Nasser , the zari merchant in the locality ,who gave her nasty glances wherever” abbu “called him over .

It was little late in the morning , when after preparing tea and breakfast for all , and waking up and grooming Manzil , she finally could be Shabnam again ! The garland with a splash of water droplets on it to wake the flowers up , looked perfect around her locks waving all around her face glowing like a water lilly after a bath .

She had fixed a smaller one for Manzil too .

She would now be off to Nishikant dada s place ! Will they paint the eyes today ? How she craved to do that herself ! She had pleaded to Nishikant dada so many times ! He always laughed it away ! “It is not easy ! You are a woman dear !Only men can ..and we ..you and me ..our mazab is different “ Karim vai tried to explain. Ahsaan would not listen . If

Ahsaan might have a mazab Shabnam did not ! Nor did Khowaish ! They were not born of abbu ammi ! They were born of her soul.! Like Durga born out of the rage of the Gods as Panditji says , she was of her too of sublime glory may be !
As she stepped out of the gate, Abbu called her to meet Nasser cha cha . Ahsaan reluctantly stood before both men , as her wings fluttered within to fly!
"Yes you are right "Nasser said after a long obnoxious gaze at her , almost making her feel nauseated! "yes mianh ! She has really grown up ! Its time ... u better kèep her home ....."

Her Abbu smiled sheepishly and nodded in concurrence .Suddenly , Ahsaan felt like she was a piece of gosth "in the butchers , which the two men were talking about . She quickly tucked her anchal tightly around her waist and tried to slip away ! "Look ! she is embarassed ! " Naseer s words followed her as she heard both of them laughing ...

There at Nishikant dada' s , it was a different world altogether . The idol stood high and erect about to be empowered with weapons in all her arms boldly stretched out . Her magnificient nude looked more powerful , than any clad self of women around ! Nishikant dada was bent over the perfectly sculptured face with a paintbrush in his hand when she reached . The sky was lit up by the turquoise blue which knew no bounds ! In the red bordered saree Anita didi had presented her with , and shiuli adorned all over her hair , Ahsaan looked on ..The Stotro was chanted all over the universe she felt ! As it was played in a microphone at a distance ! How she loved this morning ! "so here you are! " said Nishikant dada . He looked fresh after a bath, in white dhoti and shirt like every year .only his white head being more befitting the colour of his attire each year , he didn't seem to change! Yet everything changed on this day each time ! How powerful was he! Thought Ahsaan, as Khowaish again ! Gifting the all

powerful mother sight ! She looked on as Nishikant dada bent before the face curved intricately out of his own hands .He looked meditative! She was just beside him ! Suddenly, he looked at her and smiled , as if in trance! Then suddenly to her surprise said "come! will you Maa ?" She didn't know what he was saying ! "what dada ? " He looked into her wide eyes and whispered " take the brush Maa ..wake her up!" she could not believe her ears ! From ages she had always been at Nishikant dadas little tinned roofed studio , fiddling with clay , as he made idols step by step .She had innate desire for painting and with the little toy Durga idol she fiddled with every time, gradually learning to make it, she had been practicing this almost to perfection by now every year ! Nishikant dada taught her himself ! But the real.idol she never could think of being permitted to touch , though she really never understood Karim vai s logic behind it . Her fingers trembling , she nodded and took the brush ..Nishikant dada , smiled at her as she bent over the heart shaped

face and gradually was immersed in painting the long eyelashes along the corner of each eye, like her own , almost perfectly ! Her lips quivered and broke into the immortal chant of Stotro ,"Aham rudre bhi vasu bhish charami aham / aham adityer uta visva devaya .." while Nishikant stood closed eyes and folded hands before the duo ! Tears rolled down the crevasses of his cheeks ! He had seen the mother in her last night !

On her way back , as if in trance , Ahsaan rushed to Anitadidis place .Anitadidi was waiting for her as usual .She was so different ! Head mistress of the only govt high school in the moholla, herself, she lived alone . She had a library in her house, and sang and painted beautifully. She ran evening classes, for children like Ahsaan too. She guided them to complete school education through private examinations out of school and two girls had completed graduation from their locality from her classes already ! Anita didi always said Ahsaan had a long way to go ! ."Shabnam!" She stretched out her hands to receive her . "or Khowaish ?

"she whispered ! She alone knew it all ...She was painting a face of Durga on canvas!..She looked stunningly beautiful and confident and strong ! Ahsaan was panting in excitement! "didi .. You know Nishikant dada, let me paint Her eyes today ! And I ! I did it !" her voice was immersed in emotions as she broke into sobs of elation and ecstasy ! Anitadidi held her firmly to her bossom as she weeped, ..Then, as if from a distance, said .."come! Take up your arms now ! You are blessed ! You are empowered with her glory ! "The two looked at each others eyes ! Ahsaan could feel her arms, rising to strong protest against anything that came in her way ! She had to fight out and win ! Her armoured soul knew no bounds today! She was Durga! Shamsheree! armed with the invincible weapon of her self assertion today ! The Mother had painted her eyes too , to give her sight into life today !

It was almost twilight when the siren broke the silence of the locality . .A lady

in khaki uniform jumped out of the veichle in the moholla ! She bore stars on her shoulder and left her escorts behind as she walked .briskly along ! .It was autumn evening , and dew drops had started kissing the grass knitting webs already ..She walked past the old sculptors shade now closed, the old little basti shelter where once a little girl snuggled in with her siblings . Finally , she was there ! An old lady rushed out of the little house to hug her as she took off her cap to touch her feet ..tears flew ..as years did ..on her way back , she stopped by the wishful tree ! ...It had blooms all over as before , but grown stronger and taller like her ! Nishikant dada was no more ! ..She met an aging Karim vai at his door ..she had to rush! ..There was so much to do being the newly posted Commissioner there.! There was , apart from duty , her own puja idol she had to paint tomorrow ! Manzil was looking into it all she knew, at her residence .Abbu was there tòo .He called her Samsheree now !

Artwork by Shohalia Nag

Artwork by Riyanka Roy

Alekh

Festive Issue

2021

PENPRINTS PUBLICATION

www.penprints.in